ISSN 1813-0372

বর্ষ : ১০ সংখ্যা : ৩৮
এপ্রিল - জুন : ২০১৪

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISSN 1813-0372

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISLAMI AIN O BICHAR

ইসলামী আইন ও বিচার

বর্ষ : ১০ সংখ্যা : ৩৮

প্রকাশনায় : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে
মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম

প্রকাশকাল : এপ্রিল - জুন : ২০১৪

যোগাযোগ : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্‌ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২
e-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com
web : www.ilrcbd.org

সম্পাদনা বিভাগ : ০১৭১৭-২২০৪৯৮
e-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com

বিপণন বিভাগ : ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২, মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
e-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com

সংস্থার ব্যাংক একাউন্ট নং
MSA 11051
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি:
পুরানা পল্টন শাখা, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ : ল' রিসার্চ সেন্টার

কম্পোজ : ল' রিসার্চ কম্পিউটার্স
দাম : ১০০ টাকা US $ 5

Published by Muhammad Nazrul Islam on behalf of Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 380/B, Mirpur Road (Lalmatia), Dhaka-1209, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka. Price Tk. 100 US $ 5

সূচিপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সম্পাদকীয়

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সৃষ্টিজগতের মধ্যে মানুষ সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি। এ বিশ্বচরাচরের যাবতীয় আয়োজন মানুষের সেবায় নিয়োজিত। মানুষ যাতে তা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারে সেজন্য আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে তাদের নিকট নবী-রাসূল পাঠিয়ে তাদেরকে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। মানুষ যেন এ পৃথিবীতে সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারে, সেজন্য নবী-রাসূলগণ তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। শুধু বস্তুগত উন্নতি লাভ করলেই মানুষ সুখী হতে পারে না। প্রকৃত সুখ-শান্তি লাভ করতে হলে বস্তুগত উন্নতির সাথে সাথে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিরও প্রয়োজন। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি ছাড়া মানব সমাজে প্রকৃত সুখ ও শান্তি আসতে পারেনা। নবী-রাসূলগণ মানুষকে যেমন বস্তুগত উন্নতির কথা বলেছেন, তেমনি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুণে গুণান্বিত হবারও তাকীদ দিয়েছেন।

আধুনিককালে মানুষের জীবনকে কীভাবে আরো সুখী ও সমৃদ্ধ করা যায় তা নিয়ে প্রচুর গবেষণা হচ্ছে। মূলত মানবসম্পদের উন্নয়ন সাধন করে দেশ ও জাতির কল্যাণে নিয়োজিত করতে হলে যথার্থ কৌশল প্রণয়ন এবং তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। বর্তমান বিশ্বে উন্নয়ন চিন্তার ক্ষেত্রে মানবসম্পদ উন্নয়ন কথাটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বসহকারে আলোচিত হচ্ছে। কারণ অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক বা অন্য যে কোন উন্নয়নের কথাই বলা হোক না কেন মানুষের উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে মানবসম্পদ। মূলত মানুষের জন্যই সকল উন্নয়ন প্রচেষ্টা। কিন্তু বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রচেষ্টায় কেবল মানুষের বস্তুগত দিকই গুরুত্ব পাচ্ছে, অপর দিকে মানুষের নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ অবহেলিত হচ্ছে। ফলে মানুষ উন্নতি ও সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে গেলেও মানবিক বিপর্যয়ও সমানে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। এমতাবস্থায় মানবসম্পদ উন্নয়নে ইসলামের ভূমিকা বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন একান্ত প্রয়োজন। ইসলামী আইন ও বিচার-এর বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত "মানব সম্পদ উন্নয়নে ইসলাম" শীর্ষক প্রবন্ধে বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রবন্ধটিতে মানবসম্পদ উন্নয়নে আধুনিক চিন্তার পাশাপাশি কুরআন ও সুন্নাহর দিক নির্দেশনাও উপস্থাপিত হয়েছে।

প্রাচীন ধর্মসমূহের কোনটি নারীকে দেবতার আসনে বসিয়েছে আবার কোনটি শয়তানের প্রতিচ্ছবি গণ্য করেছে। আধুনিক যুগে পুরুষের সমান অধিকার দিতে গিয়ে নারীকে ভোগের বস্তু বানিয়ে ফেলা হয়েছে। ইসলামী জীবন বিধানে নারীর স্থান দুই চরমপন্থী চিন্তার মধ্যবর্তী অবস্থানে। নারীর অধিকার ও মর্যাদা, বিশেষত কর্মের ক্ষেত্র ও অধিকারের বিষয়টি সেই আদিকাল থেকেই একটি আলোচিত বিষয়। বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদে এ বিষয়ে মতপার্থক্য অতীতেও ছিল বর্তমানেও আছে।

আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে নারী ও পুরুষ দুভাগে বিভক্ত করে সৃষ্টি করেছেন। তাদেরকে মেধা ও শ্রম বিনিয়োগ করে জীবিকা উপার্জন করে বেঁচে থাকার অধিকার দান করেছেন। সাথে সাথে নারী-পুরুষের কর্মের পরিধিও সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। নারীর কর্মের প্রয়োজন, সীমা প্রকৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে মানবরচিত কোন আইনে সুষ্ঠু দিকনির্দেশনা পাওয়া যায় না। কিন্তু ইসলামী জীবন বিধানে নারীর অধিকার, মর্যাদা, কর্মক্ষেত্র, কর্মের প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয় সুস্পষ্টভাবে বিধৃত হয়েছে। মোটকথা পুরুষের পাশাপাশি নারীকে প্রকৃত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। কিন্তু ইসলামী-বিদ্বেষী মহল সব সময় ইসলামের প্রতি অভিযোগ করে যে, ইসলাম নারীকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তাকে অবরোধবাসিনী বানিয়ে ফেলেছে। বাংলা ভাষায় ইসলামে নারীর অধিকার বিষয়ে কিছু লেখালেখি হলেও ঘরের বাইরে নারীর কর্মের অধিকার বিষয়ে তেমন কাজ হয়নি। তাই আমাদের দেশে এ ব্যাপারে ইসলামী শরীয়াতের দিকনির্দেশনা সম্পর্কে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি বিদ্যমান। "নারীর কর্মের অধিকার ও ইসলাম" প্রবন্ধটি এ বিভ্রান্তি দূরীকরণে ভূমিকা রাখতে পারে।

ইউরোপ-আমেরিকার যে সকল পণ্ডিত-মনীষী আরব জাতির ইতিহাস, ইসলামী সভ্যতা ও শরীয়াত নিয়ে গবেষণা করেছেন এবং এখনো যারা করে চলেছেন তাদেরকেই মূলত প্রাচ্যবিদ বলা হয়। আব্বাসীয় খিলাফতকালে ইউরোপ যখন মুসলিমদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড চালায় তখন থেকেই তাদের মধ্যে মুসলিমদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্পর্কে ঔৎসুক্য সৃষ্টি হয়। ইউরোপীয় সৈন্যরা একদিকে মুসলিম সৈনিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতো অন্যদিকে ইউরোপের অসংখ্য শিক্ষার্থী তখন বাগদাদ, কর্ডোভা, গ্রানাডার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে লেখাপড়া করতো। মূলত এসব শিক্ষার্থী ইউরোপে ফিরে গিয়ে জার্মানী, ইতালি, ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশে প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার বহু কেন্দ্র গড়ে তোলে। পরবর্তীতে তা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ও আমেরিকায় বিস্তার লাভ করে। এসব কেন্দ্র ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের অনেকেই ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন এবং তাদের লেখালেখিতেও তা ফুটে ওঠেছে। তবে অনেকেই আছেন সুস্থ ও নিরপেক্ষ। "ইসলামী আইন ও ফিকহশাস্ত্রে প্রাচ্যবিদদের রচনা ও গবেষণা" শিরোনামের প্রবন্ধটিতে এ দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। লেখাটি পাঠ করে পাঠকগণ প্রাচ্যবিদদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভ করবেন।

সরকার বা উচ্চতর কোন কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে বাজারের পণ্যমূল্য নির্ধারণ একটি আলোচিত বিষয়। সমাজে একচেটিয়া ও মজুদদারী ব্যবসা যেমন অতীতেও ছিল, বর্তমানেও বিভিন্নভাবে তা বিদ্যমান আছে। বাজারের কেনাবেচা ও ক্রেতা-বিক্রেতার স্বার্থের বিষয়টি ইসলামী বিধানে উপেক্ষিত হয়নি। এ বিষয়েও ইসলাম বাস্তব পদক্ষেপ নিয়েছে। "ইসলামে পণ্যের মূল্যনির্ধারণ" শিরোনামের প্রবন্ধে বিষয়টি চমৎকার ভাবে বিধৃত হয়েছে।

মানবসভ্যতার সকল যুগে মানব সমাজে দারিদ্র্য ছিল এবং বর্তমানেও আছে। অনেকে দারিদ্র্যকে অভিশাপ, অনেকে কপালের লিখন, আবার অনেকে আল্লাহর অনুগ্রহ বলে মনে করে মেনে নেয়। যেমন আমাদের দেশের একজন কবি দারিদ্র্যকে বরণ করেছেন এভাবে, "হে দারিদ্র্য! তুমি মোরে করেছ মহান"। এভাবে দারিদ্র্য নিয়ে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের চিন্তা ও মতামত রয়েছে। কিন্তু দারিদ্র্য সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি কী? রাসূলুল্লাহ স. নিজে দারিদ্র্য থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহর দরবারে দুআ করেছেন। তিনি মানুষকে দারিদ্র্য দূর করার জন্য চেষ্টা করতে বলেছেন। কারণ, দারিদ্র্য মানুষকে কুফরীর দিকে নিয়ে যেতে পারে। আমরা যদি কুরআন ও সুন্নাহ গভীরভাবে অধ্যয়ন করি তাহলে দারিদ্র্য ও তা দূরীকরণে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি দেখতে পাব। ইসলাম দারিদ্র্যকে কপালের লিখন বলে যেমন মেনে নেয়নি তেমনি তাকে মহান বলেও অভিহিত করেনি। বরং সমাজ থেকে তা দূরীকরণে সুন্দর কর্মকৌশল গ্রহণ করেছে। "ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল" প্রবন্ধটিতে বিষয়টি চমৎকার ভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

সরকারী মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৭৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত কোলকাতা মাদরাসা আলিয়ারই শাখা এটি। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর এটি ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায় ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুদূর প্রসারী ভূমিকা রয়েছে। অন্যসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মত এ প্রতিষ্ঠানের সিলেবাসও যুগের চাহিদা মত সময় সময় পরিবর্তন হয়েছে। মাদরাসাটির শুরু থেকেই এর সিলেবাসে অন্যান্য বিষয়ের সাথে ফিক্‌হশাস্ত্র ছিল। এই প্রবন্ধে লেখক এই মাদরাসার অতীত ও বর্তমান সিলেবাসে ফিকহশাস্ত্রের অবস্থা উপস্থাপন করেছেন। প্রবন্ধটি এ বিষয়ে আগ্রহী পাঠকদের নিকট অজানা অনেক তথ্য উপস্থাপন করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

"ইসলামী আইন ও বিচার" একটি গবেষণা জার্নাল। আধুনিক যুগ ও জিজ্ঞাসার চাহিদা মত ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে রচিত প্রবন্ধসমূহ এতে প্রকাশিত হয়। অতীতের মত বর্তমান সংখ্যার প্রবন্ধগুলোও পাঠকদের মনের খোরাক যোগাতে পারবে বলে আমরা মনে করি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সহায় হোন!

– ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১০ সংখ্যা : ৩৮
এপ্রিল - জুন : ২০১৪

মানবসম্পদ উন্নয়নে ইসলাম

ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল*

[**সারসংক্ষেপ** : *মানুষ মহান আল্লাহর সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি। এই মানুষকে কেন্দ্র করেই সমগ্র সৃষ্টিজগতের সকল আয়োজন। আধুনিককালে মানুষের জীবন কীভাবে আরো ফলপ্রসূ করা যায় তা নিয়ে বিস্তর গবেষণা হচ্ছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ এই মানুষের উন্নয়ন সাধন করে দেশ ও জাতির কল্যাণে নিয়োজিত করতে হলে প্রয়োজন যথার্থ কৌশল প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়ন। আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য একমাত্র জীবনব্যবস্থা ইসলাম মানবসম্পদ উন্নয়নে কী কী নির্দেশনা দিয়েছে তা এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে। মানবসম্পদ উন্নয়নের পরিচয়, এ ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশনা বাস্তবায়নে জ্ঞান অর্জন, জীবিকা অর্জন, স্বনির্ভরতা অর্জন, কর্তব্য পালন, যোগ্যতা অর্জন ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে ইসলামের গুরুত্বারোপ ও কিছু ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা আরোপ বিষয়ে অত্র প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। মানবসম্পদ উন্নয়নে পরকালীন চেতনা ও নৈতিকতার গুরুত্বকে দলীলসহ উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রবন্ধের শেষাংশে নৈতিক উন্নয়নে ইসলামের নির্দেশনাসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধটি মূলত কুরআন ও হাদীসের বর্ণনাভিত্তিক একটি প্রাথমিক উপস্থাপনা।*]

মানবসম্পদ উন্নয়ন আধুনিক উন্নয়ন চিন্তার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ ধারণা। বিশ শতকের শেষ দশকে এ ধারণার প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ ঘটে। বর্তমানে উন্নয়ন চিন্তার ক্ষেত্রে মানবসম্পদ উন্নয়ন ধারণাটি সবচেয়ে বেশি আলোচিত হচ্ছে এবং সর্বাধিক গুরুত্ব পাচ্ছে। কারণ অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক কিংবা অন্য যে উন্নয়নের কথাই বলা হোক, সকল উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে মানবসম্পদ। একে ঘিরে এবং এর জন্যই সকল উন্নয়ন প্রচেষ্টা। টেকসই উন্নয়ন, সমন্বিত উন্নয়ন ধারণা, সামগ্রিক উন্নতি বা সর্বাত্মক সুষম উন্নয়ন, সকল ক্ষেত্রে মানুষের সুখ-সুবিধাই মূল বিবেচ্য হয়ে থাকে। মানবসম্পদ উন্নয়ন ছাড়া প্রাকৃতিক, নৈসর্গিক বা পরিবেশগত কোনো সুবিধা গ্রহণ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় না। বর্তমান উন্নয়ন ধারায় প্রথমে তাই মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণকে আবশ্যিক বলে গণ্য করা হয়। ইসলাম গোড়া থেকেই মানবসম্পদ উন্নয়নকে সামগ্রিক উন্নয়নের প্রথম এবং প্রধান শর্ত হিসেবে গণ্য করেছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলাম মানবকে সত্যিকারার্থে শ্রেষ্ঠতম সম্পদ বলে ঘোষণা করেছে এবং এর উন্নয়নে প্রয়োজনীয় বিধি-ব্যবস্থাসমূহ প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

---

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০

বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় মানব সম্পদ উন্নয়ন ধারণাটির বিকাশ ও বিস্তারে যে পরিমাণ গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে এবং গুরুত্ব প্রদানের প্রেক্ষাপটে যে ফল লাভ হচ্ছে তা নিতান্তই অপ্রতুল। এতে মানুষের বৈষয়িক উন্নয়ন কিছুটা হয়তো হচ্ছে, কিন্তু মানবিক মূল্যবোধ, সহানুভূতি, সহযোগিতা ও ভালোবাসা বস্তুগত অর্জনের কাছে প্রতিনিয়ত মার খেয়ে যাচ্ছে। মানবিক বিপর্যয়ের চালচিত্র প্রতিদিনই প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশ পাচ্ছে, যা মানবসম্পদ উন্নয়ন ধারণার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এমতাবস্থায় মানবসম্পদ উন্নয়নে ইসলামের ভূমিকা বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন একান্ত আবশ্যক। এ বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন মানবসম্পদ উন্নয়নে আধুনিক প্রচেষ্টার ব্যর্থতা এবং সফলভাবে মানবসম্পদ উন্নয়নের পথ নির্দেশ করবে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন পরিচিতি

উন্নয়ন একটি মৌলিক পরিবর্তন প্রক্রিয়া, যা সমগ্র সমাজকে অন্তর্ভুক্ত করে। এতে একটি সমাজের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং ভৌত কাঠামো, পাশাপাশি সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধ ব্যবস্থা ও জীবন ধারণ পদ্ধতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধিত হয়।[১] উন্নয়ন একটি ব্যাপক ধারণা, যা একটি সমাজকে বর্তমান অবস্থান থেকে অধিকতর কাম্য অবস্থানের উদ্দেশ্যে পরিচালিত করে এবং এই কাম্য লক্ষ্যটি নির্ধারিত হয় ঐ সমাজের জনগণের ইতিহাস অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান হতে।[২]

উন্নয়নের মূল কেন্দ্রবিন্দু মানুষ। এটি একটি পথ মাত্র, চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়। যে উন্নয়নে মানুষের জীবন উন্নত হয় না বা যাতে মানুষের অংশগ্রহণ থাকে না, সে উন্নয়ন উন্নয়নই নয়। এ বোধই মানবসম্পদ উন্নয়ন ধারণার জনক, যার মূল কথা মানুষের উন্নয়ন, মানুষের জন্য উন্নয়ন এবং মানুষের দ্বারা উন্নয়ন।[৩] উন্নয়ন সম্পর্কিত নতুন এ ধারণাটির উদ্ভবের ফলে মানবিক দিকটি যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করে। বৈশ্বিকরণ প্রক্রিয়া জোরেসোরে উচ্চারিত হওয়ার সময়ও স্থিতিশীল ও স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের সাথে মানব উন্নয়নকে আবশ্যিকভাবে যুক্ত করা হয়। কারণ মানব উন্নয়ন ধারণা সৃষ্টিশীলতা ও বিকাশকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়।[৪]

---

১. "Development is fundamentally a process of change that involves the whole society – its economic, socio-cultural, political and physical structures as well as the value system and way of life of the people" – K. C. Alexander, Dimensions and Indicators of Develop, *Journal of Rural Development,* Vol.12 (3)-NIRD, Hyderabad, India, 1993, p. 257

২. মাহবুবুর রহমান, বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিপ্রেক্ষিতে আমলাতন্ত্রের একটি পর্যালোচনা, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা,* সংখ্যা ৬৮, অক্টোবর ২০০০, পৃ. ৫৫

৩. সেলিম জাহান, *অর্থনীতির কড়চা,* ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৬, পৃ. ১০

৪. এজাজুল হক চৌধুরী, *মানবিক উন্নয়ন,* ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৯, পৃ. ১১

মানব উন্নয়ন ব্যাপক জনগণের পছন্দ ভিত্তিক একটি প্রক্রিয়া। এটি মানব সক্ষমতার উপর ভিত্তিশীল (জনগণের বিনিয়োগের মাধ্যমে) এবং এসব সক্ষমতা সমভাবে ব্যবহৃত হয় (আয় এবং কর্মপ্রবৃদ্ধির মাধ্যমে অংশগ্রহণমুখী পরিস্থিতির উন্নয়ন সাধন)।[৫] মানব উন্নয়ন ধারণাটি বহুমাত্রিক ধারণার সমষ্টি। এর মধ্যে মানুষের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক, সর্বোপরি জীবনমান উন্নয়নকে বুঝায়।

১৯৯০ সালে UNDP[৬]-র রিপোর্টে বলা হয়, মানব উন্নয়ন এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া, যা সমগ্র সম্পদের সম্প্রসারণ ও ব্যবহার নিশ্চিত করে।[৭] ১৯৯১ সালে মানব উন্নয়নের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান নির্দিষ্ট হয়। এগুলো হলো মানুষের উন্নয়ন, মানুষের দ্বারা উন্নয়ন এবং মানুষের জন্য উন্নয়ন। মানুষের উন্নয়ন হলো শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং সামাজিক কল্যাণে বিনিয়োগ করা। উন্নয়নে পূর্ণ অংশগ্রহণ ও প্রয়োগ হলো মানুষের দ্বারা উন্নয়ন আর মানুষের দ্বারা উন্নয়ন হলো প্রতিটি মানুষের চাহিদা, আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।[৮] ১৯৯২ সালে Human Development Index বা মানব উন্নয়ন সূচক নির্ধারিত হয়। সংক্ষেপে একে বলে HDI, এগুলোর মধ্যে জীবনের দীর্ঘ স্থায়িত্ব, দক্ষতা উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত জ্ঞান, আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান বা সরকারি ও ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানে আত্মকর্মসংস্থান অন্যতম।[৯]

---

৫. "Human Development as a process of enlarging people's choice. It placed equal emphasis on the formation of human capabilities (through investing in people) and on the use of those capabilities (through creating a participatory for income and employment growth." – UNES CD for Asia and the Pacific, UNDP, Socio-Cultural Impact of Human Rescores Interpret, 1994, p.8

৬. United Nations Development Programme

৭. "Human development process fascinating is the entire spectrum through which human capabilities are expanded and utilized." – UNDP Report, 1990

৮. a) Development of the people which includes investment in education, health, nutrition and social well being as the people. b) Development by the people which implies full participatory development. c) Development for the people which specifies everyone's needs and provides income and employment opportunities for all. – UNDP Report, 1991

৯. Human Development Index (HDI)–a) Longevity of life b) Knowledge related to develop of skills and c) Self employment or formal employment in a public or private enterprise. – UNDP Report, 1992

সাধারণ কথায়, মানবসম্পদ উন্নয়নকে বলা হয়, People Centred Development অর্থাৎ উন্নয়ন ব্যবস্থা হবে সম্পূর্ণ মানবকেন্দ্রিক; মানুষ নিজেরা নিজেদের দৈহিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়ন ঘটাবে এবং নিজেরাই তার ফল ভোগ করবে।[১০] শিক্ষাবিদ-গবেষকগণের কেউ কেউ মানবসম্পদ উন্নয়নকে শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট করে দেখেছেন যা কর্ম-কৃতিত্ব (Job Performance) বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত। তারা বলেছেন, মানবসম্পদ উন্নয়ন হলো কর্ম-কৃতিত্ব উন্নয়ন বৃদ্ধির জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়ে সংগঠিত শিক্ষা অভিজ্ঞতা।[১১]

মানবসম্পদ উন্নয়নে ইসলামের পদক্ষেপসমূহ

ইসলামে মানব উন্নয়ন আর্থ–সামাজিক, শিক্ষা–সাংস্কৃতিক উন্নয়নের মূল বিষয়।[১২] কুরআন মাজীদের মৌলিক বিষয় হলো মুসলিমের আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত সমৃদ্ধি ও কল্যাণের জন্য মানব উন্নয়ন এবং মানবসম্পদ গঠন। এ উন্নয়নের জন্য ইসলাম মানুষের দৈহিক আকৃতিতে মানুষ হওয়ার সাথে সাথে মানবিক ঔদার্য ও মানসিক সৌন্দর্যের অধিকারী হওয়ার উপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। ইসলাম ঘোষণা করেছে, আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি হিসেবে মানুষ সম্মানিত এবং শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ তাআলাই মানুষকে এ শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তিনি বলেছেন :

﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الأَرْضِ﴾

তিনি সেই সত্তা, যিনি তোমাদেরকে দুনিয়ার প্রতিনিধি বানিয়েছেন।[১৩]

তিনি অন্যত্র বলেছেন :

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلا ﴾

নিশ্চয় আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দিয়েছি, তাদেরকে স্থলভাগে ও সাগরে চলাচলের বাহন দিয়েছি, তাদেরকে পবিত্র জীবিকা দিয়েছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।[১৪]

---

১০. ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, *মানব সম্পদ উন্নয়ন*, ঢাকা : তাসমিয়া পাবলিকেশন্স, ২০১০, পৃ. ১২৩

১১. "Human Resource Development (HRD) as organized learning experience in a definite time period to increase the possibility of improving job performance growth." - Leonard Nobler in Rafiqul Islam, *Human Resource Development in Rural Development in Bangladesh*, Dhaka : National Institute of Local Government, 1990, p.70

১২. "Human Development remains the key issue of socio-economic development" – Mohammad Solaiman Tandal, *Socio-Economic Development and Human Welfare*, Development & Human Welfare, Rajshahi, 2000, p.2

১৩. আল-কুরআন, ০৬ : ১৬৫

১৪. আল-কুরআন, ১৭ : ৭০

তবে মানুষের এ শ্রেষ্ঠত্বকে আল্লাহ তাআলা স্থায়ী ও অক্ষয় করে দেননি। বরং মানুষের আচরণিক ও আত্মিক উন্নয়ন করা ও না করার উপর এর ভিত্তি স্থাপন করেছেন। কেউ যদি আল্লাহ তাআলার নির্দেশনা মেনে নিজের আচরণ ও মানসিকতা উন্নত করে তাহলে সে তার শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ন রাখতে পারবে। আর যদি এ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয় তাহলে নীচ থেকে নীচতর স্তরে নেমে যাবে। আল্লাহ তাআলা এ সম্পর্কে বলেছেন :

﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾

নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সুন্দরতম করে সৃষ্টি করেছি। এরপর আমি তাকে সর্বনিম্ন স্তরে নামিয়ে দিয়েছি।[১৫]

মানুষের মর্যাদা ও সম্মান অক্ষুণ্ন রাখার পথ হিসেবে আচরণিক ও আত্মিক উন্নয়ন অনিবার্য করে ইসলামে মানবসম্পদ উন্নয়ন চেষ্টা নৈতিকভাবে সকলের জন্য বিধিবদ্ধ উপায়ে আবশ্যিক করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে আবশ্যিক হয়েছে জ্ঞান অর্জন, হালাল জীবিকা উপার্জন ও গ্রহণ, স্বনির্ভরতা অর্জন, কর্তব্য পালন, যোগ্যতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বারোপ, আখিরাতে সফলতা-ব্যর্থতাকে মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ এবং বিশেষভাবে নৈতিক উন্নয়ন।

জ্ঞান অর্জন

মুমিন হওয়ার জন্য জ্ঞান অর্জনকে ইসলাম প্রথম শর্ত হিসেবে গণ্য করেছে। আল্লাহ তাআলা প্রথম মানুষ আদম আ. কে সৃষ্টির পর সবার আগে বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান দান করেছেন এবং এ জ্ঞানের পরীক্ষাতেই আদম আ.-এর মাধ্যমে ফেরেশতাদের উপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। কুরআন মজীদে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ - قَالُوا سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ - قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ - وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾

আল্লাহ আদমকে প্রতিটি বিষয়ের নাম শেখালেন। এরপর তা ফেরেশতাদের সামনে পেশ করলেন এবং বললেন, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক, তাহলে আমাকে এগুলোর নামসমূহ জানাও।' ফেরেশতাগণ বললেন, 'আপনি মহাপবিত্র। আপনি আমাদের যা শেখান, তা ছাড়া আমাদের কোন জ্ঞান নেই। নিশ্চয় আপনি মহাজ্ঞানী, মহা প্রজ্ঞাময়।' আল্লাহ বললেন, 'হে আদম! তুমি তাদেরকে বিষয়গুলোর নাম জানিয়ে দাও।' এরপর যখন আদম তাদেরকে বিষয়গুলোর নাম জানিয়ে দিলেন, আল্লাহ তাআলা বললেন, 'আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে,

১৫. আল-কুরআন, ৯৫ : ৪-৫

নিশ্চয় আমি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর অদৃশ্য সম্পর্কে জানি? আর আমি খুব ভালভাবেই জানি যা তোমরা প্রকাশ কর এবং যা গোপন রাখ। যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, তোমরা আদমকে সিজদা কর, তখন ইবলীস ছাড়া সকলেই সিজদা করল। ইবলীস অবাধ্য হল ও অহঙ্কার করল এবং সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।[১৬]

রাসূলুল্লাহ স. যখন রিসালাত লাভ করলেন তখন তাঁর উপর প্রথম যে ওহী নাযিল হল তাও জ্ঞানার্জন বিষয়ক। হিরাগুহায় ধ্যানমগ্ন রাসূলুল্লাহ স. প্রথম ওহী লাভ করলেন,

﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ - خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ - الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ- عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾

পড়ুন আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন; যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত হতে। পড়ুন এবং আপনার প্রতিপালক মহাসম্মানিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন তা, যা সে জানত না।[১৭]

জ্ঞানকে মর্যাদা ও কল্যাণের বাহন বর্ণনা করে আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা তাদের মর্যাদা উচ্চ করে দেবেন।"[১৮]

অন্যত্র বলা হয়েছে,

﴿ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلا أُولُو الأَلْبَابِ ﴾

তিনি যাকে ইচ্ছা হিকমাত দান করেন। আর যাকে হিকমাত দেয়া হয় তাকে বিপুল কল্যাণ দান করা হয়। আর জ্ঞানীরা ছাড়া কেউ তো উপদেশ গ্রহণ করে না।[১৯]

আল্লাহ তাআলা সাধারণভাবে জ্ঞানচর্চার পাশাপাশি উচ্চতর গবেষণারও নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

﴿ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ ﴾

অতএব হে চক্ষুষ্মান মানুষেরা! তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো।[২০]

জ্ঞানের প্রতি আল্লাহ তাআলার এমন গুরুত্বারোপের পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ স. জ্ঞান অর্জনকে ফরয ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন,

---

১৬. আল-কুরআন, ০২ : ৩১-৩৪
১৭. আল-কুরআন, ৯৬ : ১-৫
১৮. আল-কুরআন, ৫৮ : ১১
১৯. আল-কুরআন, ০২ : ২৬৯
২০. আল-কুরআন, ৫৯ : ২

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ
জ্ঞান অর্জন করা প্রতিজন মুসলিমের উপর ফরয।[২১]

জ্ঞানীকে তিনি নবী–রাসূলগণের উত্তরসূরী আখ্যায়িত করে বলেছেন,

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ إِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَاراً وَلاَ دِرْهَماً وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظِّهِ أَوْ بِحَظٍّ وَافِرٍ

আলিমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী। আর নবীগণ উত্তরাধিকার হিসেবে দীনার বা দিরহাম রেখে যাননি। তারা উত্তরাধিকার রেখে গেছেন শুধু জ্ঞান। তাই যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করেছে সে অর্জন করেছে উত্তরাধিকারের পুরো অংশ।[২২]

জ্ঞানার্জনের কাজকে তিনি আল্লাহর পথে জিহাদের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন,

مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ كَانَ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ

যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণে বের হয়েছে, সে আল্লাহর পথে রয়েছে, যতক্ষণ না সে প্রত্যাবর্তন করে।[২৩]

এভাবে ইসলাম জ্ঞানার্জন ও গবেষণার কাজকে বাধ্যতামূলক রেখে মানবসম্পদ উন্নয়নে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এতে এমন বিধান রাখা হয় যে, একজন মানুষ মুসলিম হলে তাকে অবশ্যই শিক্ষিত হতে হয়। শিক্ষিত হওয়া ছাড়া মুসলিম হওয়ার বিষয়টি বিধিগতভাবে অসম্ভব বলে গণ্য হয়।

জীবিকা অর্জন

আল্লাহ তাআলার ইবাদত যেমন ফরয, ইসলামে জীবিকা উপার্জনকে তেমন ফরয করা হয়েছে। কুরআন মাজীদে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

---

২১. ইমাম ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, তাহকীক : মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, অধ্যায় : ইফতিতাহুল কিতাব ফিল ঈমান ওয়া ফাযায়িলুস সাহাবাহ ওয়াল ইলম, অনুচ্ছেদ : ফাযলুল উলামা-ই ওয়াল হাছহি আলা তলাবিল ইলম, বৈরূত : দারুল ফিকর, তা.বি., হাদীস নং-২২৪; হাদীসটির উল্লিখিত অংশটুকুর সনদ সহীহ (صحيح); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যঈফ সুনানু ইবনু মাযাহ*, হাদীস নং-২২৪।

২২. ইমাম আত-তিরমিযী, *আস-সুনান*, তাহকীক : আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির ও অন্যান্য, অধ্যায় : আল-ইলম, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফী ফাযলিল ফিকহি আলাল ইবাদাহ, বৈরূত : দারু ইহ্ইয়াইত্ তুরাছিল আরাবী, তা.বি., হাদীস নং-২৬৮২; হাদীসটির সনদ সহীহ (صحيح); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যঈফ সুনানুত তিরমিযী*, হাদীস নং-২৬৮২

২৩. ইমাম আত-তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-ইলম, অনুচ্ছেদ : ফাযলু তলাবিল ইলম, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৬৪৭; হাদীসটির সনদ যঈফ (ضعيف); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যঈফ সুনানুত তিরমিযী*, হাদীস নং-২৬৪৭

এরপর যখন সালাত আদায় শেষ হবে তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে, আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ করবে এবং আল্লাহর বেশি বেশি যিকর করবে, এতে তোমরা সফল হবে।[২৪]

আবার জীবিকা উপার্জনের ক্ষেত্রেও হালাল–হারামের সীমারেখা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে এমন প্রবলভাবে যে, ইবাদত কবূল হবে কি না, ব্যক্তি জান্নাতে যাবে কি না তা একান্তভাবে জীবিকা উপার্জনের পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল রাখা হয়েছে। ফলে ইসলামে একজন ব্যক্তি কেবল জীবিকাই উপার্জন করে না বরং হালাল উপায় অবলম্বন করে বৈধভাবে জীবিকা উপার্জন করে। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ

হালাল উপার্জন অন্বেষণ করা ফরযের পরে ফরয।[২৫] অর্থাৎ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফরয।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾

তোমরা উত্তম ও পবিত্র বস্তু আহার করো, যা আমি তোমাদের জীবিকারূপে দিয়েছি এবং কৃতজ্ঞতা আদায় করো আল্লাহর, যদি তোমরা একান্তই তাঁর ইবাদাত করো।[২৬]

আল্লাহর রাসূল স. এ প্রেক্ষাপটেই বলেছেন,

إنه لا يدخل الجنة لحم ولا دم نبتا من سحت كل لحم ودم نبتا من سحت فالنار أولى به

হারাম সম্পদে তৈরি গোশত ও রক্ত জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং হারাম সম্পদে তৈরি প্রতি টুকরো গোশত ও প্রতি ফোটা রক্তের জন্যে নরকই যথোপযুক্ত আবাস।[২৭]

স্বনির্ভরতা অর্জন

ইসলামে কেউ কারো গলগ্রহ হয়ে থাকাকে সমর্থন করা হয়নি। ব্যক্তি নিজে উপার্জন করবে, নিজের আয়ের উপর নির্ভর করবে। অন্য কারো আয়ে ভাগ বসাবে না। রাসূলুল্লাহ স. সুস্পষ্টভাবে বলেছেন,

أَطْيَبُ الْكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

---

২৪. আল-কুরআন, ৬২ : ১০

২৫. ইমাম আল-বায়হাকী, *শুআবুল ঈমান*, অনুচ্ছেদ : ফী হুকুকিল আওলাদি...., বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১০ হি., হাদীস নং-৮৭৪১; হাদীসটির সনদ মুনকার (منكر) এবং যঈফ (ضعيف); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সিলসিলাতুল আহাদীছিয যঈফাহ ওয়াল মাওযূআহ ওয়া আছারুহাস সাইয়্যি ফিল উম্মাহ*, রিয়াদ : দারুল মা'আরিফ, ১৪১২হি./১৯৯২খ্রি., খ. ১৪, পৃ. ৩৪৮; হাদীস নং-৬৬৪৫, ৩৮২৬

২৬. আল-কুরআন, ০২ : ১৭২

২৭. ইমাম আল-বায়হাকী, *শুআবুল ঈমান*, অনুচ্ছেদ : ফী তীবিল মাত'আমি ওয়াল মালবাস ওয়া ইজতিনাবিল হারামি ওয়া ইত্তিকা-ইশ শুবহাত, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫৭৬২; হাদীসটির সনদ সহীহ লি-গাইরিহী (صحيح لغيره); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব*, রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ৫ম সংস্করণ, খ. ২, পৃ. ১৫০; হাদীস নং-১৭২৯

পবিত্রতম উপার্জন হলো মানুষের নিজের হাতের পরিশ্রম এবং প্রত্যেক বিশুদ্ধ ব্যবসায় (এর উপার্জন)।[২৮]

স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য কাজ করতে হলে কেউ যেন তাতে দ্বিধা না করে, লজ্জিতবোধ না করে তা নিশ্চিত করার জন্য ইসলামে শ্রম ও শ্রমিককে বিশেষ মর্যাদা দেয়া হয়েছে।

নানাভাবে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা শ্রম পছন্দ করেন। শ্রমিকের অধিকার সম্পর্কে তিনি বলেছেন,

إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ

যারা তোমাদের কাজ করে জীবিকা উপার্জন করে, সে শ্রমিক তোমাদের ভাই। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। তাই যাদের কাছে এমন লোক আছে তাদেরকে যেন তা-ই খেতে দেয় যা তারা নিজেরা খায়, তাদেরকে যেন তা-ই পরতে দেয়, যা তারা নিজেরা পরে। তোমরা তাদেরকে তাদের সামর্থ্যের বাইরে কোনো কাজ করতে বাধ্য করবে না। যদি তাদেরকে তোমরা কোনো কঠিন কাজ করতে দাও, তা হলে তোমরা তাদের সহযোগিতা করবে।[২৯]

শ্রমিককে যেন তার প্রাপ্য মজুরির জন্য নিয়োগকর্তার পেছনে ঘুরতে না হয় এবং শ্রমের ন্যায্য মূল্য নিয়ে নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকের মধ্যে যেন কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তা নিশ্চিত করার জন্য আল্লাহর রাসূল স. নির্দেশ দিয়েছেন,

أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

শ্রমিককে তার ঘাম শুকানোর আগেই পারিশ্রমিক পরিশোধ করে দাও।[৩০]

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে রাফি' ইবনু খাদীজ রা. বলেন,

রাসূলুল্লাহ স. কে একদা জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কোন প্রকারের উপার্জন উত্তম ও পবিত্রতম? তিনি বলেছেন, عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ 'ব্যক্তির নিজের শ্রমের উপার্জন ও সৎ ব্যবসায়লব্ধ মুনাফা।'[৩১]

---

২৮. আলাউদ্দিন আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী, *কানযুল উম্মাল*, অধ্যায় : আল-বুয়ু, অনুচ্ছেদ : ফী ফাযায়িলিল কাসবিল হালাল, বৈরূত : মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৯খ্রি., হাদীস নং-৯১৯৬; হাদীসটির সনদ সহীহ (صحيح) মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, আস-সিলসিলাতুল আহদাসিস সহীহাহ, রিয়াদ : মাকতাবাতুল মাআরিফ, খ. ২, পৃ. ১৫৯; হাদীস নং-৬০৭

২৯. ইমাম আল-বুখারী, *আস সহীহ*, অধ্যায় : আল-ঈমান,অনুচ্ছেদ : আল-মাআসী মিন আমরিল জাহিলিয়্যাহ ওয়ালা ইউকফারু সহিবুহা বি-ইরতিকাবিহা বিশ-শিরক, বৈরূত : দারু ইবনি কাছীর, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৭হি./১৯৮৭খ্রি., হাদীস নং-৩০

৩০. ইমাম ইবনু মাযাহ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আর-রুহুন, অনুচ্ছেদ : আজরিল উজারা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৪৪৩। হাদীসটির সনদ সহীহ (صحيح); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, সহীহ ওয়া যঈফ সুনানু ইবনি মাজাহ, হাদীস নং-২৪৪৩

৩১. ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, তাহকীক : শুআয়ব আল-আরনাউত, বৈরূত : মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ,, ১৪২০হি./১৯৯৯খ্রি., খ. ২৮, হাদীস নং-১৭২৬৫। হাদীসটির সনদ সহীহ লি-

আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রাসূল স. নানাভাবে মানুষকে কাজ করায় উৎসাহ দিয়েছেন। ভিক্ষাবৃত্তির প্রতি অনীহা তৈরির জন্য রাসূল স. বলেছেন,

اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

নিচের হাতের চেয়ে উপরের হাত উত্তম।[৩২]

আল্লাহ তাআলার হুকুম আর আল্লাহর রাসূলের এ নির্দেশনা মেনে ব্যক্তি যদি স্বনির্ভর হওয়ার চেষ্টা করে, তাহলে অনিবার্যরূপে তাঁর ব্যক্তিত্ব, যোগ্যতা, দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। এভাবে উন্নয়ন ঘটবে মানবের। অদক্ষ-অক্ষম বোঝার পরিবর্তে ব্যক্তি উন্নত সম্পদে পরিণত হবে।

কর্তব্য পালন

ইসলাম সাধারণভাবে সকল মানুষকে কর্তব্যপরায়ণ হিসেবে ঘোষণা করেছে। সকলের জন্য অর্পিত কর্তব্য পালন আবশ্যিক করেছে এবং এ ক্ষেত্রে যে কোন অবহেলাকে আল্লাহ তাআলার নিকট জবাবদিহিতার বিষয় বলে সতর্ক করেছে। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

أَلا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব, ইমাম বা নেতা, যিনি জনগণের ওপর দায়িত্ববান- তিনি তার অধীনদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবেন। আর ব্যক্তি, যে তার পরিবারের সদস্যদের দায়িত্বশীল- সে তার পরিবারের সদস্যদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। নারী দায়িত্বশীল তার স্বামীর পরিবারের সদস্যদের ও সন্তান-সন্ততির। সে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। আর দাস ব্যক্তি তার মনিবের সম্পদের দায়িত্বশীল এবং সে এই সম্পদের দায়িত্ব সম্পর্কেই জিজ্ঞাসিত হবে। কাজেই সতর্ক হও! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে (পরকালে আল্লাহর নিকট) জিজ্ঞাসিত হবে।[৩৩]

গাইরিহী (صحيح لغيره); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৬৮৮

[৩২] ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আয-যাকাত, অনুচ্ছেদ : লা সদাকতা ইল্লা আন যহরি গিনা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৩৬১

[৩৩] ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-আহকাম, অনুচ্ছেদ : কওলুল্লাহি তাআলা আতীউল্লাহ ওয়া আতীউর রসূলা ওয়া উলিল আমরি মিনকুম, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৬৭১৭

ইসলাম একান্তভাবে মানুষকে এ শিক্ষা দিয়েছে, কেউ কারো বোঝা বহন করবে না। আল্লাহ্ তাআলা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় সবাইকে জানিয়ে দিয়েছেন,

﴿ مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾

যারা সরল-সঠিক পথে পরিচালিত হবে নিশ্চয় তারা তাদের নিজেদের কল্যাণের জন্যই সঠিক পথে পরিচালিত হবে। আর যারা ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হবে তারা ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হবে তাদের নিজেদের ধ্বংসের জন্যই। কেউ কারো কাজের দায় বহন করবে না। আর আমি রাসূল পাঠিয়ে সতর্ক করা ছাড়া কাউকে শাস্তি দেই না।[৩৪]

ইসলামের এ নীতি একান্তভাবে ব্যক্তিকে দায়িত্ব সচেতন করে এবং দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করে। এ নীতি মানুষকে এমনভাবে ভাবতে শেখায় যে, কেউ অন্য কারো কবরে যাবে না। কেউ অন্য কারো কাজের জবাবদিহিতা করবে না। সাধারণভাবে কেউ অন্য কারো কাজের সুফল বা দায় ভোগ করবে না। বরং প্রত্যেককে নিজ নিজ কাজের সুফল বা কুফল ভোগ করতে হবে। এ শিক্ষার ফলে মানুষ নিজেকে দায়িত্বশীল, কর্তব্যপরায়ণ হিসেবে গড়ে তোলে। এটি তার ব্যক্তি সত্তার উন্নতি বিধান করে।

যোগ্যতা অর্জন ও দক্ষতা বৃদ্ধি

ইসলাম মানুষে মানুষে মানবিক কোন ব্যবধান বা বৈষম্য স্বীকার করেনি। মানবিক মর্যাদায় সাধারণভাবে সকলকে সমান মর্যাদা ও গুরুত্ব প্রদান করেছে। মানুষের উৎস ও বিস্তার সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ্ তাআলা এ বিষয়টি নির্দেশ করেছেন।
আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন,

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾

হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন, যিনি সৃষ্টি করেছেন সে ব্যক্তি থেকে তার জোড়া, আর তাদের দুজন থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন অসংখ্য পুরুষ ও নারী। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অন্যের নিকট কিছু চাও। আর তোমরা আত্মীয়দের (হক আদায় ও সম্পর্ক অটুট রাখার) ব্যাপারে সতর্ক হও। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।[৩৫]

আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেছেন,

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ﴾

---

৩৪. আল-কুরআন, ১৭ : ১৫

৩৫. আল-কুরআন, ০৪ : ১

হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার।[৩৬]

রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلا لا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلا لأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلا بِالتَّقْوَى

হে মানবজাতি! সাবধান! নিশ্চয় তোমাদের রব একজন, তোমাদের পিতাও একজন। সতর্ক হও! কোন আরবের উপর অনারবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই, কোন অনারবের উপর আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কোন কালোর উপর সাদার কিংবা সাদার উপর কালোর তাকওয়া ব্যতীত কোন মর্যাদা নেই।[৩৭]

সাধারণভাবে সকল মানুষকে এভাবে সমান ঘোষণার পর কুরআন ও হাদীসে মানুষের উপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্বের জন্য বিশেষ যোগ্যতা অর্জনের তাগিদ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন,

﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾

তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সে ব্যক্তিই সবচেয়ে বেশি মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে সবেচেয়ে বেশি তাকওয়াবান। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু জানেন, সবকিছুর খবর রাখেন।[৩৮]

পরকালীন সফলতা–ব্যর্থতার মাপকাঠি

নিঃসন্দেহে মানবসম্পদ উন্নয়নে ইসলামের সবচেয়ে বড় প্রেরণা এর পরকাল বিষয়ক মূল্যবোধ ও নীতিমালা। দুনিয়াতে একজন লোক যদি আর্থিক বা শারীরিক কিংবা সামাজিক দিক থেকে গ্রহণীয় হয় অথবা কেউ যদি সকল দিক থেকে অগ্রহণযোগ্য হয় তাহলে দুনিয়ার বিচারে লোকটির জীবন সফল হয়েছে বা ব্যর্থ হয়েছে বলা যায়। কিন্তু আখিরাতে ব্যক্তির সফলতা নির্ভর করে একান্তভাবে ব্যক্তির সঠিক বিশ্বাস, সৎকর্ম, সৎচিন্তা ও সৎ জীবনযাপনের উপর। এর অর্থ হল ব্যক্তি যদি সমাজের সঙ্গে তাল মেলানোর জন্য বা সমাজে সম্মানিত হওয়ার জন্য এমন কোন কাজ করে ইসলামের দৃষ্টিতে যা সম্মানজনক নয় তাহলে আখিরাতে তার জন্য কিছুই থাকবে না। আবার বাহ্যত অসম্মানজনক বা নিপীড়নমূলক প্রমাণ হলেও আখিরাতে হয়তো

---

৩৬. আল-কুরআন, ৪৯ : ১৩

৩৭. ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৩৪৮৯; হাদীসটির সনদ সহীহ (صحيح); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সিলসিলাতুল আহাদিছিছ সহীহাহ*, রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'আরিফ, হাদীস নং-২৭০০

৩৮. আল-কুরআন, ৪৯ : ১৩

কাজটি অত্যন্ত সম্মানের হতে পারে। এ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে দুনিয়ায় লাভ-লোকসানের বিবেচনা ছাড়া একজন মানুষ আখিরাতে সফল হওয়ার জন্য ভেতরে-বাহিরে সৎ জীবন যাপন করার চেষ্টা করে। কাউকে দেখানোর বা কারো মনোঃতুষ্টির আকাঙ্ক্ষা সে একেবারেই পোষণ করে না। সে দুনিয়াকে ততটুকুই গুরুত্ব প্রদান করে যতটুকু গুরুত্ব প্রদানের নির্দেশ আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন :

﴿ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلا قَلِيلٌ﴾

তোমরা কি আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অত্যন্ত কম।[৩৯]

অন্যত্র তিনি বলেন,

﴿ وَلَلآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلا﴾

আখিরাত তো নিশ্চয় শ্রেষ্ঠতম পর্যায় এবং মর্যাদায় মহত্তম।[৪০]

দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার্থে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾

আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন তা দিয়ে আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান কর, তবে তোমার দুনিয়ার অংশ ভুলে যেয়ো না।[৪১]

আখিরাতের বিশ্বাস মানুষকে কেবল সৎকাজ করতেই উদ্বুদ্ধ করে না; বরং কাজটি একান্তভাবে আল্লাহ তাআলার জন্য করতে উদ্বুদ্ধ করে। কারণ আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে সৎকাজ করা হলে তা পুরস্কারযোগ্য হয় না। তাও শাস্তিযোগ্য আমলে পরিণত হয়। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন :

إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ. قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقَالَ جَرِيءٌ. فَقَدْ قِيلَ. ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ. قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ. وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ. فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلاَّ أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ. فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ

কিয়ামাতের দিন মানুষের মধ্যে প্রথম যার বিচার হবে সে হবে একজন শহীদ। তাকে আল্লাহর দরবারে নিয়ে আসা হবে। আল্লাহ তাকে তাঁর নিআমতসমূহের

---

৩৯. আল-কুরআন, ০৯ : ৩৮

৪০. আল-কুরআন, ১৭ : ২১

৪১. আল-কুরআন, ২৮ : ৭৭

কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সেও তা স্মরণ করবে। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, তুমি দুনিয়াতে এর বিনিময়ে কী কাজ করেছো? সে উত্তর দেবে- আমি তোমার পথে যুদ্ধ করেছি; এমনকি শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়েছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো। বরং তুমি এ জন্যে যুদ্ধ করেছো যেনো তোমাকে বীরপুরুষ বলা হয়। আর তা তোমাকে বলা হয়েছে। এরপর তার ব্যাপারে ফেরেশতাগণকে আদেশ করা হবে। তারা তাকে উপুড় করে টেনে টেনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে।

দ্বিতীয়ত যার বিচার হবে সে হবে একজন আলিম। সে নিজে শিক্ষা লাভ করেছে, অপরকে তা শিখিয়েছে এবং কুরআন পড়েছে। তাকে আল্লাহর দরবারে নিয়ে আসা হবে। আল্লাহ তাকে তাঁর নিআমতসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সেও তা স্মরণ করবে। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, তুমি দুনিয়াতে এর বিনিময়ে কী কাজ করেছো? সে উত্তর দেবে, দুনিয়াতে আমি শিক্ষা লাভ করেছি, অন্যকে শিখিয়েছি এবং তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করছি। আল্লাহ বলবেন – তুমি মিথ্যা বলছো। বরং তুমি এ জন্যে জ্ঞান অর্জন করেছিলে যেনো তোমাকে জ্ঞানী বলা হয়। কুরআন মাজীদ এ জন্যে তিলাওয়াত করেছিলে যেনো তোমাকে কারী বলা হয়। আর তোমাকে তা বলা হয়েছে। এরপর তার ব্যাপারে ফেরেশতাগণকে আদেশ করা হবে। তারা তাকে উপুড় করে টেনে টেনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে।

তৃতীয়ত যার বিচার হবে সে হবে একজন সম্পদশালী ব্যক্তি। আল্লাহ তাকে স্বচ্ছল করেছেন এবং বিপুল সম্পদ দিয়েছেন। তাকে আল্লাহর দরবারে নিয়ে আসা হবে। আল্লাহ তাকে তাঁর নিআমতসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সেও তা স্মরণ করবে। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, তুমি দুনিয়াতে এর বিনিময়ে কী কাজ করেছো? সে উত্তর দেবে, যে পথে খরচ করলে তুমি খুশি হও, সে জাতীয় সব পথেই তোমার সন্তুষ্টির জন্য আমি খরচ করেছি। আল্লাহ বলবেন – তুমি মিথ্যা বলছো। বরং তুমিতো এগুলো এ জন্যে করেছো যেনো তোমাকে দানবীর বলা হয়। আর তোমাকে তা বলা হয়েছে। এরপর তার ব্যাপারে ফেরেশতাকে আদেশ করা হবে। তারা তাকে উপুড় করে টেনে টেনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে।[৪২]

আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত সংক্ষেপে কিন্তু স্পষ্টভাষায় ঘোষণা করেছেন,

﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ - الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ - الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴾

---

৪২. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, তাহকীক : মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, অধ্যায় : আল-ইমারাহ, অনুচ্ছেদ : মান কাতালা লির-রিয়াই ওয়াস সুমআতি ইসতাহাক্কান নার, বৈরূত : দারু ইহ্ইয়াইত্ তুরাছিল আরাবিয়্যি, খ. ৩, হাদীস নং-১৯০৫

> কাজেই ধ্বংস সেই সকল সালাত আদায়কারীর জন্য, যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন, যারা লোক দেখানোর জন্য সালাত আদায় করে।[৪৩]

বস্তুত আখিরাতে সফলতা লাভই মুমিনের মূল লক্ষ্য। এ কারণে ইসলামে বিশ্বাসী একজন লোক দুনিয়ার সকল কাজই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করেন। যে কারণে তার মধ্যে লোক দেখানোর বিষয়টি একেবারেই থাকে না। ফলে মানসিক দিক থেকে তিনি পরম উৎকর্ষ লাভ করতে সক্ষম হন। কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রতি বিদ্বেষ বা প্রেম তাকে কোনক্রমেই মন্দ কাজে নিয়োজিত করতে পারে না।

নৈতিক উন্নয়ন

নৈতিক উন্নয়ন ছাড়া যেকোন উন্নয়নই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। তাই রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ

আমি প্রেরিত হয়েছি সুমহান নৈতিক গুণাবলির পূর্ণতা সাধনের জন্য।[৪৪]

আবু হুরায়রা রা. বলেন,

> রাসূলুল্লাহ স. কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কোন কাজ অধিকাংশ লোককে জান্নাতে প্রবেশ করাবে? তিনি উত্তরে বলেছেন, تقوى الله وَحُسْنُ الخُلُقِ 'তাকওয়া ও উত্তম চরিত্র।'[৪৫]

রাসূলুল্লাহ স. আরও বলেছেন,

مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ

> কিয়ামাতের দিন যে জিনিসটি মুমিনের পাল্লায় সবচেয়ে ভারি হবে তা হল উত্তম চরিত্র।[৪৬]

নাওয়াস ইবনে সামআন আল-আনসারী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ স. কে 'বির্' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তরে বলেছেন,

---

৪৩. আল-কুরআন, ১০৭ : ৪–৬

৪৪. ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৮৯৫২। মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সিলসিলাতুল আহাদীসিছ সহীহাহ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪৫

৪৫. ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-বির্র ওয়াস সিলা, অনুচ্ছেদ : হুসনুল খুলুক, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২০০৪। হাদীসটির সনদ হাসান (حسن); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যঈফ সুনানুত তিরমিযী*, হাদীস নং-২০০৪

৪৬. ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-আদাব, অনুচ্ছেদ : ফী হুসনিল খুলুক, বৈরূত : দারুল কিতাবিল আরাবিয়্যি, তা.বি., খ. ৪, পৃ. ৪০০; হাদীস নং-৪৮০১। হাদীসটির সনদ সহীহ (صحيح); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যঈফ সুনানি আবি দাউদ*, হাদীস নং-৪৭৯৯

اَلْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ 'সুন্দর ব্যবহারই পুণ্য।'[৪৭]

তিনি সত্যিকার ও পূর্ণ মুমিন হিসেবে সে ব্যক্তিকেই অভিহিত করেছেন যার চরিত্র সুন্দর। তিনি বলেছেন,

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

চরিত্রের বিচারে যে উত্তম মুমিনদের মধ্যে সেই পূর্ণ ঈমানের অধিকারী।[৪৮]

'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

> একবার আমি রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে ছিলাম। এমন সময় জনৈক আনসারী ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ সা. কে সালাম করলেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُ - "ইয়া রাসূলাল্লাহ, মুমিনদের মধ্যে সর্বোত্তম কে? তিনি জবাব দিলেন, أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا - "তাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হলো সেই ব্যক্তি যার চরিত্র সর্বোত্তম।"[৪৯]

কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা মুমিনের অসংখ্য নৈতিক গুণের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন :

> ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ - الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ - وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ - وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ - وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴾
>
> নিশ্চয় মুমিনগণ সফল, যারা তাদের সালাতে ভীত ও বিনয়ী, যারা নিজেদেরকে অর্থহীন কাজ থেকে বিরত রাখে, যারা যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে কর্মতৎপর হয় এবং যারা নিজেদের যৌনাঙ্গ হিফাযত করে।[৫০]

বস্তুত ইসলাম যে বিষয়গুলোকে চরিত্রের সুন্দর দিক এবং অবশ্য অর্জনীয় গুণ হিসেবে ঘোষণা করে সেগুলোকে আত্মার গুণ হিসেবে আত্মস্থ করা, নৈতিক বৈশিষ্ট্যে পরিণত করা এবং জীবনাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা গেলে স্বভাবতই মানুষ সম্পদে পরিণত হবে। যে সম্পদ দুনিয়ায় ব্যক্তির নিজের এবং অপরাপর সকলের কল্যাণ ও মুক্তি নিশ্চিত করবে। প্রসঙ্গত নৈতিক উন্নয়নে ইসলামের কিছু নির্দেশনা উল্লেখ করা যায়। যেমন,

---

৪৭. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : আল-বির ওয়াস সিলাতি ওয়াল আদাব, অনুচ্ছেদ : তাফসীরুল বিররি ওয়াল ইছমি, প্রাগুক্ত, খ. ৪, হাদীস নং-২৫৫৩

৪৮. ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান,* অধ্যায় : আস-সুন্নাহ, অনুচ্ছেদ : আদ-দলীলু আলা যিয়াদাতিল ঈমানি ওয়া নুকসানিহী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৫৪; হাদীস নং-৪৬৮৪। হাদীসটির সনদ হাসান সহীহ (حسن صحيح); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যঈফ সুনানি আবি দাউদ,* হাদীস নং-৪৬৮২

৪৯. ইমাম ইবনু মাযাহ, *আস-সুনান,* অধ্যায় : আয-যুহদ, অনুচ্ছেদ : যিকরুল মাওতি ওয়াল ইসতিদাদ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪২৫৯। হাদীসটির সনদ সহীহ (صحيح) মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সিলসিলাতুল আহাদীছিছ সহীহাহ,* প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৩৮৪

৫০. আল-কুরআন, ২৩ : ১-৫

১. কুরআন অধ্যয়ন

কুরআন হচ্ছে মুমিনের গাইড লাইন, জীবন বিধান। এর মধ্যে আল্লাহ তাআলা মানুষের করণীয়-বর্জনীয় সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশনা দিয়েছেন। সুন্দর চরিত্র গড়ে তোলার জন্য সবার আগে তাই কুরআন অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। কুরআন অধ্যয়ন বলতে শুধু দেখে দেখে তিলাওয়াত বুঝায় না। বরং কুরআন অধ্যয়ন হলো এর মর্মার্থ, তাৎপর্য ও গুরুত্ব অনুধাবন করে পড়া। শুধু দেখে দেখে কুরআন তিলাওয়াত করলে চরিত্রের ওপর তার সর্বব্যাপক প্রভাব পড়বে না। তাই সুন্দর চরিত্র গড়ে তুলতে হলে বুঝে কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে। বুঝে কুরআন তিলাওয়াত না করে শুধু দেখে তিলাওয়াত করলে সওয়াব পাওয়া যাবে, কিন্তু তাতে কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য হল, কুরআনকে চরিত্রে পরিণত করা। যেমন আল্লাহর রাসূল স.-এর ইন্তিকালের পর সাহাবীগণ যখন তাঁর চরিত্র সম্পর্কে জানতে চাইলেন, আয়িশা রা. বিনা দ্বিধায় বলে দিলেন, كَانَ خُلُقُهُ تَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ "তোমরা যে কুরআন পড় সে কুরআনই তাঁর চরিত্র।"[৫১]

একজন ব্যক্তি যদি দাবি আদায় করে আল-কুরআন তিলাওয়াত করেন, তাহলে কুরআনই তাকে পথ দেখিয়ে দেবে। আর কুরআন মাজীদের শিক্ষা ব্যক্তির আত্মিক-আচরণিক ও বৈষয়িক উন্নতিতে সন্দেহাতীতভাবে ইতিবাচক প্রভাব রাখতে সক্ষম হবে।

২. হাদীস অধ্যয়ন

আল-কুরআনের ব্যাখ্যা হলো হাদীস। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা যে কোনো হুকুমের মূলনীতি বর্ণনা করেছেন। হাদীসে রাসূলুল্লাহ স. সে মূলনীতি বাস্তবায়নের পথনির্দেশ করেছেন। রাসূলুল্লাহ স. নিজে থেকে কোনো কথা বা তত্ত্ব হাদীসের মাধ্যমে পেশ করেননি। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى-إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى ﴾

আর তিনি (মুহাম্মাদ স.) নিজ প্রবৃত্তি থেকে কোনো কথা বলেন না। তাঁর নিকট প্রেরিত ওহী ছাড়া এগুলো আর কিছু নয়।[৫২]

---

৫১. ইমাম বুখারী, *আল-আদাবুল মুফরাদ*, তাহকীক : মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, অধ্যায় : হুসনুল খুলুক, অনুচ্ছেদ : মান দাআল্লাহ আন ইউহসিনা খুলুকাহু, বৈরূত : দারুল বাশাইর আল-ইসলামিয়্যাহ, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪০৯হি./১৯৮৯ খ্রি., পৃ. ১১৬, হাদীস নং-৩০৮। মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী হাদীসটির সনদ যঈফ (ضعيف) বললেও মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী হাদীসটির সনদকে সহীহ লি-গাইরিবহ (صحيح لغيره) বলেছেন; *সহীহ আল-আদাবুল মুফরাদ লিল ইমাম আল-বুখারী*, আল-জুবাইল, সৌদি আরব : দারুস সিদ্দীক, ১৪২১ হি., হাদীস নং-২৩৪/৩০৮

৫২. আল-কুরআন, ৫৩ : ৩-৪

অন্যত্র সকল মানুষকে আল্লাহ তাআলা আদেশ দিয়েছেন,

﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾

রাসূল তোমাদেরকে যা দেন (অর্থাৎ যা করতে নির্দেশ দেন) তা গ্রহণ করো আর যা থেকে তিনি বিরত থাকতে বলেন, তা থেকে বিরত থাকো।[৫৩]

তাই কুরআন মাজীদের বিধি ও অনুশাসন সঠিকভাবে মেনে চলার জন্য হাদীস অধ্যয়ন করতে হবে। হাদীস অধ্যয়নও ব্যক্তির সামগ্রিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

৩. সত্য বলা

সত্য কথা বলা সুন্দর চরিত্রের শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ। সত্যবাদী হওয়া ছাড়া মুমিন হওয়া যায় না। ইসলাম সত্য, বাকী সবকিছু মিথ্যা। এখন কেউ যদি সত্যকে ধারণ করে সে ধারণ করবে ইসলামকে। আর কেউ যদি মিথ্যা বলার অভ্যাস করে, সে অবশ্যই ইসলাম বর্জনকারী হবে। সত্য মানুষকে সততার পথে পরিচালিত করে, আর মিথ্যা পাপের পথে পরিচালিত করে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন,

إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا

নিশ্চয়ই সত্য মানুষকে সততার পথ দেখায়, আর সততা জান্নাতের পথ দেখায় এমনকি কোন ব্যক্তি সত্য বলতে বলতে আল্লাহর নিকট সিদ্দীক বা পরম সত্যবাদী হিসাবে লিখিত হয়, আর মিথ্যা মানুষকে পাপাচারের পথ দেখায়, আর পাপাচার জাহান্নামের পথ দেখায়, এমনকি কোন ব্যক্তি মিথ্যা বলতে বলতে আল্লাহর নিকট কাযযাব বা চরম মিথ্যাবাদী হিসাবে লিখিত হয়।[৫৪]

সত্যবাদীগণ আল্লাহ তাআলার পরম সন্তোষ ও সাফল্য লাভ করে থাকেন। যেমন,

﴿ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾

আল্লাহ বলেন 'এটা তো সেদিন, যেদিন সত্যবাদীরা তাদের সত্যবাদিতার জন্য উপকৃত হবে, তাদের জন্য রয়েছে এমন জান্নাত যার নিচ দিয়ে ঝর্ণাসমূহ বয়ে যায়, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এটাই তো মহাসাফল্য।[৫৫]

---

৫৩. আল-কুরআন, ৫৯ : ৭

৫৪. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-আদাব, অনুচ্ছেদ : কওলুল্লাহি তাআলা ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানুত্তাকুল্লাহি ওয়া কূনু মাআস সাদিকীন, ওয়ামা ইউনহা আনিল কিযব, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫৭৪৩

৫৫. আল-কুরআন, ০৫ : ১১৯

সত্য বলার অভ্যাস মানুষের ব্যক্তিত্বকে এমন উন্নত করবে যে, সে সকলের বিশ্বাসভাজন হবে।

৪. সবর

সবর বা ধৈর্য ধারণ করা সুন্দর চরিত্রের একটি অনিবার্য দিক। ধৈর্যধারণ ছাড়া সুন্দর চরিত্র সার্থক ও অর্থবহ হয় না। সুন্দর চরিত্রের অধিকারী হতে হলে তাই ধৈর্যের অনুশীলন করতে হবে। কুরআন মাজীদে এসেছে,

﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴾

আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন ধৈর্যশীলদের।[৫৬]

অন্য আয়াতে তিনি বলেন,

﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾

নিশ্চয়ই আল্লাহ আছেন ধৈর্যশীলদের সাথে।[৫৭]

রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন,

وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ

সবর বা ধৈর্যের বিনিময় হলো জান্নাত।[৫৮]

তিনি আরো বলেছেন, الصَّبْرُ نِصْفُ الإِيمَانِ 'সবর বা ধৈর্য ঈমানের অর্ধাংশ'।[৫৯]

ধৈর্যশীল মানুষ নিঃসন্দেহে অনন্য গুণের অধিকারী। মানবকে সম্পদে পরিণত করার অন্যতম মৌলিক এ গুণটি অর্জন করা ইসলাম মুমিনের জন্য আবশ্যিক করেছে।

৫. কৃতজ্ঞতা

আল্লাহ তাআলা মানুষকে অসংখ্য নিআমাত দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলার এ নিআমতসমূহের বিনিময়ে তাঁর আদেশ পালন করা হলো কৃতজ্ঞতা জানানো। আল্লাহ তাআলার আদেশ মেনে চললে মানুষ কোনো খারাপ কাজ করতে পারবে না। ফলে তার চরিত্র সুন্দর হবে। আল্লাহ তাঁর নিআমত আরো অধিকহারে শোকরকারীকে দান করবেন। যেমন তিনি বলেছেন,

﴿ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ﴾

যদি তোমরা শোকর করো, তাহলে অবশ্যই আমি তোমাদের নিআমত বাড়িয়ে দেবো।[৬০]

---

৫৬. আল-কুরআন, ০৩ : ১৪৬

৫৭. আল-কুরআন, ০২ : ১৫৩

৫৮. ইমাম বায়হাকী, *শুআবুল ঈমান*, অনুচ্ছেদ : ফাযায়িলু শাহরি রমাযান, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩৬০৮। হাদীসটির সনদ মুনকার (منكر); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সিলসিলাতুল আহাদীছিয যঈফা ওয়াল মাওযূআহ*...., প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৮৭১

৫৯. ইমাম বায়হাকী, *শুআবুল ঈমান*, অনুচ্ছেদ : ফিস সবরি আলাল মাসায়িব...., প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৯৭১৬। হাদীসটির সনদ মুনকার (منكر); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীছিস যঈফা...., প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪৯৯

যারা আল্লাহ তাআলার নিআমতের শোকর করে তাদের পক্ষেই অন্যান্যদের উপকার স্বীকার করা এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সম্ভব। কৃতজ্ঞ মানুষকে আল্লাহ তাআলা যেমন ভালবাসেন তেমনি মানুষও কৃতজ্ঞ মানুষের জন্য আরও কিছু করার আগ্রহ পোষণ করে থাকেন। ইসলামের শিক্ষা মানুষকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে অভ্যস্ত করে তোলে। এতে ব্যক্তি সর্বজনপ্রিয় ও শ্রদ্ধেয় হয়ে ওঠে।

৬. আমানত সুরক্ষা

মানুষের নৈতিক উন্নয়নের অন্যমত শ্রেষ্ঠ প্রকাশ আমানতদারিতা। আমানতদারিতা এক মহান নৈতিক গুণ। এ গুণ মানুষের কাছে মানুষকে বিশ্বাসভাজন ও ভালোবাসার পাত্র করে তোলে। মানুষ অবলীলায় তার কথা শোনে। তার কাছে তাদের সম্পদ এমনকি সম্মান পর্যন্ত আমানত রাখতে দ্বিধাবোধ করে না। ঈমান ও আমানতদারিতা অবিচ্ছেদ্য বিষয়। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

لاَ إِيْمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ যার আমানতদারিতা নেই তার ঈমান নেই।[৬১]

আল্লাহ তাআলা আমানত সুরক্ষাকে ফরয করেছেন। কুরআন মাজীদে এসেছে,

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾

নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ তার হকদারের কাছে ফিরিয়ে দিতে।[৬২]

মানবসম্পদ উন্নয়নে গৃহীত বিপুল কর্মসূচি, বিস্তারিত কর্মশালা দিয়ে ব্যক্তির ভেতর আমানতদারিতা তৈরির নিরন্তর চেষ্টা পরিচালনা করতে দেখা যায়। অথচ ঈমান ও ইসলামের শিক্ষা ব্যক্তিকে আখিরাতে জবাবদিহিতার চেতনায় স্বভাবতই আমানতদার করে তোলে।

৭. ওয়াদা পালন

ওয়াদা এক ধরনের আমানত। কাউকে কথা দিলে তা রাখতে হয়। ওয়াদা করলে তা পালন করতে হয়। আল্লাহ তাআলা ওয়াদালঙ্ঘনকারীকে ভালোবাসেন না। তিনি ওয়াদা পালনের আদেশ দিয়ে বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾

মুমিনগণ! তোমরা চুক্তিসমূহ পূর্ণ করো।[৬৩]

---

৬০. আল-কুরআন, ১৪ : ৭

৬১. ইমাম বায়হাকী, *শুআবুল ঈমান*, অনুচ্ছেদ : ফিল ঈফা-ই বিল উকূদ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪৩৫৪; হাদীসটির সনদ সহীহ (صحيح); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩০০৪

৬২. আল-কুরআন, ০৪ : ৫৮

৬৩. আল-কুরআন, ০৫ : ০১

রাসূলুল্লাহ স. নিজে ওয়াদা রক্ষা করেছেন। তাঁর সাহাবীগণ এ ব্যাপারে তাঁকে পুরোপুরি অনুসরণ করেছেন। ওয়াদা পালন বা প্রতিশ্রুতি রক্ষা মানবিক উন্নয়নের অন্যতম দৃষ্টান্ত। ঈমান আনার সাথে সাথে ব্যক্তি প্রতিশ্রুতি পালনেও প্রত্যয় গ্রহণ করে।

৮. হিংসা-বিদ্বেষ থেকে বেঁচে থাকা

সুন্দর চরিত্রের অধিকারী হওয়ার প্রধান উপায় হলো হিংসা-বিদ্বেষ পরিহার করা। হিংসা, অহঙ্কার, ঘৃণা, নিজেকে বড় এবং অন্যকে নীচ মনে করার হীনমানসিকতা সুন্দর চরিত্রের সম্পূর্ণ বিরোধী বিষয়। রাসূলুল্লাহ স. হিংসা-অহঙ্কারকে পুণ্য ধ্বংসের কারণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الحطب

তোমরা হিংসা-বিদ্বেষ থেকে বেঁচে থাকো। কেননা আগুন যেমন কাঠ ভস্মিভূত করে, হিংসা-বিদ্বেষও তেমনি সৎ আমল নষ্ট করে।[৬৪]

হিংসা-বিদ্বেষ মানবিক গুণ বিরোধী। এটি মানুষকে দাম্ভিক করে। এমন ব্যক্তি কোন কাজে সফল হতে পারে না। মানবসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে তাই হিংসা-বিদ্বেষ থেকে ব্যক্তিকে মুক্ত করার কথা বলা হয়ে থাকে। ঈমান এমন একটি অনন্য প্রশিক্ষণ, যা মানুষকে হিংসা-বিদ্বেষ থেকে দূরে রেখে সকলের নিকট প্রিয় এবং শ্রদ্ধেয় করে তোলে।

৯. ধূমপান ও মাদকাসক্তি থেকে দূরে থাকা

মানবসম্পদ ধ্বংসের ক্ষেত্রে ধূমপান ও মাদকাসক্তির কুপ্রভাব অত্যন্ত কার্যকর। ইসলাম তাই ধূমপান ও মাদকাসক্তি ত্যাগের নির্দেশনা দিয়েছে। ধূমপানে অর্থ-সম্পদের অপচয় হয়, ব্যক্তির নিজের ও অন্যের ক্ষতি হয়। আল্লাহ তাআলা এসবই হারাম ঘোষণা করে বলেছেন: ﴿ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا﴾

আর কোনোক্রমেই অপচয় করবে না।[৬৫]

﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾

নিজেদের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না।[৬৬]

অন্যদিকে আল্লাহ তাআলা মাদক সেবনকে সরাসরি হারাম ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

---

৬৪. ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-আদাব, অনুচ্ছেদ : আল-হাসাদ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪৯০৫। হাদীসটির সনদ যঈফ (ضعيف); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সিলসিলাতুল আহাদীছিয যঈফা*...., প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৯০২

৬৫. আল-কুরআন, ১৭ : ২৬

৬৬. আল-কুরআন, ০২ : ১৯৫

> হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী এবং ভাগ্য নির্ধারক তীর অবশ্যই শয়তানের অপবিত্র ও ঘৃণ্য কাজের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই তোমরা তা বর্জন করো, তাহলে তোমরা কল্যাণ লাভ করবে।[৬৭]

বিভিন্ন সংস্থা এবং দেশ এমনকি আন্তর্জাতিক নানা সংঘ ধূমপান ও মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেও তেমন কোন সুফল অর্জন করতে পারেনি। ফলে এর ক্ষতি থেকে মানবজাতিকে সঠিকভাবে রক্ষা করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। অথচ ইসলামের ঘোষণা ও শিক্ষা এক্ষেত্রে মুমিনকে ধূমপান ও মাদকাসক্তি থেকে প্রকৃতার্থেই দূরে রাখতে সক্ষম।

১০. কথা ও কাজে মিল রাখা

কথায়–কাজে মিল রাখা সুন্দর চরিত্র অর্জনের অন্যতম মাধ্যম। আল্লাহ্ তাআলা কথা–কাজের অমিলকে হারাম ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ - كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾

> হে মুমিনগণ! তোমরা এমন কথা কেন বলো, যা তোমরা করো না? আল্লাহর নিকট এটা অত্যন্ত অপ্রিয় যে, তোমরা যা বলো তা করো না।[৬৮]

মানবসম্পদের প্রকৃত উন্নয়ন সাধনের জন্য কথা ও কাজের মিল থাকা আবশ্যক। কারণ কথা ও কাজের বৈপরীত্ব থাকলে মানুষকে প্রকৃত মানুষ বলা চলে না। এমন মানুষকে কেউ ভালোবাসে না। বিশ্বাসও করে না। কথা ও কাজের মিল প্রতিষ্ঠাকে ঈমানের অনিবার্য শর্ত করে দিয়ে ইসলামে মানবসম্পদ উন্নয়নের ঈমানী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

উপসংহার

বস্তুত মানুষের প্রকৃত উন্নয়ন, মানবিক ও নৈতিক গুণে বিভূষিত হওয়া, মানুষকে আত্মিক ও বাহ্যিক দিক থেকে সত্যিকার গুণ ও আচরণে সমৃদ্ধ সম্পদে পরিণত করার ক্ষেত্রে আধুনিক বিশ্বে প্রচলিত সকল চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। সে কারণে তথাকথিত সভ্য সমাজে, অফিসে, দেশে, পরিবারে মানুষের কাছে মানুষের নিরাপত্তা প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। মানুষই মানুষের সম্পদ, সম্মান ও জীবনের হুমকিতে পরিণত হচ্ছে। মানুষের আচরণ স্বার্থপরতা, হীনতা ও পাশবিকতায় ভরে ওঠেছে। এ অবস্থা নির্মূল করে মানুষকে সত্যিকারার্থে সম্পদে পরিণত করার জন্য ইসলামী আদর্শ ও শিক্ষার অনুশীলন অনিবার্য – আলোচ্য নিবন্ধে উপস্থাপিত তথ্য, প্রমাণ ও বিশ্লেষণ এ বিষয়টির অবিসংবাদিত প্রমাণ। এ কারণে মানবসম্পদের চিরস্থায়ী উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য সর্বক্ষেত্রে ইসলামের অনুশীলন অনিবার্য।

---

৬৭. আল-কুরআন, ০৫ : ৯০

৬৮. আল-কুরআন, ৬ : ২–৩

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১০ সংখ্যা : ৩৮
এপ্রিল - জুন : ২০১৪

নারীর কর্মের অধিকার ও ইসলাম

মুহাম্মদ আজিজুর রহমান*

[**সারসংক্ষেপ :** *নারী অধিকার ও মর্যাদার বিষয়টি সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই একটি আলোচিত বিষয়। বিশেষ করে বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদে নারীর অবস্থান, মূল্যায়ন, মর্যাদা, অধিকার, দায়িত্ব, ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা ও মতপার্থক্য সবযুগেই ছিল, এখনো বিদ্যমান। সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী জীবনব্যবস্থা ইসলামের মাধ্যমে নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ইসলাম বিরোধী শক্তি বরাবরই ইসলামের প্রতি অভিযোগ করে যে, ইসলাম নারীকে চার দেয়ালের মধ্যে বন্দি করে রেখেছে। তাদের স্বাধীনতাকে হরণ করে তাদেরকে বঞ্চিত করেছে। অথচ বাস্তবতা এর পুরো উল্টো। কুরআন, হাদীস, ইসলামের ইতিহাস ও ফিক্‌হের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলি অনুসন্ধান করে দেখা যায়, ইসলাম নারীকে প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যেতে বাধা দেয়নি। বাংলা ভাষায় ইসলামের নারীর অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে প্রচুর লেখালেখি, গবেষণা হলেও সুনির্দিষ্টভাবে বহিরাঙ্গনে নারীর কর্মের অধিকার সম্পর্কে ইতঃপূর্বে খুব বেশি গবেষণা হয়নি। তাই নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হলেও নারী ক্ষমতায়নের শ্লোগানের এই যুগে নারীর কর্মের অধিকার প্রসঙ্গে ইসলামী শরীয়াতের নির্দেশনা সম্পর্কে এখনো বিভ্রান্তি বিরাজমান। বর্তমান প্রবন্ধে সেই বিভ্রান্তির নিরসনকল্পে নারীর কর্মের সংজ্ঞা, ইসলামে কর্মের গুরুত্ব ও তাৎপর্য, নারীর কর্মের অধিকার প্রসঙ্গে ইসলামী শরীয়াতের নীতিমালা কুরআন, হাদীস, মুসলিম পণ্ডিতগণের অভিমত ও উদ্ধৃতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, ইসলাম নারীকে তার কর্মের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেনি; বরং তার অধিকার নির্বিঘ্নে ও নিরাপদে বাস্তবায়নের জন্য সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দিয়েছে।*]

মহান আল্লাহ্ মানবজাতিকে পুরুষ এবং নারী-এ দু'ভাগে বিভক্ত করে সৃষ্টি করেছেন। তাদেরকে পৃথিবীতে মেধা ও শ্রম বিনিয়োগ করে জীবিকা উপার্জনের অধিকার প্রদান করেছেন। সাথে সাথে পুরুষ ও নারীর কর্ম ও দায়িত্বের ব্যপ্তি ও পরিধিও সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। কর্মই সাফল্যের চাবিকাঠি। কর্মহীন জীবনের কোন মূল্য নেই। তাই নারীও পুরুষের মত কর্ম করতে আগ্রহী। কিন্তু নারীর কর্মের প্রয়োজনীয়তা, সীমারেখা, প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয়ে মানবরচিত কোন আইনে সুষ্ঠু নির্দেশনা দেয়া হয়নি। অথচ ইসলাম এ ব্যাপারে সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য উপকারী সুষ্ঠু নারীবান্ধব নির্দেশনা প্রদান করেছে।

---

* এম.ফিল গবেষক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

নারীর কর্ম-এর সংজ্ঞা

নারীর কর্ম-এর সংজ্ঞা দেয়ার পূর্বে কর্ম শব্দের অর্থ জানা জরুরী। কর্ম শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো, কাজ; যা করা হয়; ক্রিয়া; অনুষ্ঠান; জীবিকা; ব্যবসায়[১]। আরবীতে কর্মের সমার্থক শব্দ হিসাবে العمل - المهنة - الفعل - الصنع ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়; যেগুলোর অর্থও কাজ, কর্ম, পেশা, বৃত্তি, ক্রিয়া, শ্রম ইত্যাদি।[২] যে কোন ধরনের দৈহিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক কাজকেই কর্ম অভিধায় অভিহিত করা যায়। যখন কোন কর্ম নারীর দ্বারা সম্পাদিত হয়, তখন সেটাকে নারীর কর্ম বলা হয়।

খালিদ আল-হাযিমী তাঁর 'উসূলুত তারবিয়াতিল ইসলামিয়্যাহ' গ্রন্থে নারীর কর্ম-এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে,

> هو تلك الجهود البدنيّة والفكريّة التي تبذلها المرأة في الميدان العمليّ لتحقيق منفعة
>
> কোন স্বার্থ বা উপকার অর্জনের উদ্দেশ্যে কর্মক্ষেত্রে নারী যে শারীরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচেষ্টা পরিচালনা করে তাকেই নারীর কর্ম বলা হয়।[৩]

বর্তমান প্রবন্ধে নারীর দ্বারা কৃত সকল প্রকার কর্মকে নারীর কর্ম নামে না বুঝিয়ে বরং জীবিকা বা অর্থ উপার্জনের নিমিত্ত ঘরের বাইরে সম্পাদিতব্য কর্মকে বুঝানো হচ্ছে।

ইসলামে কর্মের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ইসলাম একটি কর্ম-নির্ভর জীবন ব্যবস্থা। পৃথিবীতে অনেক ধর্ম রয়েছে যেগুলোর বিশ্বাসের দিকটি কর্মের দিকের তুলনায় এতটাই ব্যাপক যে, ঐসব ধর্মকে কর্ম-নির্ভর ধর্ম না বলে বিশ্বাস-নির্ভর ধর্ম বলাই শ্রেয়। ইসলামই হচ্ছে একমাত্র জীবন ব্যবস্থা, যেখানে বিশ্বাস ও কর্মের মাঝে এমনভাবে সমন্বয় করা হয়েছে, যা এই ধর্মটির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। পবিত্র কুরআন-এর বহু স্থানে ঈমান আনার সাথে সাথে আমলে সালিহ (সৎকর্ম) সম্পাদনের কথা বলা হয়েছে।[৪] ইসলামে নারীর কর্মের অধিকার বর্ণনার পূর্বে সাধারণভাবে কর্মের প্রতি ইসলামের গুরুত্ব প্রদানের কয়েকটি দিক উপস্থাপন করা খুবই প্রাসঙ্গিক মনে করি।

---

১. ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক, শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী ও স্বরোচিষ সরকার সম্পাদিত, *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, দ্বাদশ পুনর্মুদ্রণ, ২০১০, পৃ. ২২৯

২. ইবনু মানযুর আল-আফরীকী, *লিসানুল আরাব*, বৈরূত : দারু সাদির, তা.বি., খ. ১১, পৃ. ৪৭৪; *আল-মুনজিদ ফিল লুগাতি ওয়াল 'আলাম*, বৈরূত : দারুল মাশরিক, ৪১ নং সংস্করণ, ২০০৫, পৃ. ৫৩০-৫৩১; ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী বাংলা অভিধান*, ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ৫ম সংস্করণ, ২০০৮, পৃ. ৫৭৮-৮৫৫

৩. খালিদ আল-হাযিমী, উসূলুত তারবিয়াতিল ইসলামিয়্যাহ,...পৃ. ১৭২; http://forum.uaewomen.net/showthread.php?t=218024 date : 09.06.2014.

৪. আল-কুরআন, ০২ : ২৫, ৮২, ২৭৭; ০৩ : ৫৭; ০৪ : ৫৭, ১২২, ১৭৩; ১৩ : ২৯; ১৪ : ২৩; ১০৩ : ০৩

১. ইসলামী শরীয়াত মানুষকে কর্মের প্রতি উৎসাহিত করে

ইসলাম ব্যক্তির নিজ হাতে উপার্জিত উপার্জনের দ্বারা অর্জিত খাবারকে শ্রেষ্ঠ খাবার বলে ঘোষণা করেছে। মিকদাদ রা.-এর সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন,

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

কোন ব্যক্তি তার নিজ হাতে (অর্থাৎ নিজ মেধা ও শক্তিতে) উপার্জিত সম্পদের চাইতে উত্তম কোন কিছু খাদ্য হিসাবে কখনো খায় না।[৫]

এর অর্থ হলো কোন ব্যক্তির নিজের উপার্জিত খাদ্যই সর্বশ্রেষ্ঠ খাদ্য।

হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী রহ. এই হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন,

وفي الحديث فضل العمل باليد وتقديم ما يباشره الشخص بنفسه على ما يباشره بغيره

এই হাদীসে নিজ হাত দ্বারা কর্ম সম্পাদনের গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। আর ব্যক্তির সরাসরি উপার্জিত সম্পদকে অন্যের মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদের উপর অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।[৬]

২. ব্যক্তির উপার্জিত খাদ্যই পবিত্রতম খাদ্য

ব্যক্তি তার নিজের উপার্জিত অর্থ/সম্পদের মাধ্যমে যে খাদ্য গ্রহণ করে সে খাদ্যই সবচেয়ে পবিত্র খাদ্য। আয়িশা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন,

إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ

ব্যক্তির উপার্জনের মাধ্যমে সংগৃহীত খাদ্যই পবিত্রতম খাদ্য যা সে খায়। আর তার সন্তানও তার উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত।[৭]

৩. সকল নবীই ব্যবসা করেছেন কিংবা উপার্জনের পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন

নবীগণ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ মানুষ। তাঁরা শ্রেষ্ঠ এবং আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ প্রাপ্তির পরও তাঁরা নিজেদেরকে পূজনীয় ও বরণীয় আসনে অধিষ্ঠিত করে অন্যের কষ্টার্জিত সম্পদ ভোগ করতেন না। বরং তাঁরা সকলেই নিজের কষ্টার্জিত সম্পদে জীবিকা নির্বাহ করতেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

৫. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ', পরিচ্ছেদ : কাসবুর রজুলি ওয়া 'আমালুহু বি-ইয়াদিহী, বৈরূত : দারু ইবনি কাছীর, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি., হাদীস নং-১৯৬৬

৬. ইমাম ইবন হাজার আল-আসকলানী, *ফাতহুল বারী শারহি সহীহিল বুখারী*, বৈরূত : দারুল মা'রিফা, ১৩৭৯ হি., খ. ৪, পৃ. ৩০৬

৭. ইমাম আন-নাসায়ী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ, পরিচ্ছেদ : আল-হাছছু 'আলাল-কাসবি, হালব : মাকতাবুল মাতবূ'আতিল ইসলামিয়্যাহ, ১৪০৬ হি./ ১৯৮৬ খ্রি., হাদীস নং-৪৪৫২; হাদীসটির সনদ (صحيح); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যঈফ সুনানুন নাসায়ী*, হাদীস নং-৪৪৫২

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الأَسْوَاقِ﴾
তোমার পূর্বে আমি যে সকল রাসূল প্রেরণ করেছি তারা সকলেই তো আহার করত ও হাটে-বাজারে চলাফেরা করত।[৮]

এই আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত মুফাসসির ইমাম ইবনু কাছীর রহ. লিখেন,

يقول تعالى مخبرا عن جميع مَنْ بعثه من الرسل المتقدمين: إنهم كانوا يأكلون الطعام، ويحتاجون إلى التغذي به { وَيَمْشُونَ فِي الأَسْوَاقِ } أي: للتكسب والتجارة
"পূর্বে প্রেরিত সকল রাসূল সম্পর্কে সংবাদ জানাতে আল্লাহ বলেন যে, তাঁরা সকলেই খাদ্য খেতেন এবং তাঁরা সকলেই খাবার গ্রহণের প্রতি মুখাপেক্ষী ছিলেন। অনন্তর তাঁরা উপার্জন ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে হাটে-বাজারে আসা-যাওয়া করতেন।"[৯]

৪. জীবিকা উপার্জনে নিয়োজিত ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধরত মুজাহিদের সমতুল্য

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾
আল্লাহ জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে, কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে দেশ ভ্রমণ করবে এবং কেউ আল্লাহর পথে সংগ্রামে লিপ্ত হবে। কাজেই তোমরা কুরআন হতে যতটুকু সহজসাধ্য আবৃত্তি কর।[১০]

উপরোল্লিখিত আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত মুফাস্সির ইমাম কুরতুবী রহ. লিখেছেন,

سوى الله تعالى في هذه الآية بين درجة المجاهدين والمكتسبين المال الحلال للنفقة على نفسه وعياله، والاحسان والافضال، فكان هذا دليلا على أن كسب الال بمنزلة الجهاد، لانه جمعه مع الجهاد في سبيل الله.
আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে মুজাহিদদের মর্যাদা এবং নিজের ও পরিবারের ব্যয় নির্বাহ করা এবং অন্যদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করার উদ্দেশ্যে হালাল অর্থ-সম্পদ উপার্জনকারীদের মর্যাদাকে সমানরূপে উল্লেখ করেছেন। কাজেই এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, হালাল পন্থায় জরুরী অর্থসম্পদ উপার্জন জিহাদের সমমর্যাদাসম্পন্ন। কারণ আল্লাহ নিজেই উপার্জনকে তার রাস্তায় জিহাদের সাথে একত্রে বর্ণনা করেছেন।[১১]

---

৮. আল-কুরআন, ২৫ : ২০

৯. ইমাম ইবনু কাছীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, রিয়াদ : দারু তীবাহ/তায়্যিবাহ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি., খ. ৬, পৃ. ১০০, সংশ্লিষ্ট আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য

১০. আল-কুরআন, ৭৩ : ২০

১১. ইমাম কুরতুবী, *আল-জামি, লিআহকামিল কুরআন*, রিয়াদ : দারু 'আলামিল কুতুব, ১৪২৩ হি./ ২০০৩ খ্রি., খ. ১৯, পৃ. ৫৫

কা'ব বিন 'উজরাহ রা. বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সা. এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাহাবীগণ ঐ ব্যক্তির কর্মশক্তি ও তৎপরতা দেখে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, যদি এ ব্যক্তি তার এই কাজ (কষ্ট স্বীকার) আল্লাহর রাস্তায় করত, (তাহলে সে কতইনা লাভবান হত)! এ কথার উত্তরে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন,

إن كان يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وإن كان يسعى على ولده صبية فهو في سبيل الله وإن كان يسعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله عز و جل

যদি ঐ ব্যক্তি তার বয়োজ্যেষ্ঠ মাতা-পিতার ভরণ-পোষণের খরচ যোগাতে বের হয়ে থাকে, তাহলেও সে আল্লাহর পথেই আছে। আর যদি ঐ ব্যক্তি তার শিশু-সন্তানের ভরণ-পোষণের খরচ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বের হয়ে থাকে, তাহলে সে (মূলত) আল্লাহর পথেই আছে। এমনকি সে যদি নিজের নাফসকে সংযত রাখার জন্য নিজের প্রয়োজনীয় খরচ নির্বাহের উদ্দেশ্যেও বাইরে বের হয়, তাহলেও সে আল্লাহর পথে রয়েছে।[১২]

৫. কর্ম হচ্ছে দারিদ্র্য বিমোচনের ও ভিক্ষাবৃত্তি থেকে পরিত্রাণের মাধ্যম

আদিকাল থেকেই সমাজে দারিদ্র্যাবস্থা বিরাজমান। দারিদ্র্য অনেক সময় মানুষকে কুফরির দিকে ধাবিত করে। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন,

كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْراً

দারিদ্র্য কুফরে (লিপ্ত হওয়ার কারণে) পরিণত হতে পারে।[১৩]

তাই রাসূলুল্লাহ সা. নিজে দারিদ্র্য থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন এবং উম্মাতকেও দারিদ্র্য থেকে মুক্তির জন্য প্রার্থনা করতে নির্দেশ দিয়েছেন।[১৪]

ইসলামী শরীয়াত দারিদ্র্য বিমোচন ও ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধের জন্য সামর্থ্যবান সবাইকে কর্মের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন। যুবাইর ইবনুল আওয়াম রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন,

لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلا فَيَأْخُذَ حُزْمَةً مِنْ حَطَبٍ فَيَبِيعَ فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهِ وَجْهَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أُعْطِيَ أَمْ مُنِعَ

---

[১২] ইমাম বায়হাকী, *শুআবুল ঈমান*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১০ হি., হাদীস নং-৮৭১০; হাদীসটির সনদ সহীহ লি-গাইরহী (صحيح لغيره); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব*, তা.বি., হাদীস নং-১৬৯২

[১৩] ইমাম বায়হাকী, *শুআবুল ঈমান*, পরিচ্ছেদ : আল-হাছছু আলা তারকিল গিল্লি ওয়াল হাসাদ, হাদীস নং-৬৬১২; হাদীসটির সনদ যঈফ (ضعيف); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সিলসিলাতুল আহাদাহিছ যঈফাহ ওয়াল মাওযূআহ ওয়া আছারুহাছ ছায়্যি ফিল উম্মাহ*, রিয়াদ : দারুল মা'আরিফ, ১৪১২ হি., ১৯৯২ খ্রি., হাদীস নং-৪০৮০

[১৪] ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-কিতাব, পরিচ্ছেদ : আল-ইসতি'আযাহ, বৈরূত : দারুল কিতাবিল আরাবী, তা.বি., হাদীস নং-১৫৪৬; হাদীসটির সনদ সহীহ (صحيح); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *তাখরীজু আহাদীছি মুশকিলাতিল ফাকরি ওয়া কাইফা আলাজাহাল ইসলাম*, বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৫ হি./১৯৮৪ খ্রি., হাদীস নং-৪

কোন ব্যক্তি মানুষের কাছে ভিক্ষা করবে; মানুষ তাকে কিছু দিতেও পারে আবার নাও দিতে পারে (এ রকম বিব্রতকর ও অসম্মানজনক) অবস্থার মুখোমুখি হওয়ার চেয়ে উত্তম হলো, সে ব্যক্তি কিছু রশি নিয়ে জঙ্গলে গিয়ে কাঠ সংগ্রহ করে আঁটি বেধে বাজারে বিক্রি করবে আর এর মাধ্যমে আল্লাহ তাকে ঐ অবস্থার অমুখাপেক্ষী করবেন।[১৫]

আল্লামা বদরুদ্দীন আল-আয়নী রাহ. এই হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন,

والمعنى إن لم يجد إلا الاحتطاب من الحرف فهو مع ما فيه من امتهان المرء نفسه ومن المشقة خير له من المسألة

এর অর্থ হলো- যদি সে কাঠ সংগ্রহ করা ছাড়া অন্য কোনো কাজ না পায়, তাহলে তার জন্য এ পেশা অবলম্বন করা ভিক্ষাবৃত্তির চাইতে উত্তম, যদিও কাঠ সংগ্রহ নিজের জন্য অবমাননাকর এবং কষ্টদায়ক।[১৬]

৬. উৎকৃষ্ট উপায়ে কর্ম সম্পাদন আল্লাহর প্রিয় বিষয়

আল্লাহ তা'আলা যে রূপ কর্ম ও কর্মপদ্ধতি পছন্দ করেন তা প্রত্যেক মুসলিমের একান্ত কাম্য হওয়া উচিত। আর তাঁর পছন্দনীয় বিষয়গুলোর অন্যতম হলো উৎকৃষ্ট উপায়ে কর্ম সম্পাদন করা। আয়িশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন,

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلاً أَنْ يُتْقِنَهُ

তোমাদের কেউ যখন কোন কর্ম সম্পাদন করে তখন আল্লাহ চান যে, ঐ কর্মটি যেন সে উৎকর্ষের সাথে/সুদক্ষভাবে সম্পাদন করে।[১৭]

নারীর কর্মের অধিকার প্রসঙ্গে ইসলামী শরীয়াতের নীতিমালা

ইসলাম নারীকে তার যথাযথ মর্যাদা ও অধিকার প্রদান করে তাকে সম্মানিত করেছে এবং পারিবারিক ও সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা করেছে। কর্মের ক্ষেত্রে; বিশেষ করে ঘরের বাইরের কর্মের ক্ষেত্রে নারীর অধিকার কতটুকু তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে যথেষ্ট বিভ্রান্তিমূলক আলোচনা রয়েছে। আর এই বিভ্রান্তির সুযোগে ইসলাম বিদ্বেষী মহল নারী আন্দোলন কিংবা নারী অধিকার আন্দোলনের নামে এবং সকল ক্ষেত্রে; বিশেষ করে কর্ম/চাকুরি ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকারের মুখরোচক ও আকর্ষণীয় শ্লোগানের মাধ্যমে একদিকে যেমন মুসলিম নারীকে শরীয়া লঙ্ঘনে প্ররোচিত করছে অপর দিকে অমুসলিম সমাজকে ইসলাম সম্পর্কে ভুল বার্তা দিচ্ছে।

---

১৫. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-মুসাকাত, পরিচ্ছেদ : বায়উল হাতাবি ওয়াল কালাই, বৈরূত : দারু ইবনি কাছীর, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি., হাদীস নং-২২৪৪

১৬. বদরুদ্দীন আল-আয়নী, *উমদাতুল কারী শারহি সহীহিল বুখারী*, হাদীস নং-১৭৪১ এর ব্যাখ্যা দ্র.

১৭. আবু ইয়া'লা আল-মাওসিলী, *আল-মুসনাদ*, অধ্যায় : মুসনাদে আয়শা রা., দিমাশক : দারুল মামুন লিত-তুরাছ, ১৪০৪ হি./১৯৮৪ খ্রি., হাদীস নং-৪৩৮৬। হাদীসটির সনদ সহীহ (صحيح); মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *আস-সিলসিলাতুল আহাদীছিছ সহীহাহ*, রিয়াদ : দারুল মা'আরিফ, তা.বি., হাদীস নং-১১১৩

নারীর কর্মের অধিকার প্রসঙ্গে ইসলামের অবস্থান সুস্পষ্ট ও সব্যাখ্যাত। ইসলাম নারীকে ঘরের মধ্যে যে কোন বৈধ কর্ম সম্পাদন করতে, প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যেতে নিষেধ করেনি বরং অনুমতি দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সা. এর যুগ থেকে বর্তমান পর্যন্ত কুরআন, সুন্নাহ ও ইতিহাস পর্যালোচনা করে আলিমগণ নারীর কর্মের অধিকারের ব্যাপারে কিছু নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন। ইসলামী শরীয়াহ নির্ধারিত এসব নীতিমালা অনুসরণ করে একজন মুসলিম নারী ঘরের বাইরে যে কোন কাজ করতে পারবে বলে আলিমগণ মত দিয়েছেন।[১৮]

ইসলাম উপার্জনের জন্য নারীকে মাঠে-ময়দানে কাজ করতে যেমন আদেশ করেনি, তেমনি নিষেধও করেনি। এটি মৌলিকভাবে বৈধ বিষয়। তবে এই বৈধতা শরয়ী নীতিমালা, মাকাসিদুশ শরীয়াহ (Objectives of Shariah) এবং অকল্যাণ দূরীকরণ ও কল্যাণ অর্জনের শরয়ী মূলনীতির আলোকে পর্যালোচনা করে বাস্তবায়ন করতে হবে। অন্যথায় সামগ্রিক বিপর্যয় অনিবার্য। একজন মুসলিম নারী যদি শরয়ী নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করে ঘরে এবং বাইরে শ্রম প্রদান করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময়ে আখিরাতে যেমন ছাওয়াব প্রদান করবেন, তেমনি দুনিয়ায়ও তাকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করবেন।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ﴾

অতঃপর তাদের প্রতিপালক তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বলেন, আমি তোমাদের মধ্যে কর্মনিষ্ঠ কোন নর অথবা নারীর কর্ম বিফল করি না; তোমরা একে অপরের অংশ।[১৯]

নিম্নে নারীর কর্মের ব্যাপারে ইসলামী শরীয়াহ নির্ধারিত নীতিমালা আলোচনা করা হলো

১. কর্মটি মৌলিকভাবে শরীয়াহ সম্মত হতে হবে

নারী যে কাজটি করবে সেটি মূলগতভাবে ইসলামী শরীয়াহ-এর দৃষ্টিতে বৈধ বা হালাল হতে হবে। পুরুষের মত নারীও বৈধ যে কোন কাজে শ্রম বিনিয়োগ করতে পারবে। যেমন, বৈধ ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিক্ষকতা, ডাক্তারি, নার্সিং, মহিলা পুলিশিং ইত্যাদি। শরীয়ার দৃষ্টিতে বৈধ নয় এমন কোন কাজে শ্রম বিনিয়োগ করা নারী-পুরুষ কারো জন্য বৈধ নয়। যেমন, মদ তৈরি, বহন, পরিবেশন, বিক্রি; সুদি কারবার; পতিতাবৃত্তি ইত্যাদি।

---

১৮. ফযল ইলাহী যহীর, *আত-তাদাবীর আল-ওয়াকিয়্যাহ মিনায যিনা ফিল ফিকহিল ইসলামী*, পৃ. ৬২৫; মাকিয়্যা মির্জা, *মুশকিলাতুল মারআতিল মুসলিমা আল-মু'আসিরা*; পৃ. ২৮২-২৯০; আব্দুর রব নাওয়াবুদ্দীন, *আমালুল মারআতি ওয়া মাওকাফুল ইসলামী মিনহু*, পৃ. ১৭৪-১৯৯; *আল-মারআতুল মুসলিমাহ ওয়া ফিকহুদ দা'ওয়াতি ইলাল্লাহ*, পৃ. ৩৪৯ দ্র.; আহমাদ সামী, *যাওয়াবিতু খুরুজিল মারআহ লিল আমাল*

১৯. আল-কুরআন, ০৩ : ১৯৫

অধিকাংশ মানুষ এই শর্তটির ব্যাপারে হয় জানে না, না হয় শর্তটি উপেক্ষা করে আয়-উপার্জন করে। যেমন, অধিকাংশ মানুষই জানে যে, ইসলামে সুদ-এর লেনদেন কঠোরভাবে হারাম। কিন্তু তারপরও তারা সুদি ব্যাংকে চাকুরি করে কিংবা সুদের লেনদেনের সাথে জড়িত হয়। নারীদের ক্ষেত্রেও এ কথা সমভাবে প্রযোজ্য। সুদ নিষিদ্ধের বিধান দিয়ে আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা মুমিন হও।[২০]

আল্লাহ্ তাআলা অন্যত্র বলেন,

﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

আল্লাহ্ ক্রয়বিক্রয়কে হালাল এবং সুদকে হারাম করেছেন।[২১]

জাবির রা. বলেছেন,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

রাসূলুল্লাহ সা. সুদখোর, সুদদাতা, সুদের হিসাবের লেখক, সুদের সাক্ষিদ্বয়-এর ওপর লা'নাত (অভিশাপ) করেছেন। আর তিনি বলেছেন যে, তারা সবাই সমান অপরাধী।[২২]

এ ছাড়া কৃত্রিম উপায়ে চেহারা লাল ও উজ্জ্বল করার কাজ কিংবা উল্কি আঁকার কাজ ও পরচুলা লাগানোর কাজ করাও হারাম। আবু হুরায়রা রা. বলেন,

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ

আল্লাহ্ তাআলা ঐসব নারীকে লা'নাত করেছেন যে নারী পরচুলা লাগিয়ে দেয়, যাকে লাগিয়ে দেয়; যে নারী দেহে উল্কি এঁকে দেয় এবং যার শরীরে আঁকা হয়।[২৩]

অন্য হাদীসে আয়িশা রা. বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْعَنُ الْقَاشِرَةَ وَالْمَقْشُورَةَ

রাসূলুল্লাহ সা. ঐ নারীকে লা'নাত করেছেন, যে কৃত্রিম উপায়ে চেহারা উজ্জ্বল করে এবং যে এ কাজে সহায়তা করে।[২৪]

---

২০. আল-কুরআন, ২ : ২৭৮

২১. আল-কুরআন, ২ : ২৭৫

২২. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-মুসাকাত, পরিচ্ছেদ : লা'আনা আকিলার রিবা ওয়া মুকিলাহু, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪১৭৭

২৩. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-লিবাস, পরিচ্ছেদ : আল-ওয়াসলু ফিশ-শারি, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫৫৮৯

২৪. ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, বৈরূত : মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি., হাদীস নং: ২৫৫৯৭

উল্লিখিত পেশাসমূহ সহ যেসব পেশা ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে সেসব পেশা বাদে অন্য পেশা অবলম্বন করা যেতে পারে।

২. কর্মটির প্রতি ব্যক্তিগত বা সামাজিক প্রয়োজন থাকতে হবে

নারী সাধারণত কোন প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হবে না। কারণ আল্লাহ্ তাআলা নবী সা.-এর স্ত্রীগণকে ঘরে অবস্থান করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এ বিধান নবীপত্নীগণের পাশাপাশি সমগ্র মুসলিম নারীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾

"আর তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাচীন জাহিলী যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না।"[২৫]

এই আয়াতে বর্ণিত শিষ্টাচারসমূহ নবী-স্ত্রীগণের উদ্দেশ্যে বর্ণিত হলেও এগুলো সমগ্র মুসলিম নারীসমাজের জন্য প্রযোজ্য। কারণ এই আয়াতে প্রত্যেক যুগের মুমিন নারীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে।[২৬]

ইমাম ইবনু কাছীর রহ. বলেন,

هذه آداب أمر الله تعالى بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ونساء الأمة تبع لهن في ذلك

এই শিষ্টাচারসমূহ পালনের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা নবী সা.-এর স্ত্রীগণকে আদেশ করেছেন। আর এই উম্মাতের অন্যান্য নারীও এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত।[২৭]

ইমাম ইবনু কাছীর রহ. সহ অন্যান্য মুফাস্সির এই আয়াত দ্বারা এ বিধান সাব্যস্ত করেছেন যে, নারীরা সাধারণভাবে বাড়িতে অবস্থান করবে, প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বের হবে না।[২৮]

উল্লেখ্য যে, কেউ কেউ এই আয়াতে বর্ণিত নারীদের গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করার বিষয়টি নবী সা. এর স্ত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট বলে সাব্যস্ত করতে চেয়েছেন। যেমন আব্দুল হালীম আবু শুককাহ্ তাঁর "তাহরীরুল মারআতি ফী আহদির রিসালাহ" (রাসূলের যুগে নারী স্বাধীনতা) গ্রন্থে করেছেন।[২৯] তবে এ ক্ষেত্রে সমাধানের পথ হচ্ছে, এই আয়াত

---

২৫. আল-কুরআন, ৩৩ : ৩৩

২৬. ড. আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুল মুহসিন আত-তুর্কির তত্ত্বাবধানে একদল আলিম কর্তৃক প্রণীত, *আত-তাফসীর আল-মুয়াসসার* দ্র.

২৭. ইমাম ইবনু কাছীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৪০৮

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৯, আবু বকর আল-জাযাইরী, *আয়সারুত তাফাসীর*, খ. ৩, পৃ. ২৮৬; *তাফসীরে মুয়াসসার*, প্রাগুক্ত

২৯. আবদুল হালীম আবু শুককাহ, *রসূলের যুগে নারী স্বাধীনতা*, অনুবাদ : আবদুল মান্নান তালিব, ঢাকা : ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফেডারেশন অব স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন্স ও ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট্স, ১৯৯৪, খ. ৩, পৃ. ২২

অবতীর্ণের পর রাসূলুল্লাহ সা. এর যুগে মুমিন নারীগণ কীভাবে এই আয়াতের বিধান পালন করতেন এবং কীভাবে তাঁদের গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান তাঁদের সামাজিক কাজে অংশগ্রহণে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি সে বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করা।[৩০]

সুন্নাহ দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, নারীগণ তাদের প্রয়োজনে ঘরের বাইরে বের হতে পারবে। আয়িশা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন,

إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ

তোমাদের প্রয়োজনে তোমাদেরকে বাইরে বের হওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে।[৩১]

এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নারীরা প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যেতে পারবে। তাছাড়া শরীয়া যে সব ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছে সে সব ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট নিষেধাজ্ঞা না থাকলে অনুমতির বিধানই বহাল থাকবে।

এ বিষয়টি মাকাসিদুশ শরীয়াহ-এর আলোকে বিবেচনা করলেও দেখা যায়, ইসলাম তার অনুসারীদের ওপর কোন কষ্ট বা কঠিন বিষয় আরোপ করে না। আর নারীদের প্রয়োজনে তাদেরকে ঘরের বাইরে বের হওয়ার অনুমতি না দিলে তাদের জীবনযাপন কঠিন হয়ে পড়বে। এ ব্যাপারে কুরআনী মূলনীতি হলো :

﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾

তিনি (আল্লাহ) দীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোন কঠোরতা আরোপ করেননি।[৩২]

এই মূলনীতির ভিত্তিতে বলা যায়, নারীদের প্রয়োজনে ঘরের বাইরে বের হওয়া বৈধ। এই প্রয়োজন কখনো ব্যক্তিগত হতে পারে, কখনো হতে পারে সামাজিক। উভয় অবস্থায়ই অন্যান্য শরয়ী নীতিমালা প্রতিপালন করে নারীরা ঘরের বাইরে বের হতে এবং প্রয়োজনীয় কাজ করতে পারবে।

৩. পুরুষের সাথে অবাধ মেলামেশা ও নির্জনবাস না করা

যে পুরুষকে বিবাহ করা হারাম নয় এমন পুরুষের সাথে অবাধ মেলামেশা ও নির্জনে কাজ করা কোন মুসলিম নারীর জন্য বৈধ নয়। একইভাবে তা কোন পুরুষের জন্যও বৈধ নয়। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী সা. কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন,

لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ

---

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

৩১. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় ; আত-তাফসীর, পরিচ্ছেদ : সূরাতুল আহযাব, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪৫১৭

৩২. আল-কুরআন, ২২ : ৭৮

কোন নারীর সাথে কোন পুরুষ যেন কোন অবস্থাতেই নির্জনে অবস্থান না করে এবং কোন নারী যেন কোনো অবস্থাতেই মাহরাম (এমন পুরুষ যাকে বিবাহ করা হারাম) ছাড়া সফর না করে।[৩৩]

'উকবা ইবনু আমির রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন,

إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاء

(হে পুরুষরা!) তোমরা (একাকী) মেয়েদের কাছে যাওয়া থেকে বিরত থাকো। (এ কথা শুনে) আনসারদের একজন বললো : হে আল্লাহর রাসূল! দেবরের (স্বামীর পিতা-পিতামহ ও পুত্র-প্রপুত্রগণ ছাড়া তার নিকট-আত্মীয় পুরুষগণ) ব্যাপারে কী বলেন? রাসূলুল্লাহ সা. জবাবে বললেন, الْحَمْوُ الْمَوْتُ "দেবর তো মৃত্যু"।[৩৪]

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন,

لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

কোন নারীর সাথে কোন পুরুষ নির্জনে অবস্থান করলে শয়তান সেখানে তৃতীয়জন হিসাবে উপস্থিত থাকে।[৩৫]

উপর্যুক্ত হাদীসগুলো পর্যালোচনা করলে প্রমাণিত হয় যে, মাহরাম নয় এমন পুরুষের সাথে নিভৃতে অবস্থান করা নিষিদ্ধ। তবে নারীর মাহরাম সঙ্গে থাকলে কিংবা নিভৃতে না হলে সমস্যা নেই। সাধারণভাবে একাকী বা নির্জনে না হলে নারী পুরুষের দেখা সাক্ষাতের বিধি-বিধান বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।[৩৬] উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে যে বিধান প্রমাণিত হয় তা হলো, নির্জনে নারী-পুরুষের অবাধ মেলা-মেশার সুযোগ না থাকলে কিংবা নারীর সাথে মাহরাম থাকলে নারী-পুরুষ অন্যান্য শরয়ী বিধান মেনে পরস্পর সাক্ষাৎ এবং প্রয়োজনীয় কর্ম সম্পাদন করতে পারবে।

তবে কর্মস্থলের সার্বিক পরিবেশ ইসলামী না করে ঘরের বাইরে কাজ করতে যাওয়া নারীর জন্য এবং সার্বিক সমাজের জন্য সুফল বয়ে আনবে না। এ দিকে ইঙ্গিত করে সৌদি আরবের সাবেক গ্রান্ড মুফতী শাইখ আব্দুল আযীয বিন বায রাহ. বলেন,

---

৩৩. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-জিহাদ ওয়াস-সিয়ার, পরিচ্ছেদ : মানিকতুতিবা ফী জায়শিন ফাখারাজাত ইমরাতনাতাহু হাজ্জাতান ওয়া কানা লাহু উযরুন হাল ইউযানু লাহু, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৮৪৪

৩৪. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আন-নিকাহ, পরিচ্ছেদ : লা ইয়াখলুওয়ান্না রজুলুন বি-ইমরাআতিন ইল্লা যুমাহরামিন ..., প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪৯৩৪

৩৫. ইমাম আত-তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-ফিতান, পরিচ্ছেদ : লুযূমুল জামা'আহ, বৈরূত : দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবী, তা.বি., হাদীস নং-২১৬৫; হাদীসটির সনদ সহীহ (صحيح); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব*, হাদীস নং-১৯০৮

৩৬. বিস্তারিত দেখুন : আবদুল হালীম আবু শুককাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭-৩১

الدعوة إلى نزول المرأة في الميادين التي تخصّ الرجال أمرٌ خطير على المجتمع الإسلاميّ، ومن أعظم آثاره الاختلاط الذي يعتبر من أعظم وسائل الزنا الذي يفتك بالمجتمع

পুরুষের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রে নারীদের কর্মের ব্যবস্থা করার আহ্বান ইসলামী সমাজব্যবস্থার জন্য বিপজ্জনক। এর সবচেয়ে বড় ক্ষতিকর প্রভাব হচ্ছে, এটি নারী-পুরুষের অবাধ মেলা-মেশার সুযোগ করে দেয়, যা সমাজ বিধ্বংসী ব্যভিচারের দিকে নিয়ে যায়।[৩৭]

৪. শরীয়াহ্ সম্মত পোষাক পরিধান করে বের হওয়া

কোন নারী যদি প্রয়োজনে ঘরের বাইরে বের হতে চায়, তাহলে তাকে শরীয়াহ সম্মত পোষাক পরিধান করে বের হতে হবে। আর শরীয়াহ সম্মত পোষাক হচ্ছে চেহারা ও দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত বাদে বাকী পুরো শরীর ঢিলেঢালা মোটা কাপড় দ্বারা আবৃত করা। নারীদের ঘরে এবং বাইরে পোষাক কেমন হবে তার বিস্তারিত বর্ণনা কুরআন, হাদীস ও এতদ্বসংক্রান্ত বিভিন্ন গ্রন্থাবলিতে রয়েছে।[৩৮]

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾

হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও মুমিনদের নারীগণকে বল, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৩৯]

উম্মু আতিয়্যাহ রা. বলেন,

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِى الْفِطْرِ وَالأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاَةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ. قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَانَا لاَ يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ « لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا »

আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সা. এ মর্মে নির্দেশ দেন যে, ‘ঈদুল ফিতর ও ‘ঈদুল আযহার সময় আমরা যেন আমাদের সাবালিকা, ঋতুমতী ও গৃহবাসিনী মহিলাদেরকে বের করি। তবে ঋতুমতী মহিলারা নামায থেকে বিরত থাকবে।

---

৩৭. http://www.binbaz.org.sa/mat/8194 date : 09.06.2014.

৩৮. নারীর পোষাকের ব্যাপারে ইসলামী শরীয়াহর বিধি-বিধান সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখনু : ড. আহমদ আলী, *ইসলামের দৃষ্টিতে পোশাক পর্দা ও সাজসজ্জা*, চট্টগ্রাম : রিলেটিভ পাবলিকেশন্স, ২০১৩; ড. আ.ন.ম. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *ইসলামের দৃষ্টিতে পোশাক, পর্দা ও দেহসজ্জা*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ; ড. জামাল আল-বাদাবী, *মুসলিম নারী-পুরুষের পোষাক*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি); আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *লিবাসুল মারআতিল মুসলিমাহ*.. ইত্যাদি

৩৯. আল-কুরআন, ৩৩ : ৫৯

বাকী পুণ্যের কাজে ও মুসলিমদের দুয়ায় শরীক হবে। আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কারো কারো চাদর নেই। রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, তার অন্য বোন তাকে নিজ চাদর পরিয়ে দিবে।[৪০]

উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণ হয় যে, কোন নারী যদি দীনি এবং পার্থিব কোন প্রয়োজনে ঘর থেকে বাইরে যেতে চায়, তাহলে তাকে অবশ্যই শরীয়াহসম্মত পোষাক পরিধান করে যেতে হবে। এরূপ পোষাক না থাকলে বের হওয়া উচিত নয়।

৫. সুগন্ধি ব্যবহার করে বাহিরে বের না হওয়া

কোন নারী সুগন্ধি (আতর, লোবান, সেন্ট, পারফিউম বা সুগন্ধি ছড়ায় এমন কোন দ্রব্য) মেখে বাইরে বের হবে না। বাইরে বের হওয়ার সময় অবশ্যই তাকে সুগন্ধিহীন অবস্থায় বের হতে হবে।

আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلاَ تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخِرَةَ

যে নারী লোবান লাগায় সে যেন আমাদের সাথে 'ইশার সালাতে উপস্থিত না হয়।[৪১]

আবু হুরায়রা রা. বলেন, আমি আবুল কাসিম রাসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন,

لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ لاِمْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِهَذَا الْمَسْجِدِ حَتَّى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ غُسْلَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ

কোনো নারী এই মসজিদে সুগন্ধি ব্যবহার করে আসলে তার সালাত ততক্ষণ কবুল করা হবে না, যতক্ষণ না সে জানাবাত (শারীরিক অপবিত্রতা) থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য যেভাবে গোসল করা হয় সেভাবে গোসল করে সালাতে দাঁড়ায়।[৪২]

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন,

إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلاَ تَمَسَّ طِيبًا

(হে নারীসমাজ!) তোমাদের কেউ যেন সুগন্ধি লাগিয়ে মসজিদে উপস্থিত না হয়।[৪৩]

---

৪০. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : সলাতুল ঈদায়ন, পরিচ্ছেদ : যিকরু ইবাহাতি খুরূজিন নিসা ফিল ঈদায়ন ইলাল মুসল্লা ও শুহুদিল খুতবাহ, বৈরূত : দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবী, তা.বি., হাদীস নং-৮৯০

৪১. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আস-সলাত, পরিচ্ছেদ : খুরূজুন নিসা ইলাল মাসাজিদ ইযালাম ইয়াতারত্তাব আলাইহি ফিতনাতুন ওয়া আন্নাহা লা তাখরুজু মুতয়্যাবাহ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১০২৬

৪২. ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আত-তারাজ্জুল, পরিচ্ছেদ : মা জাআ ফিল মারআতি তাতাতয়্যাবা লিল-খুরূজ, বৈরূত : দারুল কিতাবিল আরাবী, তা.বি., হাদীস নং-৪১৭৬; হাদীসটি সহীহ (صحيح); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যঈফ সুনানি আবি দাউদ*, হাদীস নং-৪১৭৪

৪৩. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আস-সলাত, পরিচ্ছেদ : খুরূজুন নিসা-ই ইলাল মাসজিদি ..., প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১০২৫

উপর্যুক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সুগন্ধি মেখে কোন নারীর জন্য বাইরে বের হওয়া বৈধ নয়, যদি সে এমন কাজ করে তাহলে সে পাপী হবে; যদিও সে এ অবস্থায় মসজিদে যাক না কেন। যদি সে এ অবস্থায় সালাত আদায় করে তাহলে গোসল করার পূর্ব পর্যন্ত তার সালাতও কবুল করা হবে না। যেখানে সুগন্ধিমেখে মসজিদের মত আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় ও সর্বোত্তম স্থানে সালাত আদায় করতে যেতেই নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, তাহলে কী অন্য কোন স্থানে কোন কাজে যেতে নারীকে সুগন্ধি মেখে বের হওয়ার অনুমতি দেয়া হবে? এ কথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, সুগন্ধি লাগিয়ে ঘরের বাইরে বের হওয়া নারীর জন্য হারাম। সুগন্ধি না লাগিয়ে অন্যান্য শরয়ী বিধি পরিপালন করে নারী তার প্রয়োজনীয় কাজ সম্পাদন করতে বাইরে বের হতে এবং চাকুরি ও ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারবে।

অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ

কোন নারী যদি সুগন্ধি লাগিয়ে লোকদের সামনে থেকে হেটে যায়, এ উদ্দেশ্যে যে তারা তার শরীরের সুগন্ধির ঘ্রাণ উপভোগ করবে, তাহলে ঐ নারী ব্যভিচারীনী হিসেবে গণ্য হবে।[৪৪]

এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, কোন নারী সুগন্ধি মেখে রাস্তায় বের হবে না। রাসূলুল্লাহ সা. এরূপ আচরণ থেকে এমনভাবে সতর্ক করেছেন যে, ঐ নারী ব্যভিচারী আখ্যায়িত পাবে। কারণ, ঐ নারীর নিজেকে এভাবে উপস্থাপন অন্যান্য ব্যক্তিকে তার দিকে ব্যভিচারের দৃষ্টিতে তাকাতে উদ্বুদ্ধ করে। এমনকি কখনও ঐ দৃষ্টি ব্যভিচারের চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যায়।

৬. স্বামী বা অভিভাবকের অনুমতি গ্রহণ করে বাইরে গমন করা

কোন নারী যদি ঘরের বাইরে বের হতে চায়, তাহলে তার স্বামী বা আইনসম্মত অভিভাবক-এর নিকট থেকে অনুমতি গ্রহণ করে বের হতে হবে। কারণ স্বামী বা অভিভাবকগণই ঐ নারীর নিরাপত্তা ও সুরক্ষার ব্যাপারে আল্লাহর নিকট জিজ্ঞাসিত হবে।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. এর স্পষ্ট নির্দেশনা হলো,

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا

তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমরা প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। ইমাম (নেতা) হচ্ছে দায়িত্বশীল; তিনি তার দায়িত্ব সম্পর্কে

---

৪৪. ইমাম আন-নাসায়ী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আয-যীনাহ, পরিচ্ছেদ : মা ইউকরাহু লিন-নিসাই মিনাত-তীব, বৈরূত : দারুল মারিফাহ, ১৪২০ হি., হাদীস নং-৫১৪১; হাদীসটির সনদ হাসান (حسن), মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যঈফ সুনানিন নাসায়ী*, হাদীস নং-৫১২৬

জিজ্ঞাসিত হবেন। ব্যক্তি তার পরিবারের ব্যাপারে দায়িত্বশীল; সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী তার স্বামীর বাড়ির (অভ্যন্তরীণ) ব্যাপারে দায়িত্বশীলা; সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।[৪৫]

এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ হয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই কোন না কোন ব্যাপারে দায়িত্বশীল এবং তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, সে তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছে নাকি দায়িত্বে অবহেলা করেছে। প্রত্যেক দায়িত্বশীলেরই কিছু অধিকার রয়েছে এবং কিছু দায়িত্ব রয়েছে। তার অন্যতম অধিকার হচ্ছে, সে তার অধীনস্তদের আল্লাহ ও তার রাসূলের অবাধ্যতা হয় এরূপ কাজ ব্যতীত কোন কাজের নির্দেশ দিলে সে নির্দেশ প্রতিপালন করা। আর কোন নারী যদি বাইরে কাজ করতে চায় তাহলে তার দায়িত্ব হলো তার স্বামী বা অভিভাবক থেকে অনুমতি নেয়া।

সামর্থ্যবান নারীর হজ্জে গমনের ক্ষেত্রেও অভিভাবকের অনুমতি আবশ্যক। এ ব্যাপারে ইমাম শাফি'য়ী রহ. বলেন,

وإذا بلغت المرأة قادرة بنفسها وما لها على الحج فأراد وليها منعها من الحج أو أراده زوجها، منعها منه ما لم تهل بالحج

কোন নারী যদি শারীরিকভাবে এবং আর্থিক ভাবে হজ্জে যাওয়ার সামর্থ্যবান হয় কিন্তু তার অভিভাবক কিংবা তার স্বামী হজ্জে যেতে বাধা দেয় তাহলে ঐ নারী হজ্জের ইহরাম বাধবে না।[৪৬]

যদি ফরজ ইবাদাত হাজ্জের ক্ষেত্রেই এই অবস্থা হয়, তাহলে সাধারণ বৈধ কাজের ক্ষেত্রে কী অবস্থা হবে? ইসলামী আইনবিদগণ নারীর বাইরে বের হওয়ার ব্যাপারে স্বামী বা অভিভাবক-এর অনুমতি গ্রহণের শর্ত আরোপের দলীল হিসাবে নিম্নোক্ত আয়াতটিও পেশ করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন হতে রক্ষা কর, যার ইন্ধন/জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর ...।[৪৭]

এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের তাদের নিজেদেরকে এবং পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষার চেষ্টা করাকে ওয়াজিব করেছেন। স্বামী বা অভিভাবকই তার অধীন ব্যক্তিবর্গের সার্বিক দায়িত্ব পালন করবেন। অধীনদেরও দায়িত্ব এক্ষেত্রে স্বামী বা অভিভাবকের আনুগত্য করা।

---

৪৫. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-জুমুআহ, পরিচ্ছেদ : আল-জুমআহ ফিল কুরা ওয়াল মুদুন, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৮৫৩

৪৬. ইমাম শাফিয়ী, *আল-উম্ম*, বৈরূত : দারুল ফিকর ১৪০০ হি., খ. ২, পৃ. ১২৮

৪৭. আল-কুরআন, ৬৬ : ০৬

এই আয়াতের তাফসীরে বিখ্যাত মুফাসসির কাতাদাহ রহ. বলেন,

> يأمرهم بطاعة الله، وينهاهم عن معصية الله، وأن يقومَ عليهم بأمر الله، ويأمرهم به ويساعدهم عليه، فإذا رأيت لله معصية، قَدعتهم عنها وزجرتهم عنها
>
> দায়িত্বশীল ব্যক্তি তার পরিবার-পরিজনকে আল্লাহর আনুগত্যের আদেশ দিবে; আল্লাহর অবাধ্যতামূলক কর্ম থেকে নিষেধ করবে; তাদের ওপর আল্লাহর বিধান প্রয়োগ করবে, তাদেরকে তা পালনের আদেশ দিবে এবং তা পালনে তাদেরকে সহযোগিতা করবে। যখন তাদের দ্বারা কোন গুনাহর কাজ কিংবা আল্লাহর অবাধ্যতামূলক কাজ হতে দেখবে তখন তাদেরকে তা থেকে নিবৃত্ত করবে এবং নিষেধ করবে।[৪৮]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন বিবাহিত নারী যদি প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যেতে চায়, তাহলে তার স্বামীর নিকট থেকে অবশ্যই অনুমতি নিতে হবে। এবং অবিবাহিতা বা বিধবা কিংবা অন্য যে কোন নারী তার আইনগত অভিভাবকের নিকট থেকে অনুমতি না নিয়ে বের হবে না। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণসহ অন্যান্য শর্ত প্রতিপালন করে যে কোন নারী তার প্রয়োজনে ঘরের বাইরে বের হতে এবং কাজ করতে পারবে।

৭. নারীসুলভ কর্মে নিয়োজিত হতে হবে

কোন নারী প্রয়োজনে যদি ঘরের বাইরে কোন কাজ করতে চায়, তা হলে তাকে অবশ্যই তার দৈহিক ও মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের অনুকূল কর্মে নিয়োজিত হতে হবে। যদিও মানুষ হিসাবে নারী ও পুরুষ অভিন্ন সত্তা। সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্রমবিকাশে তাদের অবদানও অভিন্ন। তারা একে অপরের পরিপূরক, কেউ কারো প্রতিদ্বন্দ্বী কিংবা বিকল্প নয়। তবে দৈহিক গঠন, মনস্তত্ত্ব, আবেগ-অনুভূতি, দৈহিক কাঠামো, শক্তি-সামর্থ্য, মেধা ও যোগ্যতা, অভিরুচি, ঝোঁক প্রবণতা, কর্মস্পৃহা, কর্মদক্ষতা প্রভৃতি দিক দিয়ে তাদের ব্যবধান দুস্তর। নারীর হৃৎপিণ্ড ও মগজ উভয়টিই পুরুষের তুলনায় ৩০ গ্রাম ছোট ও হালকা। পুরুষ ঘন্টায় ১১ গ্রাম কার্বন নির্গমন করে। একই সময়ে নারী নির্গমন করে ৬ গ্রাম। নারীর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও কোষের মধ্যে নারীত্বের চিহ্ন সুস্পষ্ট। তারা সাধারণত শ্রমবিমুখ। সাজ-সজ্জার প্রতি এদের আকর্ষণ বেশি। তারা অধিক পরিমাণে আবেগপ্রবণ। আর এই আবেগ তার চিত্তকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে, যার সাথে যুক্তি কিংবা বুদ্ধির কোন সংশ্রব নেই। আনন্দ-বেদনা, দুঃখ-অনুশোচনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাদের আচরণ অপরিপক্ক। তাই কঠিন ও বিপদসংকুল মুহূর্তগুলোর চাপ বহন করতে তারা অক্ষম। তাদের দৈহিক শক্তি-সামর্থ্য, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন, ও কর্মক্ষমতা পুরুষদের চাইতে কম।[৪৯]

---

৪৮. ইমাম ইবনু কাছীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১৬৭

৪৯. ড. আ.ক.ম. আবদুল কাদের, নারীর কর্মসংস্থান : ইসলামী দৃষ্টিকোণ, *Peaceland Journal*, Peaceland Trust, v. 1, Number : 1, 2013, পৃ. ৫৯

নারীর কর্মক্ষমতা ও দৈহিক শক্তি-সামর্থ্যের বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে বলা যায় যে, নারীকে অবশ্যই নারীসুলভ কোন কর্মে নিয়োজিত হতে হবে, একান্তই যদি তা প্রয়োজন হয়। নারীসুলভ কর্মের মধ্যে উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, ব্যবসা-বাণিজ্য, সেলাই, শিক্ষকতা, নার্সিং, চিকিৎসা, আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয়া ইত্যাদি। অপরদিকে নারীসুলভ নয় এমন কর্মের মধ্যে রয়েছে সাধারণ জনগণ চলাচল করে এমন রাস্তাঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ, ইমারত নির্মাণ, রাস্তা তৈরি, কয়লা খনিতে কাজ করা ইত্যাদি। এ ছাড়া যে সকল কাজ কষ্টসাধ্য ও কঠিন এরূপ কর্মে নিয়োগ হওয়া নারীর জন্য বাঞ্ছনীয় নয়। ইসলাম নারীকে তার দৈহিক ও মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের অনুকূলে ও শরীয়াহর অন্যান্য মূলনীতি মেনে যে কোন কর্মে নিয়োজিত হওয়ার অনুমতি প্রদান করেছে।

৮. পথে কিংবা কর্মস্থলে ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকা

বৈধ কর্মে নারীর ঘরের বাইরে যাওয়ার ক্ষেত্রে অন্যতম শর্ত হলো, পথে-ঘাটে বা কর্মস্থলে নারী নিজে কোন বিপদে পতিত হওয়ার কিংবা তার দ্বারা কেউ বিপদে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। এরূপ অবস্থায় সে ঘরের বাইরে চাকুরি বা অন্য কোন বৈধ কর্মে বের হতে পারবে। যদি নারী নিজে তার কর্মস্থলে বা পথে বিপদাপন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকে অথবা তার দ্বারা কোন অপরিচিত পুরুষ বিপদাপন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে এমতাবস্থায় বৈধ কর্মের জন্যও নারীর ঘরের বাইরে যাওয়া উচিত নয়। এ শর্তের দলীল হিসাবে ফকীহগণ নিম্নোক্ত হাদীসটি পেশ করেন। উসামা ইবনু যায়দ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন,

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ

> আমি আমার পরের মানুষদের মধ্যে পুরুষদের জন্য নারীদের থেকে অধিক ক্ষতিকারক কোন ফিতনার উপাদান রেখে যাইনি।[৫০]

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী রহ. বলেন,

وفي الحديث أن الفتنة بالنساء أشد من الفتنة بغيرهن ويشهد له قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء فجعلهن من حب الشهوات وبدأ بهن قبل بقية الأنواع إشارة إلى أنهن الأصل في ذلك

> এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নারীদের মাধ্যমে যে ফিতনা সৃষ্টি হয় তা অন্য কারো দ্বারা সৃষ্ট ফিতনা থেকে বেশি ক্ষতিকারক। এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করে আল্লাহ তাআলার এ বাণী,
>
> ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ﴾
>
> নারী, সন্তান, রাশিকৃত সোনা-রূপা আর চিহ্নিত ঘোড়াসমূহ... এর প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট সুশোভিত করা হয়েছে"।[৫১]

---

৫০. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আন-নিকাহ, পরিচ্ছেদ : মা ইউত্তাকা মিন শুমিল মারআহ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪৮০৮

৫১. আল-কুরআন, ৩ : ১৪

আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে বর্ণিত বিষয় ও বস্তুগুলোকে চিত্তাকর্ষণের বস্তু হিসাবে উল্লেখ করেছেন। আর নারীদের কথা এ সকল বস্তুর মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করেছেন, যা থেকে এ কথার ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, নারীই হচ্ছে এসব কিছুর প্রতি আকর্ষণের মূল।[৫২]

শাইখ আব্দুল আযীয বিন বায রহ. বলেন,

فعمل المرأة بين الرجال من غير المحارم فتنة تضعها على الطريق الموصل إلى ما لا تحمد عقباه مما حرّم الله، وما يؤدّي إلى الحرام حرام

পুরুষদের মাঝে মাহরাম ছাড়া নারীর কাজ করা ফিতনার উপলক্ষ, যা এমন এক মন্দ পরিণতির দিকে পৌছে দেয়, যা আল্লাহ্ তা'আলা হারাম করেছেন। বলাই বাহুল্য, হারামের উপলক্ষও হারাম।[৫৩]

ইসলাম সকল নারীকে ফিতনার উপকরণ বলেনি। ফিতনার উপকরণ হলো এমন কিছু নারী যাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেন,

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

দুই শ্রেণীর জাহান্নামী রয়েছে যাদের আমি দেখিনি। এক শ্রেণী হল, যাদের কাছে গরুর লেজের মত চাবুক রয়েছে যা দিয়ে তারা মানুষ মারে। আর দ্বিতীয় শ্রেণী হল, যে নারীরা কাপড় পরেও উলঙ্গ।[৫৪] আর তারা নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্যকে অন্য লোকদের জানান দেয় এবং বুক টান করে পথে-ঘাটে হেলে-দুলে চলে।[৫৫] তাদের মাথা বুখত উটের কুঁজের মত সুউচ্চ। তারা না জান্নাতে যেতে পারবে আর না জান্নাতের সুঘ্রাণ পাবে। যদিও এর সুঘ্রাণ বহুদূর থেকে পাওয়া যায়।[৫৬]

---

৫২. ইমাম ইবনু হাজার আল-আসকালানী, *ফাতহুল বারী শারহি সহীহিল বুখারী*, খ. ৯, পৃ. ১৩৮

৫৩. http://www.islaamlight.com/files/wqrn/thwab6.htmdate : 09.06.2014

৫৪. এর অর্থ হলো এমন সব নারী যারা পাতলা কাপড় পরে যা দিয়ে সর্বশরীর দেখা যায়। অথবা এর অর্থ এও হতে পারে যে, নারী তার দৈহিক সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে শরীরের কিছু অংশ ঢেকে রেখে বাকী অংশ উন্মুক্ত রাখে। অথবা বাহ্যিক সৌন্দর্য এবং ফ্যাশনে লিপ্ত হবে আর তাকওয়ার পোশাক পরিত্যাগ করবে। অথচ তাকওয়ার পোষাককেই আল্লাহ্ তাআলা উত্তম বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল-কুরআন, ৭ : ২৬

৫৫. এর অর্থ হলো ঐ সব নারী যারা রাস্তায় এমনভাবে হেলে-দুলে চলবে যেন তারা বেশ্যা/পতিতা। এতে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরও নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করে পথভ্রষ্ট করবে।

৫৬. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-লিবাস ওয়ায-যীনাহ, পরিচ্ছেদ : আন-নিসা আল-কাসিয়াত আল-আরিয়াত আল-মাইলাত আল মুমীলাত, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৭৩৭৩

৯. পারিবারিক দায়িত্ব পালনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এমন কর্ম না হওয়া

নারীর প্রধান দায়িত্ব হলো তার স্বামী ও সন্তানের দেখাশুনা করা। রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন,

> أَلا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ... وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ...
>
> জেনে রাখ! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল আর তোমরা প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে (আল্লাহর নিকট) জিজ্ঞাসিত হবে।... স্ত্রী হচ্ছে তার স্বামীর পরিবার ও সন্তান-সন্ততির দায়িত্বশীল, তাকে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে....।[৫৭]

তাই স্ত্রী তার প্রধান দায়িত্বক্ষেত্র পরিবারের ব্যাপারে অবহেলা করার অধিকার রাখে না। যদি কোন স্ত্রী তার পরিবারের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন না করে বাইরে কাজে বের হয় এবং স্বামী-সন্তানের অধিকার বিনষ্ট করে তাহলে তা কখনই তার জন্য কল্যাণকর ও বৈধ হবে না।

আল্লামা শাইখ আব্দুল আযীয বিন বায রহ. বলেছেন,

> إنّ عملَ المرأة بعيدًا عن الرّجال إن كان فيه مضيَعة للأولاد وتقصيرٌ بحقّ الزوج من غير اضطرار شرعيّ لذلك يكون محرّمًا؛ لأنّ ذلك خروج على الوظيفة الطبيعية وتعطيل للمهمة الخطَيرة التي عليها القيام بها، مما ينتج عنه سوء بناء الأجيال، وتفكّك عُرى الأسرة التي تقوم على التعاون والتكافل
>
> যদি মহিলা পুরুষদের সংশ্রব থেকে দূরে কোথাও কোনো কর্মে কোনরূপ শারয়ী অতীব প্রয়োজন ব্যতীত নিয়োজিত হয় এবং এ কর্ম যদি তার সন্তান-সন্ততিদের ক্ষতির কারণ হয় ও এতে তার স্বামীর অধিকার আদায় করার ক্ষেত্রে কোন ত্রুটি দেখা দেয়, তাহলে তার এ কর্ম হারাম হবে। কেননা এ কর্ম নারীর স্বভাবগত দায়িত্বের বহির্ভূত এবং তার একান্ত প্রয়োজনীয় কর্তব্য পরিহারের নামান্তর। এতে পরবর্তী প্রজন্ম খারাপভাবে বেড়ে ওঠবে এবং পারিবারিক বন্ধনসমূহ- যা পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা ও দায়িত্ব গ্রহণের ওপর নির্ভরশীল- ছিন্ন হয়ে যাবে।[৫৮]

উপরোল্লিখিত আলোচনা দ্বারা বুঝা গেলো যে, পারিবারিক দায়িত্ব পালনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এ জাতীয় কোন কাজ করা নারীর জন্য বৈধ নয়। তবে এরূপ কোন সমস্যা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে অন্যান্য নীতিমালা মেনে নারী তার প্রয়োজনে ঘরের বাইরে চাকুরি বা অন্য কোন কাজে যেতে পারবে।

অতীতের চেয়ে বর্তমানকালে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মায়েরাই কর্মজীবী। কিন্তু মায়েদের বাইরে কাজ করা পারিবারিক জীবনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সন্তানের জন্য হুমকিস্বরূপ।

---

৫৭. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : আল-আহকাম, পরিচ্ছেদ : কওলুল্লাহি তাআলা 'আতীউল্লাহা ওয়া আতীউর রসূলা ওয়া উলিল আমরি মিনকুম', প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৬৭১৯

৫৮. http://www.alminbar.net/malafilmy/3amal/3.htm date : 09.06.2014

মা বাড়িতে থাকলে বাড়ির পরিবেশ যেমন থাকে, মায়ের অনুপস্থিতিতে তা অনেকটা বদলে যায়। তখন সন্তানদের দেখা-শোনার দায়িত্ব কাজের লোক, প্রতিবেশী বা আত্মীয়ের উপর বর্তায়। কিন্তু মায়ের কাজ মাকেই মানায়; অন্যকে নয়।

মায়ের সাহচর্য না পেলে সন্তান নিরাপত্তার অভাব অনুভব করে। মায়ের অভাব সন্তানের আবেগের জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এ প্রসঙ্গে বেনজামিন স্পোক লিখেছেন যে, "একটি বাইশ মাসের বাচ্চাকে একজন অপরিচিত মহিলার কাছে রেখে মা কাজে গেলেন। কিন্তু দেখা গেল, মা কাজ থেকে বাড়ি আসার পর সন্তান কিছুতেই মাকে ছাড়ছে না এবং অপরিচিত মহিলাকেও কাছে আসতে দিচ্ছে না।" অন্য একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, কর্মজীবী মায়েদের সন্তানদের আচরণজনিত সমস্যা বেশি হয়ে থাকে তুলনামূলকভাবে যাদের মায়েরা বাইরে কাজ করে না তাদের সন্তানদের চেয়ে।

শৈশবে শিশুদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ নির্ভর করে মায়ের সাথে গভীর সম্পর্কের উপর। কাজেই এ সময়ে মায়ের অনুপস্থিতি সন্তানের জীবনে নানারকম অমঙ্গল ডেকে আনতে পারে। এসব সন্তান নিজেদেরকে অবহেলিত এবং অসহায় মনে করে। একজন মনোচিকিৎসক বলেছেন,

> This distortion or maldevelopment of the child's character is usually in proportion to the sum totel of physical and emotional absence on the part of the parents.[৫৯]

সারাদিনের কর্মব্যস্ততার পর ঘরে এসে নানা কাজ এবং সন্তানের বিভিন্ন দাবি মেটাতে মায়েরাও অধৈর্য হয়ে পড়েন। ফলে মাও কখনও কখনও সন্তানকে সমালোচনা করেন আবার গালমন্দও করে থাকেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন,

> The combined strain of seing wife, mother and outside employee tends to make mothera unduly tired, with consequent feelings ofirritability.[৬০]

অনেক সময় মায়েরা সন্তানের প্রতি নিজেদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারেন না বলে বিভিন্ন জিনিস এনে তাদের খুশি করার চেষ্টা করেন। কিন্তু এর ফলে সন্তানগণ লোভী হয়ে যেতে পারে। কাজেই পারিবারিক শান্তি এবং সন্তানের সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক বিকাশের কথা মাকে অবশ্যই ভাবতে হবে। মায়েরা প্রয়োজনে চাকুরি করতে পারেন, তবে সন্তানের মঙ্গল এবং পারিবারিক জীবনের শান্তি যদি তাতে ব্যাহত হয়, তাহলে মাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে সন্তান এবং চাকুরি দুটোর মধ্যে কোনটা বেশি জরুরি।

---

৫৯. কামরুন্নেছা বেগম, শিশু-বিকাশে মনোবিজ্ঞান ও পরিবারের ভূমিকা, *বাংলা একাডেমী বিজ্ঞান পত্রিকা*, ৩০ বর্ষ ২য় সংখ্যা ৩২ বর্ষ ১ম সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৩-জুন ২০০৫, পৃ. ১২০

৬০. প্রাগুক্ত

উপসংহার

ইসলাম নারীকে শুধু মর্যাদাই দেয়নি বরং তার যথাযথ অধিকারও প্রদান করেছে। তার দায়িত্বও ইসলাম নির্ধারণ করে দিয়েছে। ইসলামের প্রতি একটি অতি সাধারণ অভিযোগ সর্বদা আরোপ করা হয় যে, ইসলাম নারীর স্বাধীনতাকে হরণ করেছে এবং নারীকে চার দেয়ালের মধ্যে বন্দি করেছে। অথচ কুরআন, সুন্নাহ ও বিভিন্ন মনীষীর উক্তি দ্বারা উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলাম নারীকে চার দেয়ালের মধ্যে বন্দিও করেনি এবং তার স্বাধীনতাকে হরণও করেনি। বরং প্রমাণিত হলো যে, নারীর স্বভাব-প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রেখে ইসলাম তার কর্মের ক্ষেত্রকে পৃথক করেছে এবং কিছু নীতিমালা নির্ধারণ করেছে। যে কোন আধুনিক সভ্য রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করে জনগণের ইচ্ছার স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। ইসলামও তাই করেছে। তা ছাড়া কুরআন-সুন্নাহর কোথাও এ কথা বলা নেই যে, নারীরা ঘরের বাইরে কাজ করতে পারবে না।

রাসূলুল্লাহ সা. এবং সাহাবীগণের যুগে আমরা বরং এর উল্টো চিত্র দেখতে পাই। আমরা দেখতে পাই, প্রয়োজনে মহিলা সাহাবীগণ ক্ষেতে-খামারে কাজ করতেন, ব্যবসায়-বাণিজ্য করতেন। তাই নারীদের কর্মের অধিকারকে ইসলাম হরণ করেইনি; বরং তার সে অধিকারকে সুরক্ষিত ও নিরাপদ করেছে। প্রবন্ধে উল্লিখিত নীতিমালা মেনে যে কোন মুসলিম নারী ঘরের বাইরে কাজ করতে পারবে।

তবে নারী-পুরুষ পাশাপাশি থেকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করা ইসলামে বৈধ নয়। এরূপ অবস্থায় চরিত্রের পবিত্রতা অক্ষুণ্ন রেখে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের স্থিতি রক্ষা করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। যে সমাজে এ ধরনের নারী-পুরুষের অবাধ মিশ্রণ প্রচলিত রয়েছে (যেমন, পাশ্চাত্যের সমাজ), সেখানে শুধু নৈতিকতা ও মূল্যবোধই ধ্বংস হয়নি; নির্দিষ্ট নিয়মে গঠিত এবং প্রেম, ভালোবাসা, সম্প্রীতি, স্নেহ, শ্রদ্ধার বন্ধনে আবদ্ধ পারিবারিক জীবনও ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। তাই সমাজ ও পরিবারের স্থিতি ও কল্যাণের কথা ভেবে এবং নারীর দৈহিক ও মানসিক যোগ্যতার কথা সামনে রেখেই তার জন্যে পৃথক কর্মক্ষেত্র গড়ে তোলা সময়ের দাবি। নারীদের জন্যে পৃথক কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান গড়ে না ওঠা পর্যন্ত তাদের উপযোগী কাজ সৃষ্টি করে একই কারখানায় ও প্রতিষ্ঠানে পৃথক সেকশন ও শিফট করা যেতে পারে। সমাজ ও অর্থনীতির উন্নয়নের স্বার্থেই জনশক্তির এই বিশাল অংশকে অকর্মণ্য না রেখে ইসলামী নীতিমালা মেনে কীভাবে নারীকে তার কর্মের অধিকার প্রয়োগ করার সুযোগ করে দেয়া যায় তা নিয়ে বাস্তবভিত্তিক কার্যকর উদ্যোগ ও গবেষণা হওয়া প্রয়োজন।

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১০ সংখ্যা : ৩৮
এপ্রিল - জুন : ২০১৪

ইসলামী আইন ও ফিক্‌হশাস্ত্রে প্রাচ্যবিদদের রচনা ও গবেষণা : একটি পর্যালোচনা

মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন*

[সারসংক্ষেপ : *ইসলামী আইন তথা শরীয়া ও ফিক্‌হশাস্ত্র গোটা মুসলিম জীবনকে পরিচালিত করে। এ বিষয়ে পশ্চিমা গবেষক প্রাচ্যবিদদের কৌতূহলের অন্ত নেই। ফলে একদল প্রাচ্যবিদ ইসলামী আইন ও ফিক্‌হশাস্ত্রকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেন তাদের রচনা ও গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, আক্বীদা ও বিশ্বাসে অমুসলিম হয়েও পাশ্চাত্যের এসব লেখক ও গবেষক ইসলামী শরীয়ত ও ফিক্‌হশাস্ত্রকে যে মনযোগ, যে অধ্যবসায় ও গুরুত্বের সাথে অধ্যয়ন করেছেন, অনেক মুসলিমও হয়ত করেননি। কিন্তু দুয়েকজন ব্যতিক্রম ছাড়া সাধারণ প্রাচ্যবিদদের রচনা ও গবেষণায় ইসলামী শরীয়ত ও ফিক্‌হশাস্ত্র নিয়ে বিভিন্ন উক্তি ও মন্তব্য অত্যন্ত মারাত্মক। এক্ষেত্রে অনেক প্রাচ্যবিদ লেখক চরম পর্যায়ের বিদ্বিষ্ট ও হিংসুটে রূপে প্রমাণিত হয়েছেন। অথচ ইসলামের প্রতি বিদ্বিষ্ট এসব প্রাচ্যবিদের লেখা বই-পুস্তকের অধিকাংশই আধুনিক কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে রেফারেন্স বুক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ফলশ্রুতিতে ঐসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা অর্জনকারী ছাত্র, শিক্ষক, আইনজীবী, বিচারক ও প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে প্রাচ্যবিদদের লেখার প্রভাবে ইসলামী আইনের প্রতি এক ধরনের বীতশ্রদ্ধা সৃষ্টি হয়। মুসলমানের সন্তান হয়েও অনেক সময় ইসলামী শরীয়া, ইসলামী আইন ও বিচার এবং মুসলিম জীবনপদ্ধতি নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করতে দেখা যায় অনেককে। তাই এক্ষেত্রে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যেই ইসলামী আইন ও ফিক্‌হশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ কয়েকজন প্রাচ্যবিদদের রচনা ও গবেষণা বিষয়ে এই প্রবন্ধ লেখার প্রয়াস পেয়েছি। প্রবন্ধের শুরুতে প্রাচ্যবাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের উপর সামান্য ধারণা দেয়া হয়েছে আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্ব অনুধাবনের সুবিধার্থে। অতঃপর ইসলামী আইন ও ফিক্‌হশাস্ত্রে প্রাচ্যবিদদের উল্লেখযোগ্য রচনা ও গবেষণাকর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং ফিক্‌হশাস্ত্রের ভিত্তি নিয়ে তাদের আপত্তিকর মন্তব্যের পর্যালোচনা করা হয়েছে। ইসলামী শরীয়া ও ফিক্‌হ বিষয়ে প্রাচ্যবিদদের আরোপিত কয়েকটি অপবাদের জবাব এবং সেক্ষেত্রে মুসলিম গবেষকদের মূল্যায়ন দেয়া হয়েছে। সবশেষে বর্তমান প্রেক্ষিতে আমাদের করণীয় বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।*]

* পিএইচ.ডি গবেষক, আরবী বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

ভূমিকা

ইসলাম ও মুসলিম বিষয়ে প্রাচ্যবিদদের রচনা ও গবেষণা বহুমাত্রিক। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় রয়েছে তাদের অবাধ বিচরণ। বিশেষ করে ইসলামের আইন ও বিচার, ইসলামী শরীয়ত ও ফিক্‌হশাস্ত্রে প্রাচ্যবিদদের রচনা, লেখালেখি ও গবেষণা আধুনিক বিশ্বের শিক্ষিত মহলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত। কারণ মুসলমানদের জীবন সম্পর্কে গভীরভাবে জানতে হলে ইসলামী ফিক্‌হশাস্ত্রের বিকল্প নেই। ফিক্‌হ গোটা মুসলিম জীবনকে পরিচালিত করে। ইবাদাত ছাড়াও ব্যবসা-বাণিজ্য, মামলা-মোকাদ্দমা, লেন-দেন, আচার-আচরণ, ন্যায়-নীতি, সামাজিক আদান-প্রদান, বিয়ে-শাদি, মানবাধিকার, শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্প-সংস্কৃতি ইত্যাদি সবক্ষেত্রে ইসলামী আইন বা শরীয়া কি বলে তার পূর্ণাঙ্গ ও স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে এই শাস্ত্রে। এককথায় ইসলামী জীবনপদ্ধতির সবিস্তারে নির্দেশনা পাওয়া যায় এই ফিক্‌হশাস্ত্রেই। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত, জন্ম থেকে; বরং জন্মের পূর্ব থেকেই মৃত্যু অবধি এবং মৃত্যুর পরেও ফিক্‌হশাস্ত্রের ব্যবহার রয়েছে। ফলে একদল প্রাচ্যবিদ ইসলামী শরীয়ত, আইন ও ফিক্‌হশাস্ত্রকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেন তাদের রচনা ও গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে।

প্রাচ্যবিদের সংজ্ঞা

প্রাচ্য বিষয়ে যিনি জ্ঞানচর্চা ও গবেষণা করেন সাধারণ অর্থে তিনি প্রাচ্যবিদ (Orientalist)। তবে আধুনিক পরিভাষায় প্রাচ্যবাদ (Orientalism) বলতে মুসলিম প্রাচ্যের ভাষা, ধর্ম, সমাজ, শিল্প-সংস্কৃতি, সভ্যতা, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে পশ্চিমাদের জ্ঞানচর্চা ও গবেষণা কেন্দ্রিক চিন্তাধারাকে বোঝানো হয়।[১] এই চিন্তাধারাকে লালন করে যারা জ্ঞানচর্চা ও গবেষণাকর্ম করেন তারাই প্রাচ্যবিদ হিসেবে পরিচিত। এ ক্ষেত্রে ইসলামী বিষয়াদি নিয়ে জ্ঞানচর্চা ও গবেষণাকারী প্রাচ্যবিদদের মধ্যে ধর্মের কোনো শর্ত না থাকলেও সাধারণত ইহুদি, খ্রিস্টান ও নাস্তিকদের সংখ্যাই বেশি। মোদ্দাকথা, প্রাচ্য বিশেষত আরব ও মুসলিম প্রাচ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় নিয়োজিত পশ্চিমা পণ্ডিতকেই প্রাচ্যবিদ বলা হয়।[২]

প্রাচ্যবিদদের গবেষণা : প্রকৃতি ও পরিধি

ইতিহাসে দেখা যায়, আরব উপদ্বীপ থেকে বের হয়ে মুসলমানরা যখন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে এবং জ্ঞান, বিজ্ঞান, রচনা ও গবেষণায় গোটা পৃথিবীকে হাতের মুঠোয়

---

১. Edward Said, *Orientalism*, New york, 1979 এর ভূমিকা দ্রষ্টব্য। *মাওসূআতুল মুয়াস্‌সারাহ ফিল আদয়ান ওয়াল মাযাহিবিল মুআসিরাহ*, রিয়াদ : ওয়ামি (WAMY), ১৯৮৯ইং, পৃ. ৩৩

২. ড. ইসমাঈল আলী মুহাম্মদ, *আল ইস্তিশরাক বাইনাল হাকীকাতি ওয়াত তাদলীল*, মিসর-আল মানসূরা : আল কালিমা লিন নাশর ওয়াত তাঊযী, ২০০০ইং, পৃ. ১৩

নিয়ে আসতে থাকে, বিশেষ করে স্পেনে মুসলমানদের উন্নতি ও অগ্রযাত্রায় তৎকালীন বিশ্বসমাজ চমকে যায়, তখন ইসলাম ও মুসলমানদের বিপক্ষ শক্তি নড়ে চড়ে বসে।[৩] সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তারা কৌশল পরিবর্তন করে। বিশেষ করে বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধে মনযোগ দেয়। তারা বুঝতে পারে, প্রাত্যহিক জীবনে মূলত ইসলামী শরীয়াকে আঁকড়ে ধরার কারণেই মুসলমানদের এই উন্নতি ও অগ্রযাত্রা। তাই ইউরোপ ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশের একদল ইসলামবিদ্বিষ্ট পণ্ডিত মুসলমানদের এই বিষয়টাকে বেছে নেয় তাদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার মানসে। তারা ইউরোপিয়ান হয়েও প্রাচ্যের ভাষা, ধর্ম, সমাজ, শিল্প-সংস্কৃতি, সভ্যতা, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে সবিশেষ দক্ষতা হাসিল করে। তারা মুসলমানদের ভাষায় বই-পুস্তক লিখে, গবেষণা চালায় মুসলিম উম্মাহর ভবিষ্যত প্রজন্মকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে রাখার মানসে। কারণ, প্রথম থেকেই ইসলামকে ইউরোপের পথে প্রধান বাধা ও সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অক্সফোর্ডের অধ্যাপক অলবার্ড হোরানি তার "Islam in European Thought" শীর্ষক গবেষণায় লিখেন:

> From the first time it appeared the religion of Islam a problem for Christian Europe.
> প্রথম থেকেই খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী ইউরোপের জন্য ইসলাম ধর্ম একটি সমস্যা রূপে দেখা দেয়।[৪]

আন্তর্জাতিক বিশ্লেষক ও গবেষকদের দৃষ্টিতে প্রাচ্যবাদের প্রতি অতিমাত্রায় গুরুত্বারোপের পিছনে পশ্চিমাদের দুইটি মৌলিক লক্ষ্য রয়েছে। এক. পাশ্চাত্যে ইসলামের প্রচার-প্রসার রোধ এবং পশ্চিমাদেরকে ইসলাম থেকে দূরে রাখা। দুই. মুসলমানদের দেশ ও রাষ্ট্র, তাদের সংস্কৃতি, আক্বীদা-বিশ্বাস, তাদের সাহিত্য, গল্প-কাহিনী ইত্যাদি বিষয়ে পরিচয় লাভ করা। যাতে সেসব দেশ এবং সেখানকার অধিবাসীদের উপর প্রভাব বিস্তার করা যায়।[৫]

---

৩. লেখক ও ইতিহাসবিদ সার্টন (Sarton) এই ঐতিহাসিক সত্যকে স্বীকার করেছেন তার 'Introduction to the History of Science' শীর্ষক গ্রন্থে। এক জায়গায় তিনি লিখেন, নবম ও দশম শতাব্দীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলিম আরবদের জয়জয়কার ছিল। নতুন নতুন সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং আধুনিক চিন্তাধারা আরবী ভাষাতেই প্রচারিত ও প্রকাশিত হত। তখন আরবীই ছিল বৈজ্ঞানিক উন্নতির আন্তর্জাতিক মাধ্যম। দ্রষ্টব্য: '*Introduction to the History of Science*', p. 543

৪. Dr. Albert Hourani, *Islam in European Thought*, Cambridge University Press, 1991, p. 3

৫. আলী ইবন ইবরাহীম আন-নামলা, *মাসা'দিরুল মা'লুমাত আনিল ইস্তিশরাক ওয়াল মুস্তাশরিকীন*, রিয়াদ : মাকতাবাতুল মালিক ফাহাদ আল -ওয়াতানিয়্যাহ, ১৯৯৩ইং, পৃ. ৭

স্মর্তব্য, ইসলাম যে পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান এবং ইসলামী শরীয়া ও আইন যে তাবৎ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আইন ও বিধান তা তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের ইতিহাসে এক অমোঘ ও অকাট্য সত্য। এ সত্যটা বিলক্ষণ জানেন ও বোঝেন প্রাচ্যবিদ নামে খ্যাত ওসব ইউরোপিয়ান পণ্ডিতপ্রবর। ফলে নিঃস্বার্থ গবেষণা করতে গিয়ে প্রাচ্যবিদদের অনেকেই সত্যের অনুসারী হয়েছেন এবং পূর্বের ভ্রান্ত বিশ্বাস ত্যাগ করে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু যাদের ভাগ্যে হিদায়াত নেই তারা তো আর বসে নেই। তারা অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে তাদের বাছাই করা একদল লোককে বুদ্ধিবৃত্তিক মাঠে নিয়োজিত করে। সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে তাদেরকে প্রস্তুত করা হয়। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে গোপনীয়তার সাথে মুসলমানদের পদ্ধতিতে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে ঐসব নির্বাচিত লোককে আরবী ভাষা ও সাহিত্যে পারদর্শী করে তোলা হয়। ইসলাম ও মুসলমানদের বিভিন্ন বিষয় যথা পবিত্র কুরআন, হাদীস, ফিক্‌হ, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে একেকজনকে দক্ষ পণ্ডিত হিসেবে গড়ে তোলা হয়। তারাই পরবর্তীতে ইউরোপ-আমেরিকায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ, আরবী ভাষা ও সাহিত্য, অরিয়েন্টাল স্টাডিজসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক বা বিভাগীয় চেয়ারম্যানের পদে অধিষ্ঠিত হন।

ইসলামী শিক্ষার বিভিন্ন মৌলিক গ্রন্থ আরবী থেকে ইংরেজিসহ ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় তাদের ইচ্ছামত অনুবাদ করে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেন। এছাড়া ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে প্রচুর মৌলিক গ্রন্থ রচনা করে তাতে তারা তাদের বিভিন্ন ভুল ও বিভ্রান্তিকর তথ্য ঢুকিয়ে দেন। প্রাচ্যবিদদের লেখা ঐসব গ্রন্থই পরবর্তীতে অনেক আরব ও মুসলিম দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যভুক্ত সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় অথবা শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে রেফারেন্স বুক হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। আবার মুসলিম বিশ্বের কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ দেশে নিজেরাই বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে সেখানে মুসলিম সন্তানদের কাগজে-কলমে শিক্ষা দিয়ে তাদের মত করে গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা হয়। এসব কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম হচ্ছে কায়রোর আমেরিকান ইউনিভার্সিটি, বৈরূতের আমেরিকান ইউনিভার্সিটি, যা পরবর্তীতে সিরিয়ান ইংলিশ কলেজ নামে পরিচিতি লাভ করে, ইস্তাম্বুলস্থ আমেরিকান ইউনিভার্সিটি, পাকিস্তানের লাহোরস্থ ফ্রান্স কলেজ, সুদানের খার্তুমস্থ গরডন কলেজ ইত্যাদি।[৬] ফলশ্রুতিতে ইউরোপ ও আমেরিকাসহ এসব আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া মুসলিম ছাত্রদের মাঝে ইসলামী আইন ও শরীয়া সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের ধ্যান-ধারণার স্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

---

৬. ড. আবদুল মুনইম ফুয়াদ, *মিন ইফতিরা'তিল মুস্তাশরিক্বীন আলাল উসূলিল আক্বদিয়্যাহ ফিল ইসলাম*, রিয়াদ : মাকতাবাতুল আবীকান, পৃ. ৩২-৩৬

উল্লেখযোগ্য প্রাচ্যবিদ-এর কর্ম ও পরিচয়

ইসলামের আইন ও বিচার, ইসলামী ফিক্‌হশাস্ত্র সর্বোপরি শরীয়ত বিষয়ে প্রাচ্যবিদদের রচনা ও গবেষণাকর্ম এবং এ বিষয়ে যেসব প্রাচ্যবিদ জ্ঞানচর্চা, লেখালেখি ও গবেষণাকর্ম চালিয়েছেন তাদের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য কয়েকজন সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেয়া হল :

ইসলামী আইন ও ফিক্‌হশাস্ত্র বিষয়ে প্রাচ্যবিদদের রচনা ও গবেষণাকর্মের এক বিশাল ভাণ্ডার রয়েছে তাদের লেখা 'ইসলামী বিশ্বকোষ' (Encyclopaedia of Islam) এর বিভিন্ন প্রবন্ধ-নিবন্ধে। এর বেশ কয়েকটি সংস্করণ ইতোমধ্যে বের হয়ে গেছে। প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ইংরেজি, ফরাসি ও জার্মান ভাষায় ১৯১৩ইং থেকে ১৯৩৮ইং সালের মাঝামাঝি সময়ে। সেটাকেই এখন আধুনিক বিশ্বে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় উৎস ও জ্ঞান-ভাণ্ডার হিসেবে গণ্য করা হয়। আজকাল কোনো কোনো মুসলিম দেশতো প্রাচ্যবিদদের লেখা ওই 'বিশ্বকোষ'কে ইসলামী জ্ঞানের অন্যতম ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করে।[৭] বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থটির হুবহু অনুবাদের ব্যবস্থাও করেছে তারা।[৮] আরবী ভাষায় রূপান্তর করার সময় মিসরীয় অনুবাদ কমিটি ইসলামী বিষয়ে প্রাচ্যবিদদের বিভিন্ন ভুলত্রুটি সংশোধনের উদ্যোগ নেয়। একদল মুসলিম স্কলারের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় টীকা-টিপ্পনী সংযোজন করা হয়। ১৯৯৭ইং সালে আলোচ্য ইসলামী বিশ্বকোষের অনূদিত সংস্করণ সর্বমোট ৩২ খণ্ডে প্রকাশিত হয়।[৯]

১. ইগ্নায গোল্ডযিহার

ইসলামী আইন ও শরীয়াবিষয়ক গবেষণার জগতে প্রাচ্যবিদদের অন্যতম গুরু হচ্ছেন হাঙ্গেরিয়ান ইহুদি বংশোদ্ভূত প্রাচ্যবিদ ইগ্নায গোল্ডযিহার (Ignaz Goldizher)। ইসলামী আইন ও শরীয়া বিষয়ে তার মন্তব্য ও উক্তিগুলো বুদ্ধিবৃত্তিক মহলে বহুল আলোচিত ও সমালোচিত। তার লেখা অন্যতম গ্রন্থ হচ্ছে 'আল-আক্বীদা ওয়াশ-শরীআ ফিল ইসলাম' (العقيدة والشريعة في الإسلام) (Introduction to Islamic Theology and Law)। গ্রন্থটি জার্মান ভাষা থেকে আরবীতে অনুবাদ করেন মিসরীয় লেখক ড. আবদুল হালীম আন-নাজ্জার। এই গোল্ডযিহারই প্রথম

---

৭. সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী, *আল-ইসলামিয়াত : বাইনা কিতাবাতিল মুস্তাশরিকীন ওয়াল বাহিসীন আল-মুসলিমীন*, বৈরুত : মুআস্‌সাসাতু আর-রিসালাহ, ১৯৮৬, পৃ. ১৯

৮. প্রসঙ্গক্রমে স্বীকার করতে হয়, পাকিস্তানের লাহোরস্থ পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আলোচ্য বিশ্বকোষটির যে সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে তা অনেকাংশে নিখুঁত, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত। জ্ঞানগত মূল্য বিচারে তা স্বতন্ত্র গ্রন্থের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

৯. ড. মাহমূদ হামদী জকজুক, *আল-ইস্তিশরাক ওয়াল খালাফিয়াতুল ফিকরিয়্যাহ লিস সিরা'ইল হাদারী*, কায়রো : দারুল মা'আরিফ, পৃ. ৭০-৭২

প্রাচ্যবিদ, যিনি ইসলামী আইনের অন্যতম প্রধান উৎস হাদীসে নববী সম্পর্কে সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়েছেন তার রচনা ও গবেষণায়। এ কারণে পশ্চিমা বিশ্বে তার কদরও বেশি। আধুনিক ইসলামিক স্টাডিজ প্রতিষ্ঠায় তার নাম তালিকার শীর্ষে। বিশেষ করে হাদীসে নববী বিষয়ক গভীর পাণ্ডিত্যে প্রাচ্যবিদদের মাঝে তিনি গুরু হিসেবে বিবেচিত। পরবর্তীতে তিনি গোটা ইউরোপে ইসলামবিষয়ক জ্ঞান-গবেষণার পথপ্রদর্শক হিসেবে আবির্ভূত হন।

২. জোসেফ শাখ্ত

প্রাচ্যবিদ জোসেফ শাখ্ত (J. Schacht) (১৯০২-১৯৭০) আধুনিক ইসলামী আইন ও ফিক্হশাস্ত্রে এক অতি পরিচিত নাম। তার ক্ষেত্রে একথা প্রসিদ্ধ, তিনি ইসলামী ফিক্হের ভিত্তি সম্পর্কে নতুন একটি ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। এধারণা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বেশ কিছু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন ইংরেজি, ফরাসি ও জার্মান ভাষায়। এ লক্ষ্যে 'ইসলামী ফিক্হের প্রাথমিক কথা' (Introduction to Islamic Law) শিরোনামে একটি গ্রন্থও প্রণয়ন করেন তিনি, যা আরবিতে 'আল মাদখাল ইলাল ফিক্হিল ইসলামী' (المدخل إلى الفقه الإسلامي) নামে অনূদিত। তবে শাখ্ত রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'The Origins of Muhammadan Jurisprudence' (যা আরবীতে 'উসূলুশ শরীয়াতিল মুহাম্মাদিয়াহ'(اصول الشريعة المحمدية) শীর্ষক গ্রন্থটি সুপ্রসিদ্ধ। পরবর্তী প্রায় সকল প্রাচ্যবিদের লেখায় শাখতের ধারণা ও মতবাদের প্রচণ্ড প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এসব প্রাচ্যবিদের অন্যতম হচ্ছেন: অ্যান্ডারসন, রোবসন, ফিত্জ গ্রান্ড, কোলসন (Coulson), বোসর্থ (Bosworth) প্রমুখ। একইভাবে এ সব ধারণা ও মতবাদের গভীর প্রভাব দেখা যায় পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে গড়ে ওঠা মুসলমানদের মধ্যেও।

৩. নোয়েল জে. কোলসন

পরবর্তীতে উল্লেখযোগ্য যে কয়েকজন প্রাচ্যবিদ ইসলামী আইন ও ফিক্হশাস্ত্রে প্রচুর লেখালেখি করেছেন তাদের অন্যতম হচ্ছেন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অরিয়েন্টাল ল বিষয়ের অধ্যাপক নোয়েল জে. কোলসন (N. J. Coulson)। আলোচ্য বিষয়ে কোলসন বিরচিত তিনটি গ্রন্থের শিরোনাম হচ্ছে:

1. A History of Islamic Law, 1964
2. Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence, 1969
3. Succession in the Muslim Family, 1971

এছাড়া আমেরিকা, ব্রিটেন ইত্যাদি দেশ থেকে প্রকাশিত আইনবিষয়ক বিভিন্ন গবেষণা পত্রিকায় তার অনেক প্রবন্ধ ও গবেষণাকর্ম রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে ব্যক্তি ও রাষ্ট্র বিষয়ে তার একটি গবেষণার শিরোনাম হচ্ছে : The State and the

Individual in Islamic Law (International and Comparative Law Quarterly, Jan. 1957)

ইসলামী আইনে মতবাদ ও প্রয়োগ বিষয়ে তার অন্য একটি গবেষণাকর্ম হচ্ছে:
Doctrine and Practice in Islamic Law, BSOAS 18/2(1956)
উল্লেখ্য, প্রফেসর কোলসন পঁচিশ বছরের অধিক সময় ধরে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী আইন বিষয়ে অধ্যাপনা করেন।

৪. ড্যাভিড স্যান্টিলানা

ইতালিয়ান প্রাচ্যবিদ ড্যাভিড স্যান্টিলানা (David Santillana) (১৮৫৫-১৯৩১) ইসলামী ফিক্‌হ ও আইনের একজন গবেষক। তিউনিসিয়ায় জন্মগ্রহণকারী এ প্রাচ্যবিদ রোমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনের উপর ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। তার বিশেষত্ব হচ্ছে ইসলামী আইন ও ইসলামী দর্শন। ইসলামী শরীয়ার উপর ভিত্তি করে সিভিল অ্যান্ড কমার্সিয়াল ল' প্রণয়নে তার বিরাট ভূমিকা রয়েছে। পরবর্তী রোমান বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ইসলামী আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তুলনামূলক আইন ও ফিক্‌হশাস্ত্রে প্রাচ্যবিদ ড্যাভিডের প্রচুর রচনা রয়েছে।

৫. সেকোডা লুসেনা প্যারিডিস

ফরাসি প্রাচ্যবিদ সেকোডা লুসেনা প্যারিডিস (Secode Lucena Paredes) আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ের প্রসিদ্ধ একজন লেখক ও গবেষক। ১৯৪২ সালে তিনি গ্রানাডা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তার একটা বিশেষত্ব হচ্ছে, তিনি অনেক পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করেছেন। বিশেষ করে ইসলামী শরীয়া বিষয়ে তার গবেষণাকর্ম রয়েছে প্রচুর।

৬. নিকুলাস এগনিডেস

আরেকজন প্রাচ্যবিদ হলেন নিকুলাস এগনিডেস (Nicholas P. Agnides)। তার লেখা An Introduction to Muhammadan Law and Bibliography' যা ১৯৮১ ইং সালে লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়।

৭. শেলডন অ্যামস

লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের প্রফেসর শেলডন অ্যামস (Sheldon Amos)। আইন ও বিচার বিষয়ে তার প্রচুর গবেষণাকর্ম রয়েছে। এসব গবেষণায় বিশ্বের বিভিন্ন বিচার ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা স্থান পেলেও ইসলামী আইন সম্পর্কে তার ধারণা পক্ষপাতদুষ্ট। বিশেষ করে তার রোমান নাগরিক আইন (Roman Civil Law) শীর্ষক গ্রন্থে তিনি ইসলামী আইন রোমান আইন দ্বারা মদদপুষ্ট- এই ধারণাটি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন।

উপর্যুক্ত গবেষকগণ ছাড়াও ইসলামী আইন বিষয়ে প্রাচ্যবিদদের কলম থেমে নেই। ফিক্‌হশাস্ত্রের নানা বিষয়ে রচনা ও গবেষণাকর্ম নিয়ে তাঁরা হাজির হতে থাকেন একের

পর এক।[১০] একাডেমিক গবেষণার ক্ষেত্রে নতুনরা প্রাচীনদের স্থলাভিষিক্ত হন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরবর্তী প্রাচ্যবিদগণ তাদের পূর্বসূরীদের সাথে দ্বিমতও পোষণ করেন।

ইসলামী আইন বিষয়ে প্রাচ্যবিদদের দৃষ্টিভঙ্গির যথার্থতা পর্যালোচনা

আধুনিক ইসলামী আইন ও ফিক্‌হশাস্ত্রে প্রাচ্যবিদ শাখ্‌ত (J. Schacht)-এর ধারণা ও মতবাদ খুব বেশি আলোচিত। তার এসব ধারণা ও মতবাদ সম্পর্কে মুসলিম ফিক্‌হবিদ ও স্কলারদের অনেকেই আলোচনা-পর্যালোচনা করেছেন। অনেকে বুদ্ধিবৃত্তিক তর্ক-বিতর্কও করেছেন। তাদের মধ্যে রিয়াদস্থ কিং সঊদ ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মুস্তাফা আল-আজমীর ভূমিকা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি শাখতের ইসলামী শরীয়া আইনবিষয়ক গ্রন্থ সম্পর্কে বলেন,

> فإن كتاب شاخت يحاول أن يقلع جذور الشريعة الإسلامية ويقضي على تاريخ التشريع الإسلامي قضاء تاما.
>
> শাখ্‌তের ('The Origins of Muhammadan Jurisprudence' শীর্ষক) গ্রন্থটি ইসলামী শরীয়ার মূলোৎপাটন করার অপচেষ্টা করেছে। ইসলামী আইনের ইতিহাসকে পুরোদমে ধ্বংস করে দিতে চেয়েছে।[১১]

শাখ্‌ত বলেছেন,

> During the greater part of the first century- Islamic Law in the technical meaning of the term- did not as yet exist as had been the case in the time of the prophet. Law as such fell outside the sphere of religion and as far as there were no religious or moral objections to specific transaction of modes of behaviour. The technical aspects of Law were a matter of indifferance to the Muslims.
>
> প্রথম শতাব্দীর বিরাট অংশে ইসলামী ফিক্‌হের-পারিভাষিক অর্থে-কোনো অস্তিত্বই ছিল না। যেমনটি ছিল নবীর যুগে। আইন তথা শরীয়ত সেই অর্থে বলতে গেলে ধর্মের গণ্ডির বাইরে ছিল। আচার-আচরণের ক্ষেত্রে সেখানে কোনো বিশেষ মামলায় ধর্মীয় কিংবা নৈতিক দিক দিয়ে কোনো আপত্তি ছিল না। সুতরাং আইনের বিষয়টা মুসলমানদের নিকট গুরুত্বহীন একটি বিষয় হিসেবে পরিগণিত ছিল।

---

১০. যেমন : Norman Calder Gi, *Islamic Jurisprudene in the Classical Era*, Susan A. Spectorsky Gi, *Women in Classical Islamic Law : A Survey of the Sources*, Wael B. Hallaq Gi, *An Introduction to Islamic Law*, Timur Kuran Gi, *The Long Divergence : How Islamic Law Held Back the* Middle *East*, Pascale Fournier Gi *Muslim Marriage in Western Courts* ইত্যাদি।

১১. ড. মুস্তাফা আল-আজমী, *মানাহিজুল মুস্তাশরিকীন ফিদ দিরাসাতিল আরবিয়্যাহ আল-ইসলামিয়্যাহ*, তিউনিসিয়া : ইদারাতুস সাকাফা, ১৯৮৫ইং, খ. ১, পৃ. ৬৮

এক প্রসঙ্গে শাখ্ত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আরো বলেন তার (Introduction to Islamic Law) শীর্ষক গ্রন্থে (আরবী সংস্করণের ৩৪ তম পৃষ্ঠায়),

من الصعوبة اعتبار حديث ما من الأحاديث الفقهية صحيح النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

ফিক্হ বিষয়ে কোনো একটি হাদীসকেও রাসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট থেকে বিশুদ্ধ উপায়ে বর্ণিত বলে মেনে নেয়া কঠিন।'[১২]

এভাবে প্রাচ্যবিদ শাখ্ত রাসূলুল্লাহ সা.-এর ইসলামী আইন ও ফিক্হবিষয়ক সকল হাদীস এবং তদসঙ্গে সাহাবায়ে কিরামের ইসলামী আইনবিষয়ক আমলগুলোকে অস্বীকার করে বসেন তার লেখা গ্রন্থে।[১৩] অথচ সেই গ্রন্থটিই পশ্চিমা শিক্ষিত সমাজে অত্যন্ত সমাদৃত।[১৪] অন্যান্য প্রাচ্যবিদও শাখতের সেই ইসলামী আইনের মূলে কুঠারাঘাতকারী সত্যবিবর্জিত গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। প্রফেসর 'গিব' (Gibb) বলেন,

سيصبح أساسا في المستقبل لكل دراسة عن حضارته وشريعته على الأقل في العالم الغربي

এ গ্রন্থটি ভবিষ্যতে ইসলামের সভ্যতা ও শরীয়া সম্পর্কে যে কোনো গবেষণার জন্য একটি ভিত্তি হিসেবে গণ্য হবে; অন্তত পশ্চিমা বিশ্বে তো বটেই।[১৫]

লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়স্থ ইসলামী ফিকহের অধ্যাপক প্রাচ্যবিদ কোলসন তার স্তুতি গাইতে গিয়ে বলেন,

إن شاخت صاغ نظرية عن أصول الشريعة الإسلامية غير قابلة للدحض في إطارها الواسع

নিশ্চয়ই শাখ্ত ইসলামী শরীয়ার মূলনীতি সম্পর্কে এমন এক ধারণা দিয়েছেন, যা ব্যাপক অর্থে অনস্বীকার্য।[১৬]

বিশ্লেষকদের মতে 'ইসলামী ফিক্হ বা আইন দীনের গণ্ডির বাইরের একটি বিষয়'- শাখতের এমন মতবাদটাই হচ্ছে দৃশ্যত ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ। যদিও তারা তা প্রকাশ্যে স্বীকার করে না। ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের মত হচ্ছে, রাষ্ট্রের রাজনৈতিক শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে ধর্ম থেকে দূরে থেকে। আর এভাবেই আধুনিক শিক্ষিত মুসলিম যুবসমাজের মাঝে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ শিকড় গেড়ে বসে। বিশেষ করে যেসব

---

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

১৩. For the legal subject-matter in early Islam did not primarily derive from the Koran or from other purely Islamic sources. Law lay to a great extent outside the sphere of religion..(Origins, preface)

১৪. প্রাগুক্ত

১৫. H. A. R. Gibb, *Journal of Comparative Legistation and International Law*, Vol. 33, p. 114. সূত্র মতে ড. মুস্তাফা আল-আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

১৬. ড. আবদুল কাহহার দাউদ আবদুল্লাহ আল-আফী, *আল-ইস্তিশরাক্ব ওয়াদ-দিরাসাতুল ইসলামিয়া*, আম্মান-জর্দান : দারুল ফুরকান, ২০০১ইং. পৃ. ১৪৫

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যবিদ শাখ্ত ও তার অনুসারী অন্যান্য প্রাচ্যবিদের বই-পুস্তক পড়ানো হয় সেসব কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী মুসলিম সন্তানদের মধ্যে এ ধরনের প্রবণতা বেশি পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে ড. আবদুল কাহহার দাউদের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

وإن نظرية "شاخت" على ما يبدو هي نظرية "العلمانية" ولو لم يصرح بذلك وهي إقامة نظام الدولة السياسي بعيدا عن الدين, وقد رأينا الأزهري علي عبد الرزاق قد حمل هذه الراية واعتمد رأيه كثير من أنصار العلمانية في الغرب والشرق

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, শাখতের মতবাদই ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ। যদিও তা খুলে বলা হয় না। সেই মতবাদের মূল কথা হচ্ছে, ধর্ম থেকে দূরে থেকেই রাষ্ট্রের রাজনৈতিক তথা সরকার পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আমরা আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী আলী আবদুর রাজ্জাককে এই (মতবাদের) পতাকা বহন করতে দেখেছি। পরবর্তীতে লক্ষ্য করেছি, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের দোসরদের অনেকেই তার সেই মত ও রায়কে নির্ভরযোগ্যতার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন।[১৭]

মুসলিম দেশসমূহে পাশ্চাত্য উপনিবেশবাদের যাত্রা শুরু হবার পর থেকেই ধর্মনিরপেক্ষ আইনের প্রভাব ব্যাপক আকার ধারণ করে। এই রূঢ় বাস্তবতার দিকেই ইঙ্গিত করে প্রফেসর মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ বলেছেন,

With the advent of Western colonialism in Muslims lands, Islamic law was overshadowed by secular law.[১৮]

এভাবেই আধুনিক মুসলিম প্রজন্মকে দীন থেকে দূরে রাখতে এবং ইসলামী আইন ও শরীয়া সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ করে তুলতে পরিকল্পিতভাবে চালানো হয় এক বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন। ক্রুসেড যুদ্ধের পর থেকে মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে পরিচালিত ইউরোপিয়ানদের এই বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত থাকে। বিগত দুই শতাব্দী ধরে তাদের এ আন্দোলন আরো বেগবান হয়। আন্দোলনের ফসল ঐসব প্রাচ্যবিদদের পিছনে ব্যয় করা হয় অঢেল সম্পদ। ফলে তাদের লেখালেখি ও গবেষণায় নতুন মাত্রা যোগ হয়। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত এই দেড়'শ বছরে প্রাচ্যবিদগণ তাদের এ অশুভ লক্ষ্য বাস্তবায়নে প্রাচ্য তথা ইসলাম, ইসলামী শরীয়ত, মুসলমান ও মুসলিম দেশ সম্পর্কে ষাট হাজার বই-পুস্তক রচনা করেছেন।[১৯] এর মধ্যে কিছু কিছু বই

---

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২

১৮. Faizal Ahmad Manjoo, An Orientalist Perspective of Islamic Law: from Fossilization to Legal Transplant, *The Muslim World Book Review*, UK: The Islamic Foundation, 31:4, 2011, p. 6

১৯. Edward Said, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৬; ড. আকরাম জিয়া আল-ওমারী, *মাওকিফুল মুস্তাশরিক্বীন মিনাস সীরাতি ওয়াস সুন্নাহ*, দারু ইশবিলিয়্যাহ, পৃ. ৬-৭

মুসলিম বিশ্বে অত্যন্ত সমাদৃত। ওসব গ্রন্থে উল্লেখিত প্রাচ্যবিদদের বিভিন্ন মতামতকে আধুনিক শিক্ষিত সমাজ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে থাকেন। যা অনেক সময় মুসলমানদের নতুন প্রজন্মের জন্য অত্যন্ত ভয়ংকর ও ক্ষতিকর বিষয়ে পরিণত হয়। বিশেষ করে মুসলিম জীবনপ্রণালী, আইন ও বিচার, ফিক্‌হ, শরীয়তসহ ইসলামের সরাসরি বিষয়ে লিখিত কতিপয় প্রাচ্যবিদের বই। প্রাঞ্জল আরবী বা ইংরেজি ভাষায় রচিত তাদের কোনো কোনো বইয়ের দোষ-ত্রুটিগুলো মুসলিম বিশেষজ্ঞ স্কলার্স ছাড়া সাধারণ পাঠক বা ছাত্র সমাজ কখনোই ধরতে পারবে না। অথচ ঐসব আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমান যুবসমাজ এক সময় মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হন, অনেক সময় ক্ষমতার শীর্ষস্থানীয় পদে আরোহন করেন। তখন মুসলমানের সন্তান হয়েও সেসব ক্ষমতাবানদের কার্যক্রমে দেখা যায়, ইসলামের প্রতি তাদের কোনো দরদ নেই, ঈমান ও শরীয়া বিরোধী এবং মুসলমানদের স্বার্থ বিরোধী পদক্ষেপ নিতে তাদের বুক কাঁপে না। মুসলিম হয়েও ইসলামী আইন মানেন না। 'ইসলামী আইন সেকেলে,' 'এসব আইন ও বিচার বর্তমানে অচল,' 'শরীয়া আইন মধ্যযুগীয় বর্বর আইন'...(নাউজুবিল্লাহ) ইত্যাদি যেসব উক্তি বর্তমান মুসলিমপ্রধান দেশগুলোতে বিভিন্ন নেতা ও কর্তাব্যক্তিদের মুখে শোনা যায়, তা সেই প্রাচ্যবাদেরই ভয়াবহ প্রভাব এবং বিদ্বিষ্ট প্রাচ্যবিদদের লেখা বিভ্রান্তিকর বই-পুস্তকের আলোয় গড়ে উঠার ভয়ানক পরিণতি।

রচনা ও গবেষণার ক্ষেত্রে প্রাচ্যবিদদের কৌশল সম্পর্কে প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভী রহ. বলেন,

> وكثير من هؤلاء المستشرقين يدسون في كتاباتهم مقدارا خاصا من السم ويحترسون في ذلك, فلا يزيد على النسبة المعينة لديهم, حتى لا يستوحش القارئ ولا يثير ذلك فيه الحذر, ولا يضعف ثقته بنزاهة المؤلف, إن كتابات هؤلاء أشد خطرا على القارئ من كتابات المؤلفين الذين يكاشفون العداء, ويشحنون كتبهم بالكذب والافتراء, ويصعب على رجل متوسط في عقليته أن يخرج منها, أو ينتهي من قراءتها دون الخضوع لها.
>
> অনেক প্রাচ্যবিদ তাদের লেখায় নির্দিষ্ট পরিমাণে 'বিষ' মিশিয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে তারা খুব সতর্কতা অবলম্বন করেন। নির্ধারিত পরিমাণের চাইতে বেশি (তথ্য) বিষ প্রয়োগ করেন না, যাতে পাঠক নিঃসঙ্গতা অনুভব না করে, সতর্ক হয়ে না যায় এবং লেখকের স্বচ্ছতার প্রতি তার যে আস্থা তা যেন দুর্বল হয়ে না যায়। এমন প্রাচ্যবিদদের লেখা পাঠকের জন্যে ঐসব লেখকের চাইতে বেশি ভয়ংকর ও বিপদজনক যারা প্রকাশ্যে শত্রুতা করেন এবং নিজেদের লেখা বই-পুস্তকসমূহকে মিথ্যা ও বানোয়াট দিয়ে বোঝাই করে তোলেন। ফলে মধ্যম মানের বিবেকসম্পন্ন পাঠকের পক্ষে এসব লেখকের বিষাক্ত ও মিথ্যা তথ্যের সামনে হার না মেনে তাদের বই-পুস্তক থেকে বেরিয়ে আসা অথবা পড়া সমাপ্ত করা কঠিন হয়ে যায়।[২০]

---

২০. সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

তবে আধুনিক যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষের দরুন পশ্চিমাদের মাঝে ইসলাম, পবিত্র কুরআন ও হাদীস নিয়ে গবেষণার আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। বর্তমান প্রেক্ষিতে ইসলামী আইনের যথার্থতা অনেকের নিরপেক্ষ গবেষণায় ইতিবাচক হিসেবে ধরা পড়ে। ফলে পূর্ববর্তী প্রাচ্যবিদদের ইসলামী আইন ও ফিক্‌হশাস্ত্র বিষয়ক কোনো কোনো দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে পরবর্তী প্রাচ্যবিদগণ ভিন্নমতও পোষণ করেন। বিশেষ করে পূর্ববর্তীদের মানহানিকর ও উপনিবেশবাদী সুরের স্থলে নতুনদের রচনায় স্থান করে নিয়েছে বিষয়ভিত্তিক ও একাডেমিক গবেষণা। এই প্রসঙ্গে বিশ্লেষক ফয়যাল ম্যানুজু'র বক্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

> Since the beginning of Oreintalism as a discipline in the 17th century until today, research methodology in Islamic law has witnessed a paradigmatic shift. The derogatory and colonialist tone of pioneers such as Goldzihar, Schacht and Watt has been replaced by academic objectivity by scholars such as Nadia Abbott and Wael Hallaq.[২১]

ফিক্‌হ সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের মতামত : পর্যালোচনা

ইসলামী আইন, শরীয়ত ও ফিক্‌হশাস্ত্র নিয়ে বিশিষ্ট প্রাচ্যবিদদের কয়েকটি মতামত বা অপবাদ প্রসিদ্ধ, যা ইসলামী চিন্তাধারার সাথে অত্যন্ত সাংঘর্ষিক। যথা:

এক. ইসলামী আইন ও শরীয়ত প্রাচীন রোমান আইন দ্বারা প্রভাবিত ও মদদপুষ্ট।

দুই. আধুনিক যুগে ইসলামী শরীয়ত বা আইন অচল। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলার যোগ্যতা নেই ইসলামী আইন ও ফিক্‌হশাস্ত্রের।

তিন. ফিক্‌হ বা ইসলামী আইন ধর্মের গণ্ডিবহির্ভূত একটি বিষয়।

ইসলামী আইন, শরীয়াহ ও ফিক্‌হশাস্ত্র বিষয়ে প্রাচ্যবিদদের উপর্যুক্ত মতামত এবং তাদের আরোপিত অপবাদসমূহ নিতান্ত প্রলাপ এবং সত্যকে আড়াল করতে অন্তসারশূন্য অপপ্রয়াস বৈ কিছু নয়। ইসলামী আইনের বিদগ্ধ গবেষকগণ এসব অপবাদের যথাযথ জবাব দিয়েছেন তাদের বিভিন্ন গবেষণাকর্মে। এক্ষেত্রে প্রচুর বই বের হয়েছে আরব বিশ্বে। যার বিস্তারিত আলোচনা এই স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। সংশ্লিষ্ট গবেষকদের কতিপয় মূল্যায়ন দিয়েই সংক্ষিপ্তাকারে এ বিষয়ে পর্যালোচনা করতে চাই।

১. শরীয়াহ আইনে রোমান আইনের প্রভাব

'ইসলামী আইন ও শরীয়ত প্রাচীন রোমান আইন দ্বারা প্রভাবিত ও মদদপুষ্ট'-এই মতামত ও অপবাদের প্রবক্তা প্রাচ্যবিদ 'গোল্ডযিহার', 'ভন ক্রেমার', 'শেলডন

---

২১. Faizal Manjoo, ibid, p. 6

অ্যামস'সহ আরো অনেকে। এ প্রসঙ্গে প্রাচ্যবিদ 'শেলডন অ্যামস (Sheldon Amos) -এর কয়েকটি প্রসিদ্ধ উক্তি প্রখ্যাত লেখক ও গবেষক ড. মাহমূদ হামদী জকজুক তাঁর একটি গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি শেলডনের উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন,

> يقول "شلدون آموس" بصريح العبارة: "إن الشرع المحمدي ليس إلا القانون الروماني للامبراطورية الشرقية معدلا وفق الأحوال السياسية في الممتلكات العربية"
>
> ويقول أيضا: "إن القانون المحمدي ليس سوى قانون جستنيان في لباس عربي
>
> প্রাচ্যবিদ শেলডন স্পষ্টভাষায় বলেন, 'মুহাম্মাদী (তথা ইসলামী) আইন হচ্ছে পূর্বাঞ্চলীয় সাম্রাজ্যের রোমান আইনেরই সংস্কৃত রূপ। ওটাকেই আরব রাজ্যসমূহে রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুযায়ী সাজিয়ে তৈরি করা হয়েছে।' তিনি আরো বলেন, 'মুহাম্মাদী আইন জাস্টিনিয়ান (Justinian) আইন ছাড়া আর কিছু নয়। ওটাকেই কেবল আরবী পোশাক পরানো হয়েছে।'[২২]

ইসলামী শরীয়াহ আইনে রোমান আইনের প্রভাব-এই বিষয়ের অনুকূলে প্রাচ্যবিদদের দাবি হচ্ছে, মুসলমানরা যেসব এলাকা ও অঞ্চল জয় করেছিল সেখানকার বিজিত জাতির আইন-কানুন থেকে সাহায্য নেয়াটাই স্বাভাবিক। আর এসব এলাকায় তখন প্রচলিত ছিল রোমান আইন। মুসলমানদের পদানত হবার পূর্বে এসব এলাকা রোমান সাম্রাজ্যের আওতাধীন ছিল। এভাবে ইসলামী ফিক্‌হ ও শরীয়াহ আইন রোমান আইন দ্বারা প্রভাবিত হয়। এমনকি প্রাচ্যবিদ গোল্ড যিহারের ভাষায় 'ফিক্‌হ' ও 'ফুকাহা' পরিভাষাদ্বয় রোমান আইনি পরিভাষা যথাক্রমে (Juris) Prudentis ও (Juris) Prudentes দ্বারা প্রভাবিত।[২৩]

রোমান আইনের ক্ষেত্রে প্রথম কথা হচ্ছে, সব প্রাচ্যবিদ কিন্তু এমন দাবি করেননি যে, ইসলামী আইন ও ফিক্‌হ রোমান আইন দ্বারা প্রভাবিত। যারা করেছেন তাদের অন্যতম হচ্ছেন: গোল্ড যিহার তার Introduction to Islamic Theology and Law গ্রন্থে, ভন ক্রেমার تاريخ الثقافة الشرقية في أيام الخلفاء গ্রন্থে, ডি পোর তার تاريخ الفلسفة في الإسلام গ্রন্থে এবং শেলডন অ্যামস তার (Roman Civil Law) শীর্ষক গ্রন্থে। তাদের বাইরে আরো অনেক প্রাচ্যবিদ রয়েছেন যারা এ দাবির বিপক্ষে। তাদের মধ্যে মিয়্যু, ন্যালিনিও, ওলফ, নোলডে, অ্যারমেনজুন, যায়েস প্রমুখ। উদাহরণস্বরূপ প্রাচ্যবিদ যায়েস নিশ্চিত করে বলেন, ইসলামের শরীয়াহ আইন ও রোমান আইনের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ এখানে একটা মানব রচিত এবং আরেকটার উৎস হচ্ছে ঐশী প্রত্যাদেশ।[২৪]

---

২২. ড. মাহমূদ হামদী জকজুক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩-১১৪। Mian Rashid Ahmad Khan, *Islamic Jurisprudence*, Sh. Muhammad Ashraf, Lahore, 1978, pp. 153-155

২৩. ড. ইবরাহীম আওয়াদ, *দায়েরাতুল মা'আরিফ আল-ইসলামিয়াহ আল-ইস্তিশরাকিয়া : আদালীল ওয়া আবা'তীল*, মিসর : মাকতাবাতুল বালাদিল আমীন, ১৯৯৮ইং, পৃ. ৯৯

২৪. ড. ইবরাহীম আওয়াদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪

কিসের ভিত্তিতে প্রাচ্যবিদগণ বলেন, ইসলামী শরীয়ত রোমান আইন ও রোমান বিচার ব্যবস্থা থেকে নেয়া। এক্ষেত্রে তাদের দলিলসমূহ হচ্ছে মোটামুটি নিম্নরূপ:

ক. ইসলামের পূর্বে আরব ও রোমানদের মধ্যে যোগাযোগ ছিল। এই যোগাযোগের কারণে প্রথমপক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের আইন দ্বারা প্রভাবিত হয়।

খ. মুসলমানরা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে রোমানদের আইন দ্বারা প্রভাবিত হয়।

গ. ইসলামী শরীয়াহ্ আইন আরবদের প্রচলিত কতিপয় 'উরফ' তথা প্রথা-রেওয়াজ দ্বারা প্রভাবিত, যেসব প্রথা-রেওয়াজ পূর্ব থেকেই রোমান আইন দ্বারা প্রভাবিত ছিল।

ঘ. এক্ষেত্রে তারা কতিপয় রোমান আইনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দিকে ইঙ্গিত করেন, যা তখনকার যুগে শাম, মিসর, আলেকজান্দ্রিয়া, বৈরূত ও কায়সারিয়ায় ছিল।

ঙ. এ প্রসঙ্গে তারা রোমান আইন বিষয়ক কিছু বই-পুস্তকের কথাও উল্লেখ করেন।

চ. রোমান বিচারপদ্ধতির প্রভাব, যা তৎকালীন সময়ে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অধীনস্ত রাজ্যসমূহে প্রচলিত ছিল। বিশেষ করে তারা রোমান 'প্রেইটর' পদ্ধতি এবং ইসলামের বিচারিক পদ্ধতির মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে বলে দাবি করেন।

এ ছাড়া প্রাচ্যবিদদের মতে, ইসলামী ফিক্হ ও রোমান আইনের মধ্যে প্রচুর সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন البينة على من ادعى অর্থাৎ 'বাদীকে দলিল পেশ করতে হবে', প্রাপ্ত বয়স্কের বয়স নির্ধারণ, بيع (ক্রয়-বিক্রয়) ও مقايضة (পণ্য বিনিময়)-এর মধ্যে সাদৃশ্য প্রভৃতি। তাদের দৃষ্টিতে এসব সাদৃশ্যই প্রমাণ করে, ইসলামী আইন রোমান আইন দ্বারা প্রভাবিত।[২৫]

রোমান আইন বিষয়ে প্রাচ্যবিদদের উপর্যুক্ত মতামত ও দাবি নিতান্তই অজ্ঞতাপ্রসূত। ইসলামী ফিক্হ ও আইনের প্রকৃত ইতিহাস এবং রোমান আইনের ইতিবৃত্ত পর্যালোচনা করলেই এসব মতামতের অসারতা প্রতীয়মান হয়।

প্রথমত, ইসলামী ফিক্হ রোমান আইনের মদদপুষ্ট- এই দাবিটাই হচ্ছে নতুন; যার সূচনা উনবিংশ শতাব্দীতে। সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি এ দাবিটা উত্থাপন করেন তিনি হচ্ছেন আলেকজান্দ্রিয়ার অধিবাসী 'ডোমিনিলো জেতস্কি' নামক জনৈক ইতালিয়ান আইনজীবী। আলেকজান্দ্রিয়া থেকে ১৮৬৫ ইং সালে ইতালি ভাষায় প্রকাশিত তার একটি বইয়ে তিনি এমন দাবি করেন। এখানে আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি যে,

---

২৫. ড. মুহাম্মদ যুহদী য়াকুন, *আল-কানূনুর রূমানি ওয়াশ-শরীআতুল ইসলামিয়াহ*, বৈরূত : দারু য়াকুন, পৃ. ৪৫-৮০; ড. ইবরাহীম আওয়াদ, প্রাগুক্ত, ১৯৭৫ইং, পৃ. ১০৫

এ দাবি যদি সঠিক হত, তাহলে ইসলামের আবির্ভাবের পর থেকে দীর্ঘ শতশত বছরে পশ্চিমা লেখক ও গবেষকগণ নিশ্চুপ বসে থাকতেন না। বাইজান্টাইন লেখকরা ইসলাম, ইসলামের নবী, ইসলামের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ নিয়ে কত লিখেছেন! কিন্তু তাদের একজনও এমন দাবি করেননি। এ দাবির সপক্ষে লেশমাত্র সত্য থাকলেও আহলে কিতাব ও পশ্চিমারা ইসলামের শত্রুতায় বইয়ের পাহাড় রচনা করে দিতেন।

'ফিক্‌হ' ও 'ফুকাহা' পরিভাষাদ্বয় রোমান আইনি পরিভাষা থেকে নেয়া-প্রাচ্যবিদ গোল্ডযিহারের এমন দাবি নিতান্তই সত্যবিবর্জিত। ইসলামী আইনের মৌলিক উৎস পবিত্র কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে তার অজ্ঞতাই প্রমাণ করে। মিস্টার গোল্ডযিহার হয়ত জানেন না, ইসলামী আইন প্রণয়নে রোমান আইনের প্রভাবের অনেক পূর্বেই পবিত্র কুরআনে 'ফিক্‌হ' শব্দের মূলধাতু থেকে উৎসারিত বিভিন্ন আঙ্গিকের শব্দ অন্তত বিশ জায়গায় এসেছে। আর হাদীস শরীফে যা এসেছে তা তো অসংখ্য। এ প্রসঙ্গে উদাহরণস্বরূপ পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا۟ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا۟ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾[২৬]

এ আয়াতে ليتفقهوا শব্দটি ফিক্‌হ শব্দ থেকে উদ্ভূত।

শরীয়া আইনে রোমান আইনের প্রভাব বিষয়ে প্রাচ্যবিদদের উত্থাপিত অবশিষ্ট দাবি ও মতামতের জবাবে ইতিহাসের সত্য উচ্চারণ হচ্ছে, জাহিলি যুগে আরবরা বেদুঈন জীবন যাপন করত। প্রতিবেশী বিভিন্ন জাতি যাদের মধ্যে বাইজান্টাইনও ছিল- তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কোনোই সুযোগ ছিল না। উভয়ের মধ্যে ব্যবসায়িক যে সম্পর্ক ছিল তা কাফেলাসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। যেসব কাফেলা বছরে একবার সিরিয়া যেত তাতে আরবদের সংখ্যাও থাকত নিতান্ত অল্প। সীমিত সময়ের জন্য কাফেলা থামত সেখানে এবং বাইজান্টাইনদের সঙ্গে পণ্য বিনিময় করে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করত। ঐসব এলাকায় বসবাসরত গাস্‌সান জাতি বাইজান্টাইন সভ্যতার বাহ্যিক কিছু আচার-আচরণ দ্বারা প্রভাবিত ছিল বটে। কিন্তু তারাও রোমান আইন গ্রহণ করেনি। অনুরূপভাবে মিসর ও সিরিয়াবাসী বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অধীনস্ত হওয়া সত্ত্বেও আঁকড়ে ছিল তাদের স্থানীয় আইন-কানুন।

ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মাধ্যমে ইসলামের পূর্বেই আরবদের মধ্যে রোমান আইন স্থানান্তরিত হওয়া বিষয়ে গবেষকদের বক্তব্য হচ্ছে, বরং ইহুদি আইনই রোমান আইনে প্রভাব বিস্তার করেছিল। ৭০ খ্রিস্টাব্দে ইহুদি আর রোমান সরকারের মধ্যে সংঘটিত সংঘর্ষসমূহের কারণে ইহুদিরা তাদের ধর্মীয় প্রথাসমূহ ধরে রেখেছিল। এমনিতেই

---

২৬. আল-কুরআন, ৯ : ১২২

তারা রোমান সরকারের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল। এদিকে ইহুদিরা ইসলামের পূর্বে আরব উপদ্বীপে এতই সংখ্যালঘু ছিল যে, আরবদের উপর তাদের কোনো প্রভাব পড়ার সম্ভাবনাই নেই। একইভাবে আরবদের মধ্যে খ্রিস্টানদের সংখ্যাও ছিল খুবই অল্প। নাজরানে যেসব খ্রিস্টান ছিল তাদের সম্পর্ক ছিল আবিসিনীয়দের সাথে। কারণ উভয়ের ধর্ম ইয়াকুবী হওয়ায় আবিসিনীয়দের সঙ্গে বিদ্যমান সম্পর্ক ভিন্ন ধর্মাবলম্বী রোমানদের তুলনায় বেশি শক্তিশালী ছিল। অন্যান্য খ্রিস্টান গোত্র যারা রোমান সাম্রাজ্যের পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় বসবাস করত তারাও তাদের গ্রামীণ ও বেদুঈন জীবনপদ্ধতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিল। রোমান আইনের কোনো কিছু তাদের মধ্যে প্রবেশের ঘটনা ঘটেনি। এ প্রসঙ্গে ড. বদরান আরো যোগ করে বলেন,

> ইসলামী ফিক্‌হের কোনো ইমামই ইহুদি বংশোদ্ভূত ছিলেন না অথবা কেউই ইহুদি শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না। এছাড়া ইহুদি শরীয়া আইন লিপিবদ্ধ ছিল হিব্রু ভাষায়, যা সাধারণত আরবরা জানত না। ফলে ইসলামের পূর্বে ইহুদি কিংবা অন্য কোনো মাধ্যমে আরবদের মধ্যে রোমান আইন প্রভাব বিস্তার করেছিল- কথাটা সঠিক নয়।

রোমান আইনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রভাবের দাবিটাও অসত্য। গবেষক ড. যুহদি ও ড. বদরান উভয়ই তাদের দীর্ঘ গবেষণাকর্মের পর এই ফলাফলে পৌঁছেন যে, সিরিয়া ও মিসরে যখন ইসলামের বিজয় সূচিত হয় তার অনেক পূর্বেই ঐসব কথিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিলীন হয়ে গিয়েছিল। তারপরও মুসলিম ফিক্‌হবিদদের মধ্যে ঐসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রভাবের দাবি তোলাটা সম্পূর্ণ অনৈতিক ও কল্পনাপ্রসূত।

এবার আসুন রোমান আইনের বই-পুস্তকের প্রভাব বিষয়ে। এ দাবি খণ্ডনের জন্য আমাদের এতটুকু জানাই যথেষ্ট যে, আরবরা চিকিৎসা, দর্শন, সৌরবিদ্যা, অংকশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে অনেক প্রাচীন বই-পুস্তক অনুবাদ করলেও তারা কিন্তু আইনের কোনো বই অনুবাদ করেনি। এ রকম কিছু ঘটলে অন্যান্য অনূদিত বিষয়ের মধ্যে তার উল্লেখও থাকত নিঃসন্দেহে। উদাহরণস্বরূপ পিথাগোরাস, প্ল্যাটো, এরিস্টটল, গালিনিউস প্রমুখদের নামের সাথে সাথে তাদের বই-পুস্তকের বাইজান্টাইন আইনজ্ঞদের নামও আমরা দেখতে পেতাম। এছাড়া রোমান আইনের বই-পুস্তক নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে- ধর্মীয় আক্বীদা-বিশ্বাস মুসলিম ফিক্‌হবিদদেরকে সেই অনুমতি দিত না। তবে হ্যাঁ, রোমান আইনের একটি গ্রন্থ পাওয়া যায় যা আরবীতে অনূদিত হয়েছিল। তা হচ্ছে, قسطنطين الأباطرة قوانين وليون وتيودوسيانوس, কিন্তু এর অনুবাদ সম্পন্ন হয় ১১০০ ইং সালে অর্থাৎ ইসলামী ফিক্‌হ প্রণয়নের বেশ কয়েক শতাব্দী পর। এ একটি মাত্র উদাহরণ রয়েছে যার কোনো আলোচনাই আসেনি পরবর্তীতে প্রণীত ইসলামী ফিক্‌হ ও আইনের গ্রন্থসমূহে।

ইসলাম ও রোমান আইনে বিচারব্যবস্থার মধ্যে সাদৃশ্যের যে দাবি উত্থাপিত হয় তার জবাবে বলা যায়, আরবরা যখন প্রথম সিরিয়া জয় করে তখন "প্রেইটর" (Praetor) পদ্ধতি বলবৎ ছিল। কিন্তু ইসলামের সূর্য উদিত হবার অন্তত চার শতাব্দী পূর্বেই রোমান সাম্রাজ্য থেকে এই পদ্ধতি বিলুপ্ত হয়ে যায়। এছাড়া উভয় পদ্ধতিতে যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে, তা তো আছেই। যেমন, রোমান আইনে বাদী-বিবাদী নিজেরাই বিচারক নির্বাচন করত এবং উভয়ের দাবি বিচারকের সামনে উত্থাপন করত। বিচারক তাদের দাবিগুলো শুনে নির্দিষ্ট বিশেষ কিছু ফরমে তা লেখার নির্দেশ দিত, যেখানে বিচারক মামলার রায় কিভাবে দিবে তার চিত্র তুলে ধরা হত। অথচ ইসলামী আইনে রাষ্ট্রই বিচারক নিযুক্ত করে। উভয় পক্ষের উপস্থাপিত মামলায় ইসলামের প্রচলিত আইনে সুরাহা না হলে বিচারক শরীয়তের আলোকে গবেষণা করে সিদ্ধান্ত বের করে রায় দিয়ে থাকেন।

ইসলামী ফিক্‌হ ও রোমান আইনের মধ্যে আরো যেসব সাদৃশ্যের কথা বলা হয়েছে যেমন البينة على من ادعى অর্থাৎ 'বাদীকে দলিল পেশ করতে হবে', প্রাপ্ত বয়স্কের বয়স নির্ধারণ, بيع ও مقايضة ইত্যাদি ক্ষেত্রে সাদৃশ্য- তাও সঠিক নয়। কারণ, বাদী তার দাবির সপক্ষে দলিল উপস্থাপন করবে-মর্মে ইসলামী আইনে যে ধারাটি রয়েছে তা এমন একটি আরবী প্রবাদ থেকে উৎসারিত যা হাদীস শরীফে বর্ণিত। পুরো হাদীসটা হচ্ছে البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر[২৭]

সুতরাং এখানে তা রোমান কিংবা অন্য কোনো আইন থেকে নকল করার দরকার পড়ে না। এটাই সাধারণ জ্ঞানের কথা। প্রাপ্তবয়স্কের বয়স নির্ধারণের বিষয়টাও তেমন নয় যেমনটা প্রাচ্যবিদগণ বলে থাকেন। কারণ রোমান আইনে মেয়েদের জন্য বয়সসীমা হচ্ছে ১২ বছর আর ছেলের ক্ষেত্রে ১৪ বছর। অথচ ইসলামী শরীয়তে ছেলে-মেয়ে উভয়ের জন্য ১৫ বছর।[২৮] بيع ও مقايضة এর বিষয়েও আমরা দেখি, রোমান আইন উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করেছে এই বলে যে, بيع হচ্ছে مبادلة مال بنقد

---

২৭. আহমদ ইবন হুসাইন আল-বায়হাকী, *সুনান আল-বায়হাকী আল-কুবরা*, মক্কাঃ মাকতাবাতু দারিল বা'য, ১৯৯৪ইং, খ. ৮, পৃ. ১২৩

২৮. ইসলামের পঞ্চম খলীফা 'উমার ইবনু 'আবদিল 'আযীয রাহ. শিশুর বয়সসীমা পনেরো বছর নির্ধারণ করেন। উল্লেখ্য, তাঁর এ বয়সসীমা নির্ধারণেরও ভিত্তি হলো একটি হাদীস। নাফি' রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রা. উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য রাসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে অনুমতি চাইলে রাসূলুল্লাহ সা. তাঁকে অনুমতি দেননি। তখন তাঁর বয়স ছিল চৌদ্দ বছর। পরের বছর খন্দকের যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য অনুমতি চাইলে তাঁকে যুদ্ধে যাবার অনুমতি দেওয়া হয়। তখন তাঁর বয়স ছিল পনেরো বছর। রাবী নাফি রা. বলেন, এ ঘটনা শুনে খালীফা 'উমার ইবনু 'আবদিল 'আযীয রা. বললেন, إِنَّ هَذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ.-"এটাই হলো শিশু ও বয়স্কদের বয়সসীমা।" (ইমাম মুসলিম, *আস-সাহীহ*, অধ্যায়- আল-ইমারাহ, অনুচ্ছেদ : বায়ানু সিন্নিল বুলূগ, হা. নংঃ ৪৯৪৪)

অর্থাৎ মুদ্রা (currency) দিয়ে সম্পদের বিনিময়। আর مقايضة হচ্ছে مبادلة مال بمال অর্থাৎ সম্পদের বিনিময়ে সম্পদ। এভাবে রোমান আইন উভয়কে যথাক্রমে 'সন্তুষ্টি ভিত্তিক চুক্তি' এবং 'বেনামে অনির্ধারিত চুক্তি' দুইভাগে বিভক্ত করে। কিন্তু ইসলামী শরীয়াহ بيع ও مقايضة উভয়কে 'সন্তুষ্টি ভিত্তিক বিক্রয়' এর আওতাভুক্ত করে।[২৯]

সুতরাং শরীয়াহ আইনে রোমান আইনের প্রভাব রয়েছে- প্রাচ্যবিদদের এমন দাবি যথার্থ নয়। তাই ইসলামী ফিক্‌হশাস্ত্রের বিরুদ্ধে পরিচালিত প্রাচ্যবিদদের বুদ্ধিবৃত্তিক ষড়যন্ত্রসমূহ বিশেষ করে উপরোল্লেখিত তাদের প্রথম অপবাদ ও তার জবাব প্রসঙ্গে প্রখ্যাত লেখক ও গবেষক.ড. মুস্তাফা সিবায়ি লিখেন,

....التشكيك بقيمة الفقه الإسلامي الذاتية, ذلك التشريع الهائل الذي لم يجتمع مثله لجميع الأمم في جميع العصور, لقد سقط في أيديهم حين إطلاعهم على عظمته وهم لا يؤمنون بنبوة الرسول, فلم يجدوا بدا من الزعم بأن هذا الفقه العظيم مستمد من الفقه الروماني, أي أنه مستمد منهم – الغربيين– وقد بين علماؤنا الباحثون تهافت هذه الدعوى, وفيما قرره مؤتمر القانون المقارن المنعقد بلاهاي من أن الفقه الإسلامي فقه مستقل بذاته وليس مستمدا من أي فقه آخر, ما يفحم المتعنتين منهم, ويقنع المنصفين الذين لا يبغون غير الحق سبيلا.

ইসলামী ফিক্‌হের আত্মমর্যাদা ও মূল্যের ক্ষেত্রে সংশয় সৃষ্টি করা তাদের অন্যতম লক্ষ্য। তারা যখন দেখলেন, এমন বিশাল আইনের ভাণ্ডার যা একত্রে ইতঃপূর্বে কোনো যুগের কোনো জাতির জন্য ছিল না, এত সমৃদ্ধ ইসলামের আইন কিভাবে হতে পারে। এ আইনের মাহাত্ম্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যান তারা। যেহেতু তারা রাসূলের নুবুওয়াতে ঈমান পোষণ করেন না, তাই এমন ধারণা করা ছাড়া আর কোনো পথ খুঁজে পেল না যে, এই মহান ও বিশাল ফিক্‌হশাস্ত্র অবশ্যই রোমান ফিক্‌হশাস্ত্র দ্বারা সাহায্যপুষ্ট। অর্থাৎ এটি তাদের- পশ্চিমাদের কাছ থেকে নেয়া। আমাদের গবেষক আলেমগণ তাদের এ দাবির অসারতা প্রমাণ করে দিয়েছেন। লাহাইয়ে অনুষ্ঠিত তুলনামূলক আইন সম্মেলনে যেসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তার মধ্যে এটাও ছিল যে, ইসলামী ফিক্‌হ নিঃসন্দেহে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্র ফিক্‌হ বা আইন। এটা অন্য কোনো ফিক্‌হ বা আইন দ্বারা সাহায্যপুষ্ট নয়। এমন সিদ্ধান্তে প্রাচ্যবিদদের মধ্যে যারা মতলববাজ তাদের মুখ যেমন বন্ধ হয়ে গেছে, একইভাবে তা ন্যায়পরায়ণ সত্যের অনুসন্ধানী গবেষকদের আশ্বস্ত করেছে।[৩০]

২. বর্তমানে কি ইসলামী আইন অচল?

আধুনিক যুগে ইসলামী শরীয়ত বা আইন অচল। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলার যোগ্যতা নেই ইসলামী আইন ও ফিক্‌হশাস্ত্রের- কতিপয় প্রাচ্যবিদের এমন অপবাদ

---

[২৯] ড. ইবরাহীম আওয়াদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬-১০৮

[৩০] ড. মুস্তাফা আস সিবায়ী, *আল-ইস্তিশরাকু ওয়াল-মুস্তাশরিকুন : মা লাহুম ওয়ামা আলাইহিম,* বৈরুত : আল মাকতাবুল ইসলামী, পৃ. ২৯

বা দাবির বিষয়ে যারা উত্তর দিয়েছেন তাদের একজন হচ্ছেন ড. আবদুল হামীদ মুতাওয়াল্লী। তিনি তার 'আশ শরীআতুল ইসলামিয়া ওয়া মাউক্বিফু উলামাইল মুস্তাশরিক্বীন' (الشريعة الإسلامية وموقف علماء المستشرقين) (অর্থাৎ ইসলামী শরীয়াহ এবং প্রাচ্যবিদদের অবস্থান) শীর্ষক গবেষণাকর্মে প্রাচ্যবিদদের সেই অপবাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন দালিলিকভাবে। তাঁর মতে ইসলামী শরীয়াহ ও আইন একেবারেই বন্ধ্যাত্বমুক্ত, সকল যুগের উপযোগী ও সচল। তিনি জোর দিয়ে বলেন,

> أنها أبعد الشرائع عن الجمود وأكثرها مرونة وقابلية للملاءمة، وإن كان ثمة جمود أو نقص في المرونة فهو أمر يمكن أن يُوصف به بعض العلماء المسلمين، ويقول: "اتهام الشريعة بأخطاء فريق من رجالها، واتهام الدين بأخطاء فريق من رجاله، تلك سنّة عرفت منذ سنين عن علماء المستشرقين."
>
> দুনিয়ায় যত আইন রয়েছে তার মধ্যে ইসলামী শরীয়া আইনই সবচেয়ে বেশি গতিশীল সর্বাধিক উপযোগী এবং (সকল যুগে চলার) যোগ্য। (যুগ-যুগান্তরে) উপযোগিতার ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি বা অচলাবস্থা যদি থেকে থাকে তা কোনো মুসলিম আলিম কর্তৃক ব্যাখ্যার কারণে হলে হতে পারে।

তিনি বলেন,

> শরীয়া আইনের কিছু লোকের ভুলের কারণে পুরো শরীয়াহকেই দোষারোপ করা এবং ধর্মীয় কোনো দলের ভুল-ত্রুটির কারণে গোটা ধর্মকেই দোষারোপ করা প্রাচ্যবিদদের চিরাচরিত পন্থা। তাদের এ পন্থা বেশ কয়েক বছর ধরে পরিচিত।[৩১]

সুতরাং বর্তমান যুগে ইসলামী আইন কখনো অচল হতে পারে না। ড. আবদুল হামীদ আরো বলেন,

> كيف أن القرآن الكريم جاءت آيات الأحكام فيه عامة أو بصورة كلية دون العناية بالجزئيات
>
> তা কিভাবে হতে পারে যেখানে পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন আহকাম তথা বিধানসম্বলিত আয়াতসমূহ এসেছে সাধারণভাবে অথবা সামগ্রিক রূপে। সাধারণ বিধানগুলো বিস্তারিত ব্যাখ্যার দিকে যায়নি।[৩২]

অর্থাৎ মামলার মৌলিক ধারাটা উল্লেখ করা হয়েছে। যাতে করে যে কোনো যুগের সংশ্লিষ্ট মামলা সেই আলোকে সমাধান করা যায়। কারণ, যুগ পরিবর্তনশীল, যুগের মানুষ ও অবস্থা পরিবর্তনশীল। ওসব মৌলিক ধারাতে যে কোনো যুগ ও পরিস্থিতির মামলার বিচারের সুযোগ রয়েছে। আর বিচারের সেই গুরুকাজটা আঞ্জাম দিতে পারবেন কেবলমাত্র বিদগ্ধ মুসলিম আইনবিদগণ। অতএব কুরআনিক ধারায় কোনো পরিবর্তন আসবে না। যেসব আয়াতে সাধারণ বিধান ও নির্দেশনা রয়েছে তার মধ্যে কয়েকটা যেমন: আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন,

---

৩১. দ্রষ্টব্য: মদিনা সেন্টার ফর স্টাডিজ এন্ড রিসার্চ অব অরিয়েন্টালিজম,
http://www.madinacenter.com/post.php?DataID=57&RPID=57&LID=5|

৩২. প্রাগুক্ত

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾

আর আমি আপনাকে তো বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি।[৩৩]

﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾

তিনি দীনের মধ্যে তোমাদের জন্য কোনো কঠোরতা আরোপ করেন নি।[৩৪]

﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾

আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তাই চান এবং যা তোমাদের জন্য কঠিন ও কষ্টকর তা চান না।[৩৫]

ইসলামী আইনের ইতিহাসে আইনগত এই গতিময়তা ও ফ্ল্যাক্সিবিলিটির বাস্তবতা স্পষ্টত পরিলক্ষিত হয়েছে। নিঃসন্দেহে এখানে এমন কিছু স্থির ও স্থায়ী বিষয় রয়েছে, যা অটল ও অমোঘ। কোনো ফকীহ কিংবা মুসলমান সেসব স্থির অকাট্য বিষয়ের বাইরে যেতে পারবে না। তবে পরিবর্তনযোগ্য বিষয় প্রচুর রয়েছে।[৩৬] কারণ, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। সেই হিসেবে ইসলামী আইনও পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ। ইসলাম দাবি করে, জীবন-জগতের সব জিজ্ঞাসা ও সব সমস্যার সমাধান ইসলামে রয়েছে। পবিত্র কুরআন নিজেই ঘোষণা করেছে, সকল কিছুর বিবরণ তাতে রয়েছে। আর মহানবী মুহাম্মদ সা.-এর আদর্শ এমন সর্বব্যাপী কালজয়ী ও শাশ্বত যে, মহাপ্রলয় দিবসের পূর্ব পর্যন্ত কখনো এর আবেদন ফুরাবে না। বিশ্ব যতই আধুনিক থেকে অত্যাধুনিক যুগে প্রবেশ করছে ততই নতুন নতুন জিজ্ঞাসা ও আইনি সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে। বাহ্যত পবিত্র কুরআন ও মহানবী সা.-এর সুন্নাহে আধুনিক এসব বিষয়ের কোনো সুস্পষ্ট বক্তব্য না থাকলেও এমন অনেক তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য ও ইঙ্গিত রয়েছে যার দ্বারা বিশ্বমানব পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে চিন্তা-গবেষণা করে নতুন সৃষ্ট আইনি জিজ্ঞাসা ও সমস্যার সমাধান আবিষ্কার করতে উদ্দীপ্ত হয়। এ প্রক্রিয়ার নামই ইজতিহাদ।[৩৭] ইসলামের আবির্ভাব থেকে আজ পর্যন্ত চৌদ্দশ বছরেরও অধিককাল ধরে ইজতিহাদের কার্যকারিতা ইসলামকে কালজয়ী আদর্শ ও জীবনব্যবস্থা হিসেবে এবং ইসলামী আইন ও বিচারকে কালজয়ী আইন ও বিচারব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত রেখেছে এবং ভবিষ্যতেও রাখবে।

---

৩৩. আল-কুরআন, ২১ : ১০৭

৩৪. আল-কুরআন, ২২ : ৭৮

৩৫. আল-কুরআন, ২ : ১৮৫

৩৬. এক্ষেত্রে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন : http://www.madinacenter.com/post.php?DataID=57&RPID=57&LID=5

৩৭. ড. মুহাম্মদ আবদুর রশীদ, ইসলামে ইজতিহাদ : একটি পর্যালোচনা, *ইসলামী আইন ও বিচার*, বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, বর্ষঃ ৬, সংখ্যাঃ ২৩, জুলাই-সেপ্টেম্বরঃ ২০১০, পৃ. ৯

ইসলামী আইনের সময়োচিত ও বৈজ্ঞানিক এই বাস্তবতা আধুনিক যুগের অনেক প্রাচ্যবিদও স্বীকার করেন। যেমনটি বিশ্লেষকদের মধ্যে অনেকের আলোচনায় ফুটে ওঠেছে। গবেষক ও বিশ্লেষক জনাব ফয়যাল প্রাচ্যবিদ Norman Calder, Susan A. Spectorsky, Pascale Fournier এর ন্যায় প্রসিদ্ধ কয়েকজন প্রাচ্যবিদের ইসলামী শরীয়া ও আইনবিষয়ক গ্রন্থ পর্যালোচনা করতে গিয়ে এক পর্যায়ে বলেন :

> The principe is that if the text is *qat`i al-thubut* and *qat`i al-dalalah* there is hardly any scope for *ijtihad* as the law then is clear-cut and changing the law is not possible as such. But there are cases where the text is *qat`i al-thubut* while being *zanni al-dalalah* and this opens up a small space for *ijtihad.* A legal text can also be *zanni al-thubut* and *zanni al-dalalah* as in the case of ***khabar al-wahid*** or *zanni al-thubut* and *qat`t al-dalalah* as in cases of well established practices. All these different classifications are possible when intepreting a text and this explains the emeregence of the schools of law.
>
> (সংক্ষেপে) যেখানে قطعي الثبوت (অকাট্যভাবে প্রমাণসিদ্ধ) ও قطعي الدلالة (সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য) সম্বলিত শরীয়তের অকাট্য দলিল রয়েছে, সেখানে 'ইজতিহাদ' করার কোনো সুযোগ নেই। আর যেখানে শরীয়তের মূল বক্তব্যে ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে অর্থাৎ যেখানে قطعي الثبوت (অকাট্যভাবে প্রমাণসিদ্ধ) ও ظني الدلالة (অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থবোধক বক্তব্য) সম্বলিত দলিল রয়েছে সেখানে বিদগ্ধ ফিক্হবিদদের গবেষণা বা ইজতিহাদ করার সুযোগ রয়েছে। একটি আইনবিষয়ক দলিল ظني الثبوت (অকাট্যভাবে প্রমাণসিদ্ধ নয়) ও ظني الدلالة (অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থবোধক বক্তব্য) অথবা ظني الثبوت (অকাট্যভাবে প্রমাণসিদ্ধ নয়) ও قطعي الدلالة (সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য) ও হতে পারে। এরকম অনেক সুপ্রতিষ্ঠিত মামলার ক্ষেত্রে ঘটেছে। কোনো আইনী ধারাকে ব্যাখ্যা করার সময় এসব পার্থক্যকে বিবেচনায় আনা সম্ভব এবং এটা স্কুল্স অব ল তথা আইনের প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রয়োজনীয়তাকে পরিষ্কার করে।[৩৮]

৩. ইসলামী আইন ও ফিক্হশাস্ত্রে ধর্মের প্রভাব

'ইসলামী আইন ও শরীয়া দীনের বহিরাগত একটি বিষয়'- প্রাচ্যবিদ শাখ্তের এমন মন্তব্যটি এতই অযৌক্তিক যে, তাতে পবিত্র কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে শাখতের সীমাহীন অজ্ঞতাই ফুটে ওঠে। বিস্তারিত ব্যাখ্যায় না গিয়ে সংক্ষেপে আমরা বলতে

---

[৩৮] Faizal Manjoo, ibid, p. 8

পারি, ফিক্‌হ ও ইসলামী আইন কতই দীনভিত্তিক তা দীনের প্রধান উৎস পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত অসংখ্য আইনি বিধান থেকে সহজে অনুমেয়। বিদগ্ধ পাঠকমহলের সুবিধার্থে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ইসলামী আইন-কানুন সংক্রান্ত আয়াতসমূহের একটি চার্ট উল্লেখ করা হচ্ছে:

বিষয়	বিধানের সংখ্যা	বিষয়	বিধানের সংখ্যা
ইবাদাত (ধনীদের উপর আরোপিত যাকাতও রয়েছে)	৮৯	জিহাদ ও আন্তর্জাতিক আইন	৭৪
সামাজিক ব্যবস্থা (ব্যক্তি ও পারিবারিক বিধান)	১২১	পানাহার বিষয়ক বিধান	৪০
ক্রয়-বিক্রয়	১৩	বিভিন্ন ধরনের অপরাধ	৯
বিচার	১৬	সাক্ষ্য	৭
দৈহিক ও আর্থিক শাস্তি	২৪		

পবিত্র কুরআনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে রাসূলুল্লাহ সা এবং তাঁর সাহাবীদের জীবনেও ইসলামী আইন ও বিচারের অসংখ্য নজির রয়েছে। কথা ও কর্ম উভয় ক্ষেত্রে। রাসূলুল্লাহ সা.এর সীরাতে আমরা দেখি, তিনি বিভিন্ন এলাকার শাসকদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, তারা যেন আল্লাহর আইন অনুযায়ী মানুষের মাঝে বিচার করেন। 'আম্‌র ইবন হাযম রা.-এর বরাবরে লিখিত একপত্রে তিনি সা. তাঁকে সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর ভয় ও তাকওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকওয়াবান এবং সৎকর্মপরায়ণদের সাথে রয়েছেন। এ ছাড়া যা কিছু গ্রহণ করবে তা আল্লাহর নির্দেশনা মতে হকের সাথে গ্রহণ করতে তাকে নির্দেশ দিয়েছেন।[৩৯]

সাহাবীদের মধ্যে উমর রা.কে দেখা যায়, তিনি আবু 'উবায়দা ও মু'আয রা.কে পত্র লিখেছেন এমর্মে যে,

انظروا رجالا صالحين, فاستعملوهم على القضاء وارزقوهم

ভালো ও সৎলোক দেখে তাদেরকে বিচার কার্যে নিয়োগ দাও এবং তাদের রিয্‌ক তথা ভাতার ব্যবস্থাও করো।[৪০]

রাসূলুল্লাহ সা. নিজেও মানুষের মাঝে বিভিন্ন বিষয়ে বিচার-ফায়সালা করেছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴾

---

৩৯. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ, *মাজমূআতু আল-ওয়াসাইকিস সিয়াসিয়্যাহ লিল আহদিন নববী ওয়াল খিলাফাতির রাশিদাহ*, দলিল নং ১০৫, বৈরুত : দারুন নাফায়েস, ১৯৮৭ইং, পৃ. ২০৭

৪০. ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, বৈরুত : মুআস্‌সাতুর রিসালাহ, ১৯৮৫ইং, খ. ১, পৃ. ৪৫৫

> কোনো বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল রায় বা সিদ্ধান্ত দিলে সেক্ষেত্রে কোনো মু'মিন পুরুষ বা নারীর ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করবে সে স্পষ্ট পথভ্রষ্ট হবে।[৪১]

বিপুল সংখ্যক সাহাবীও রাসূলুল্লাহ সা.এর যুগের বিচারক হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হচেছন, আবু মূসা আল আশ'আরী রা., উবাই ইবন কা'ব রা., হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রা., দাহইয়া আল কালবী রা., যায়িদ ইবন সাবিত রা., 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ রা., 'আত্তাব ইবন উসাইদ রা., 'আলী ইবন আবী তালিব রা., 'উক্ববাহ ইবন আমির রা., 'উমার ইবনুল খাত্তাব রা., 'আমর ইবন হাযম রা., 'আমর ইবনুল 'আস রা., মু'আয ইবন জাবাল রা., মা'ক্বিল ইবন ইয়াসার রা. প্রমুখ।[৪২]

অতএব, ইসলামে পূর্ণাঙ্গ আইন ও বিচারব্যবস্থা যেমন রয়েছে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর সেই আইন প্রয়োগে নির্দেশনাও রয়েছে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে। রাসূলুল্লাহ সা. এবং সাহাবায়ে কিরাম রা. সেই দীনভিত্তিক আইনের সফল বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন কথা ও কাজে। প্রয়োজন মত ইসলামী আইন লিপিবদ্ধও করা হয়েছে। ফলে প্রথম শতাব্দীর মধ্যে বনী উমাইয়্যার আমলেই ফিক্‌হশাস্ত্রের মৌলিক গ্রন্থসমূহ প্রস্তুত হয়ে গেছে। তাই ফিক্‌হশাস্ত্রের ভিত্তি নিয়ে প্রাচ্যবিদ শাখ্‌ত এবং তার অনুসারীদের মন্তব্য সর্বৈব মিথ্যা। রাসূলুল্লাহ সা. ও সাহাবায়ে কিরাম তথা ইসলামের প্রথম শতাব্দীতে ফিক্‌হ বা ইসলামী আইনের অস্তিত্ব ছিল না- কথাটাও সম্পূর্ণ অসত্য।

আমাদের করণীয়

ইসলামী আইন ও ফিক্‌হশাস্ত্রে প্রাচ্যবিদদের এসব ষড়যন্ত্রমূলক রচনা ও উক্তি মূলত ইসলামের বিরুদ্ধে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধের শামিল। এ যুদ্ধে জয়ী হতে হলে জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবেই আগাতে হবে। হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালীর ভাষায়- বুদ্ধি ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে কাউকে হারাতে হলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ঐ ব্যক্তির চাইতে বেশি জানতে হবে; বরং সর্বোচ্চ জ্ঞানী হতে হবে। তখন তার বুদ্ধিবৃত্তিক ভুলগুলো চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে খণ্ডন করতে পারবেন আপনি। তাই ইসলাম সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের যেসব রচনা ও গবেষণাকর্ম রয়েছে সবগুলোকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। সেটাই হবে প্রথম ধাপ তাদের সঠিকভাবে সমালোচনা করার ক্ষেত্রে। অতঃপর তাদের লেখা ও রচনায় ইচ্ছা ও অনিচ্ছাকৃত ভুলগুলোকে প্রমাণ করে তা শুধরে দিতে হবে। এই বাস্তবতাকে অনেক প্রাচ্যবিদও স্বীকার করেছেন। যেমনটি করেছেন ফরাসি প্রাচ্যবিদ ম্যাকসিম রডিনসন (Maxim Rodinson)।[৪৩]

---

৪১. আল-কুরআন, ৩৩ : ৩৬

৪২. ড. মুস্তাফা আল আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০

৪৩. ড. মাহমুদ হামদী জকজুক, *আল-ইসলাম ওয়াল ইস্তিশরাক*, কায়রো : মাকতাবাতু ওয়াহবা, ১৯৮৪, পৃ. ২৭

মোটকথা, ইসলামী আইন ও ফিক্‌হশাস্ত্রসহ ইসলাম ও মুসলমানদের বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রাচ্যবিদদের রচনা ও গবেষণার ক্ষেত্রে আমাদের অত্যন্ত সতর্ক ও সজাগ হতে হবে। এক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীলতা একান্ত জরুরী। প্রাচ্যবিদদের লেখা ও গবেষণাকে চোখ বন্ধ করে গ্রহণ না করে; বরং ইসলামী জ্ঞানের প্রধান উৎস পবিত্র কুরআন ও হাদীস এবং অন্যান্য মৌলিক গ্রন্থসমূহের সাথে তা মিলিয়ে দেখতে হবে। ইদানীং ইসলামী আইন ও ফিক্‌হশাস্ত্রের প্রচুর মৌলিক বই বাংলা, ইংরেজিসহ বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের অনেক মুসলিম দেশ ইসলামী ফিক্‌হবিষয়ক বিশ্বকোষও প্রকাশ করেছে।[৪৪] ইসলামী বিষয়ে পশ্চিমা অমুসলিম লেখকদের তুলনায় মুসলিম স্কলার ও বিশেষজ্ঞ লেখকদের বই-পুস্তক ও গবেষণাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে মুসলিম গবেষকদের করণীয় সম্পর্কে প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ সায়্যিদ আবুল হাসান আলী রহ.-এর একটি উক্তি দিয়ে এই প্রবন্ধের ইতি টানতে চাই। তিনি বলেন,

> ولسد تأثير المستشرقين السلبي وإصلاح هذا الفساد يجب أن يقوم علماء الإسلام ورجال البحث والتفكير بالكتابة حول الموضوعات العلمية, ويقدموا للعالم الإسلامي المعلومات الإسلامية المؤكدة, ووجهة نظر الإسلام الصحيحة, مع مراعاة الجوانب المحمودة التي يمتاز بها المستشرقون بل والزيادة فيها, كما يجب أن تكون كتاباتهم ومؤلفاتهم ممتازة من حيث أصالة التحقيق وسعة الدراسة وعمق النظر, وتأكد المصادر وصحتها, واستدلالها القوي, بالنسبة لكتابات المستشرقين ومؤلفاتهم, وأن تكون حاملة لجميع نواحي الإتقان والصحة, بعيدة عن الأخطاء والنقائص العلمية.

> প্রাচ্যবিদদের নেতিবাচক প্রভাব রোধ করার জন্যে এবং এই অনিষ্টের সংশোধনের জন্যে ইসলামের আলিমসমাজ, গবেষক ও চিন্তাবিদদেরকে জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে অবশ্যই কলম ধরতে হবে। মুসলিম বিশ্বের সামনে নিশ্চিত ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সঠিক ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি তোলে ধরতে হবে। সাথে সাথে সেই প্রশংসিত দিকগুলোর প্রতিও যথাযথ যত্নবান থাকতে হবে, যা প্রাচ্যবিদদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য; বরং তাদের থেকে একটু বেশি থাকতে হবে এ ক্ষেত্রে। একইভাবে মৌলিক গবেষণা, বিস্তর অধ্যয়ন, গভীর দৃষ্টিভঙ্গি, নিশ্চিত ও সঠিক সোর্স এবং শক্তিশালী প্রমাণের দিক দিয়ে তাদের লেখা ও রচনাগুলো প্রাচ্যবিদদের লেখা ও রচনার তুলনায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে। এছাড়া তাদের লেখা ও গবেষণাসমূহ সব ধরনের বিশুদ্ধতা ও দক্ষতার স্বাক্ষর বহনকারী হতে হবে, হতে হবে নির্ভুল যার মধ্যে জ্ঞানগত কোন ত্রুটি থাকবে না।[৪৫]

---

৪৪. এক্ষেত্রে কুয়েতের ওয়াক্‌ফ ও ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত ৪৫ খণ্ডের *'আল মাউসূআতুল ফিকহিয়্যাহ'* অর্থাৎ, 'ফিক্‌হ বিশ্বকোষ' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য

৪৫. সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

উপসংহার

প্রাচ্যবিদদের ইসলামবিষয়ক রচনা ও গবেষণা মূলত একটি সুদূরপ্রসারী বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন। ইসলামের অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শরীয়া আইন ও ফিক্‌হশাস্ত্রে তাদের রচনা ও গবেষণাকর্মসমূহ আলোচ্য আন্দোলনে নতুনমাত্রা যোগ করেছে। এই আন্দোলনে দুয়েকজন প্রাচ্যবিদ নিরপেক্ষ থাকলেও বিপুল সংখ্যক প্রাচ্যবিদদের রচনা ও গবেষণা পক্ষপাতদুষ্ট ও ষড়যন্ত্রমূলক। বিশেষ করে কতিপয় প্রাচ্যবিদ যেমন ইগ্নায গোল্ডযিহার (Ignaz Goldizher), জোসেফ শাখ্‌ত (J. Schacht), নোয়েল জি. কোলসন (N. J. Coulson). শেল্ডন অ্যামস (Sheldon Amos) প্রমুখের মতামত ও মন্তব্য অত্যন্ত আপত্তিকর ও ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। ইসলামী আইন ও ফিক্‌হ ধর্মবহির্ভূত একটি বিষয়, এই আইনটি প্রকৃতপক্ষে রোমান আইন থেকে নেয়া এবং বর্তমান যুগে ইসলামী আইন অচল ইত্যাদি মতামতকে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ওসব বিদ্বিষ্ট প্রাচ্যবিদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে, মুসলমানদের অন্তরে বিদ্যমান ইসলাম ধর্ম ও ধর্মীয় আইনের প্রভাবকে ক্ষীণ করে তোলা, দীন সম্পর্কে আধুনিক প্রজন্মকে সংশয়যুক্ত করা, সর্বোপরি ইসলামী আইনকে অন্য দশটি মানবরচিত আইনের মত করে উপস্থাপন করে আইন ও বিচার বিভাগকে ধর্মহীন বা ধর্মনিরপেক্ষ বানানোর অপচেষ্টা করা। যার অশুভ ফলাফল আমরা ইতিমধ্যেই লক্ষ করেছি অনেক মুসলিম দেশে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ভাষায় রচিত প্রাচ্যবিদদের এমনতর আপত্তিকর মতামত সম্বলিত বই-পুস্তক ইউরোপ-আমেরিকাসহ মুসলিম বিশ্বের অনেক কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যভুক্ত অথবা রেফারেন্স বুক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে এর বিরূপ প্রভাব পড়ে।

ইসলামী আইন ও বিচারের প্রতি মুসলিম যুবসমাজের আস্থা ও বিশ্বাসে দুর্বলতা আছে। অথচ প্রাচ্যবিদদের এসব মতামত নিঃসন্দেহে পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বাস্তবতার নিরিখে সর্বৈব মিথ্যা ও কল্পনাপ্রসূত, যা বস্তুনিষ্ঠ গবেষণায় বারবার প্রমাণিত হয়েছে। এতে ইসলামী আইন ও ফিক্‌হশাস্ত্রের মৌলিক উৎস পবিত্র কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে তাদের সীমাহীন অজ্ঞতা যেমন প্রকাশিত হয়েছে, তাদের অশুভ পরিকল্পনাও স্পষ্ট হয়ে গেছে। তাই এ সম্পর্কে আমাদের সচেতনতা একান্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে মুসলিম স্কলার ও গবেষকদের সুপরিকল্পিতভাবে এগিয়ে আসতে হবে প্রাচ্যবিদদের বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনকে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে মোকাবেলা করার জন্য, ইসলামী আইনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে হবে সুচিন্তিত গবেষণার মাধ্যমে। ইসলামী আইন ও ফিক্‌হশাস্ত্র নিয়ে প্রাচ্যবিদদের অপবাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থার প্রতি নতুন প্রজন্মের হৃত আস্থা ও শ্রদ্ধা ফিরিয়ে আনতে হবে। এতে করে মানবরচিত বিচার ব্যবস্থার যাঁতাকল থেকে মুক্ত হয়ে মানবতা যেমন সুবিচার পাবে, সমাজ থেকে দূরীভূত হবে যাবতীয় যুলম, অন্যায় ও অবিচার।

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১০ সংখ্যা : ৩৮
এপ্রিল - জুন : ২০১৪

ইসলামে পণ্যের মূল্যনির্ধারণ : একটি পর্যালোচনা

মুহাম্মদ জুনাইদুল ইসলাম*

[সারসংক্ষেপ : 'পণ্যের মূল্যনির্ধারণ' অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। এ ক্ষেত্রে ইসলাম একটি বাস্তবসম্মত ও ভারসাম্যপূর্ণ নীতি অবলম্বন করেছে। সমাজতন্ত্রের মতো 'চাহিদা ও যোগানের স্বয়ংক্রিয় বিধি'টি অস্বীকার করে মূলনির্ধারণের পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব সরকারের হাতে ন্যস্ত করেনি। অন্যদিকে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মতো 'চাহিদা ও যোগানের স্বয়ংক্রিয় বিধি'কে অজুহাত করে উচ্চমূল্যে পণ্য বিক্রয়ের ক্ষমতা বিক্রেতার হাতে অনিয়ন্ত্রিতভাবে ছেড়ে দেয়নি। বরং মূল্য নির্ধারণের মাপকাঠি হিসেবে 'চাহিদা ও যোগানের স্বয়ংক্রিয় বিধি'টি ইসলাম মেনে নিয়েছে। তবে যোগান-চাহিদার স্বাভাবিক প্রতিযোগিতাকে বাধাগ্রস্তকারী সকল ব্যবসাপদ্ধতি যথা-একচেটিয়া ব্যবসা (Monopoly- Monopsony) ও মজুদদারী ইত্যাদি থেকে এ বিধিকে প্রভাবমুক্ত রাখার নির্দেশ প্রদান করেছে। অসাধু ব্যবসায়ীরা অপকৌশলে বাজারব্যবস্থার ওপর অবৈধ হস্তক্ষেপ করে মূল্যস্ফীতি ঘটালে এবং সরকার দ্রুত এর সমাধানে ব্যর্থ হলে- তখন গণস্বার্থ রক্ষার্থে মূল্যস্ফীতি রোধে সরকার সীমিত সময়ের জন্য মূল্য নির্ধারণ করে উদ্ভূত পরিস্থিতি সামাল দিতে পারবে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে মূল্য, মূল্যনীতি, মূল্যনির্ধারণ পরিচিতি, চাহিদা ও যোগানবিধি, যোগান ও চাহিদার স্বয়ংক্রিয় বিধি, মূল্যস্ফীতির কৃত্রিম কারণ, মূল্য নির্ধারণের পদ্ধতি ও শর্তাবলি ইত্যাদি বিষয়ের ওপর সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়াস চালানো হয়েছে।]

ভূমিকা

ইসলাম একটি বাস্তবসম্মত পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। এর সকল আইন-কানূন, বিধি-বিধান চির নতুন ও স্বমহিমায় উজ্জ্বল। নীতি-নৈতিকতা, মানবতা, বাস্তবতা, ন্যায়পরায়ণতা, আমানতদারি ও গণমানুষের কল্যাণ সাধন এর প্রধান ভূষণ। মানবজীবনের অন্যতম শাখা হলো অর্থনৈতিক কার্যক্রম। মানুষ অর্থনৈতিক কার্যক্রম সম্পাদনের তাগিদে উপার্জন করে, আবার উপার্জিত সম্পদ খরচ করে। সীমিত উপার্জন দিয়ে অসীম চাহিদা মেটাতে মানুষের কষ্টের অন্ত নেই। অধিকন্তু, সমাজের অসাধু ব্যবসায়ীরা বাজারব্যবস্থার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে দিন দিন মূল্যস্ফীতি ঘটিয়ে চলেছে। যুগে যুগে এ সমস্যার সৃষ্টিও হয়েছে, আবার প্রতিকারের চেষ্টাও হয়েছে। কখনো এ চেষ্টা সফল হয়েছে, আবার কখনো নিষ্ফল হয়েছে।

---

* প্রভাষক, আরবী বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা এ সমস্যার স্থায়ী সমাধান কল্পে সরকার কর্তৃক স্থায়ী মূল্যনির্ধারণ পদ্ধতি বেছে নিয়েছে। কিন্তু তা সুফল বয়ে আনতে অক্ষম হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে 'মূল্য' বিষয়ে বাস্তবসম্মত নীতি কী? সরকার কর্তৃক মূল্যনির্ধারণ ব্যবস্থা মূল্যস্ফীতি রোধে স্থায়ী সমাধান কিনা? মূল্যস্ফীতি রোধে ইসলামের দিক নির্দেশনা কী? বিশেষ অবস্থায় সীমিত সময়ের জন্য মূল্যনির্ধারণ বৈধ হবে কিনা? নিম্নে এ সব বিষয়ের উত্তর অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে।

মূল্য ও মূল্যনীতি

'মূল্য'-এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Price, Exchange Rate, Value, Worth, Quotation।[১] আরবী প্রতিশব্দ ثمن، قيمة، سعر ।[২] পরিভাষায় কোন দ্রব্যের বিক্রয়মূল্য অংকে প্রকাশিত হলে তাকে 'মূল্য' বলা হয়। অন্য ভাষায় বলা যায়, কোন দ্রব্যের স্বত্ব বা মালিকানা ত্যাগ করে তার বিনিময়ে যে পরিমাণ অর্থ পাওয়া যায়, তা-ই হল ঐ দ্রব্যের মূল্য।[৩]

শায়খ আবদুর রাউফ আল-মুনাভী রহ. (মৃ. ১৩৯০ হি.) বলেন,

وكل ما يحصل عوضا عن شيء فهو ثمنه

কোন কিছুর বিনিময় স্বরূপ যা অর্জিত হয় তাই মূল্য।[৪]

'কোন কিছু' শব্দটি বস্তু, দ্রব্য, শ্রম, ভাড়া ইত্যাদিকে অন্তর্ভুক্ত করে।

বিশিষ্ট ফিক্‌হবিদ ইবনু 'আবিদীন রহ. (মৃ. ১২৫২ হি.) বলেন,

إن الثمن ما تراضى عليه المتعاقدان سواء زاد على القيمة أو نقص

যে অর্থের বিনিময়ে ক্রেতা-বিক্রেতা ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদন করতে সম্মত হয়, তাই হল মূল্য। তা ভারসাম্য মূল্যের (Equilibrium Price) চেয়ে কমও হতে পারে, বেশিও হতে পারে।[৫]

উইকিপিডিয়ায় (উন্মুক্ত বিশ্বকোষ) বলা হয়েছে,

Price is the quantity of payment or compensation given by one party to another in return for goods or services.

---

১. Dr. Rohi Baalbaki, *AL-MAWRID* (A Modern Arabic-Eiglish Dictionary), Beirut : Dar El-iem Lilmalayin, 1995, p.42; Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic (Edited by J. Milton Crowan),* Beirut : Librairie du Liban, 1980, p. 415.

২. Dr. Munir Baalbaki, *AL-MAWRID* (A Modern Eiglish-Arabic Dictionary), Beirut : 1970, p. 722.

৩. মাহমুদুল হাসান, *ইসলামের আলোকে বাজার ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ*, চট্টগ্রাম : সেন্টার ফর রিসার্চ অন দা কুরআন এন্ড সুন্নাহ, ২০০৪ খ্রি., পৃ. ৯

৪. আবদুর রাউফ আল-মুনাভী, *আত্-তা'রীফ*, বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৪১০হি., পৃ. ২২৪

৫. ইবনু 'আবিদীন, *হাশিয়াতু রাদ্দিল মুখতার*, বৈরূত : দারুল ফিকর লিত্ তাবা'আ, ২০০০ খ্রি., খ. ৪ পৃ. ৫৭৫

সেবা বা পণ্যের বিনিময়ে এক পক্ষ কর্তৃক অপর পক্ষকে পরিশোধকৃত অর্থের পরিমাণকেই মূল্য বলা হয়।[৬]

ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে 'মূল্য' কেন্দ্রীয় চালক। এর ওপর ভিত্তি করে চাহিদা, যোগান, উৎপাদন, ভোগ, বণ্টন ইত্যাদি অন্যান্য চালকের মান নির্ণয় হয়।[৭] আর যে নিয়ম-নীতির ওপর ভিত্তি করে কোন পণ্য বা সেবার মূল্য নির্ণীত হয় তাই মূল্যনীতি।

মূল্যনির্ধারণ পরিচিতি

'মূল্যনির্ধারণ'-এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Pricing, Price fixing[৮] আরবী প্রতিশব্দ 'تسعير'। 'سعر' অর্থ মূল্য। বহুবচন 'أسعار'।

পরিভাষায় তাস'য়ীর হলো,

هو إلزام ولي الأمر - أو من يقوم مقامه - الناس بثمن معين لا يتبايعون إلا به فيمنعون من الزيادة عليه أو النقص عنه عند الضرورة في الطعام وغيره مما يحتاج الناس إليه بحيث يراعي حق الطرفين بالعدل للمصلحة العامة .

রাষ্ট্রপ্রধান বা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক প্রয়োজনবোধে সাধারণ জনগণের সুবিধার কথা চিন্তা করে খাদ্যপণ্য বা অন্য কোন দ্রব্যের ক্ষেত্রে একটি সহনীয় ও ভারসাম্যপূর্ণ মূল্য নির্ধারণ করা, যাতে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়। রাষ্ট্রের সকল নাগরিক উক্ত মূল্যে বেচাকেনা করতে বাধ্য থাকবে। কেউ বেশিতে বা কমে বিক্রি করতে চাইলে তাকে বারণ করা হবে।[৯]

ইমাম আশ-শাওকানী রহ. (মৃ. ১২৫০ হি.) বলেন,

التسعير هو أن يأمر السلطان أو نوابه أو كل من ولى من أمور المسلمين أمرا أهل السوق أن لا يبيعوا أمتعتهم الا بسعر كذا فيمنع من الزيادة عليه أو النقصان لمصلحة

তাস'য়ীর হলো, জনস্বার্থে সরকারপ্রধান বা বাণিজ্যবিষয়ক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক এই মর্মে প্রজ্ঞাপন জারি করা যে, প্রতিটি বিক্রয়পণ্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে বিক্রি করতে হবে, এর বেশিতে বা কমে বিক্রি করা যাবে না।[১০]

উপর্যুক্ত আলোচনার পর প্রশ্ন জাগে যে, ইসলামে কোন্ নীতির ভিত্তিতে মূল্য নির্ণীত হবে? সরকার কর্তৃক মূল্য নির্ধারণ বৈধ হবে কিনা? কিংবা তা জনগণের জন্য সুখকর হবে কিনা? যে সব ব্যবসা পদ্ধতি মূল্যনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে, সে সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশনা কী হবে? নিম্নে এ সব প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

---

৬. http://en.wikipedia.org/wiki/Price

৭. ড. মোঃ লিয়াকত আলী খান, *ব্যষ্টিক অর্থনীতি*, ঢাকা-চট্টগ্রাম : শাওন প্রকাশনী, ২০১২ খ্রি., পৃ. ১৯

৮. Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, ibid, p. 411.

৯. ড. মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আস-সালিহ, আত্-তাস'য়ীর ফী নজরিশ শরী'য়াতিল ইসলামিয়া, *মাজাল্লাতুল বুহুছিল ইসলামিয়া*, আর-রিয়াসাতুল 'আম্মা লি ইদারাতিল বুহুছ আল-ইলমিয়াহ ওয়াল ইফতাহ ওয়াদ-দাওয়াহ, সংখ্যা ৭৯,

১০. মুহাম্মাদ বিন 'আলী আশ-শাওকানী, *নায়লুল আওতার মিন আহাদীছি সায়্যিদুল আখইয়ার*, ইদারাতুত্ তাবা'আ আল-মুনিরিয়্যাহ, খ. ৫, পৃ. ২৭৬

মূল্যনীতি ও ইসলাম

ইসলাম মানবজীবনের অপরাপর শাখার ন্যায় অর্থব্যবস্থার ক্ষেত্রেও স্বভাবজাত চাহিদা ও বাস্তবতাকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। তাই ইসলাম ব্যক্তিমালিকানার স্বীকৃতি দিয়ে ব্যক্তিকে পুঁজি, শ্রম ও মেধা বিনিয়োগে উৎসাহিত করেছে- যাতে উৎপাদন ব্যাহত না হয়। আবার আইনগত বৈধতা ও অবৈধতার সাথে হালাল-হারামের বিধানকে সংশ্লিষ্ট করে দিয়ে সেই অধিকারকে সীমিত করে দিয়েছে- যাতে জনস্বার্থ উপেক্ষিত না হয়। এমনিভাবে মূল্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও ইসলামের বক্তব্য হলো, তা সম্পূর্ণরূপে ক্রেতা-বিক্রেতার ইচ্ছার ওপরই নির্ভর করবে। ক্রেতা-বিক্রেতা বা ভোক্তা-উৎপাদক যে নির্দিষ্ট মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদন করতে সম্মত হবে, সে মূল্যেই পণ্য বা সেবা বিক্রীত হবে। এক্ষেত্রে তারা উভয়ে পরিপূর্ণ স্বাধীন থাকবে। কখনো উক্ত মূল্য বেশিও হতে পারে, আবার কখনো কমও হতে পারে। মূল্য নির্ণয় ও মূল্য ওঠা-নামা সম্পূর্ণরূপে যোগানবিধি ও চাহিদাবিধির ওপরই নির্ভর করবে। যোগান বাড়লে মূল্য কমবে আর চাহিদা বাড়লে মূল্য বাড়বে বা অন্য কথায় চাহিদা কমলে মূল্য কমবে এবং যোগান কমলে মূল্য বাড়বে। এ ক্ষেত্রে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ Marshall বলেন, "both demand and supply are equally important in determining the price of good" -"পণ্যমূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে চাহিদা ও যোগান সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।"[১১] 'চাহিদা ও যোগানের স্বয়ংক্রিয় বিধান'কে ইসলাম স্বীকার করে নিয়েছে। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও পরিকল্পনার আওতায় অর্থব্যবস্থাকে ইসলাম সীমাবদ্ধ করতে চায়নি। কারণ, তাতে মেধা ও শ্রম পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হয় না। নিম্নে যোগানবিধি ও চাহিদাবিধির অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলো।

চাহিদা বিধি ও যোগান বিধি

অর্থনীতির পরিভাষায় কোন দ্রব্য লাভ করা কিংবা কোন বিষয়ে সেবা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে (তবে শর্ত হলো সামর্থ্য থাকা) চাহিদা বলে। চাহিদার সাথে মূল্যের একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে।[১২] সে সম্পর্কটি এই, স্বাভাবিক অবস্থায় কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন একটি দ্রব্যের মূল্য বাড়লে তার চাহিদা কমে, আবার মূল্য কমলে চাহিদা বাড়ে। দ্রব্যের মূল্যের উপর চাহিদার নির্ভরশীলতার এ সম্পর্ককেই চাহিদা বিধি বলা হয়। আর অর্থনীতির পরিভাষায় যোগান বলা হয়, কোন নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট মূল্যে কোন দ্রব্যের যে পরিমাণ বিক্রয়ের জন্য বিক্রেতা প্রস্তুত থাকে, সে পরিমাণকে উক্ত দ্রব্যের যোগান বলে।[১৩]

---

১১. H. L. AHUJA, *Advanced Economic Tyeory*, New Delhi : S. Chand & Company Lmd, 1992, p. 490.

১২. In economics, demand is the utility for a good or service of an economic agent, relative to a budget constraint. (http://en.wikipedia.org/wiki/Demand.)

১৩. Supply refers to the amount of a product that producers and firms are willing to sell at a given price all other factors being held constant. (http://en.wikipedia.org/wiki/Supply)

আর যোগান বিধি হলো দ্রব্যের মূল্যের সাথে দ্রব্যের যোগানের ঘনিষ্ঠতা। যে সব বিষয় মূল্য ও যোগানকে প্রভাবিত করতে পারে সেগুলো অপরিবর্তিত থাকলে দ্রব্যের যোগান তার মূল্যের অনুগামী হয়। অর্থাৎ মূল্য বাড়লে যোগান বাড়ে, মূল্য কমলে যোগান কমে। মূল্য ও যোগানের মধ্যকার এই সম্পর্ককেই যোগান বিধি বলা হয়। যেমন ধরা যাক, কোন দ্রব্যের উৎপাদন কিংবা আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি না পেয়ে মূল্য বাড়লে বিক্রেতার মুনাফা বেশি হয়; সুতরাং সে যোগান বাড়াতে চেষ্টা করে। আর মূল্য কমলে মুনাফা কম হয়; সুতরাং বিক্রেতা উক্ত দ্রব্যের যোগান কমিয়ে দেয়। অতএব, দ্রব্যের মূল্য যে দিকে পরিবর্তন হয় যোগান সে দিকেই পরিবর্তন হয়।[১৪] যোগান মূল্যের অনুগামী হয় আর চাহিদা মূল্যের বিপরীতগামী হয়। চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে দ্রব্যের ভারসাম্য মূল্য (Equilibrium Price) নির্ণীত হয় এবং বাজার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাজার ভারসাম্য (Market Equilibrium)

সাধারণ অর্থে ভারসাম্য বলতে একটি স্থিতাবস্থাকে বুঝায়। অর্থনীতিতে ভারসাম্য বলতে এমন একটি অবস্থা বা পরিবেশকে বুঝায়, যেখানে কার্যকর শক্তিসমূহ এমনভাবে মিলিত হয় যেন আর নড়াচড়া করার প্রবণতা থাকে না। বাজার ভারসাম্য বলতে বাজারে ভারসাম্য মূল্য ও পরিমাণকে বুঝায়। বাজারের দুটি প্রধান চালক চাহিদা (Demand) ও যোগানের (Supply) সমতা দ্বারা ভারসাম্যপূর্ণ মূল্য ও পরিমাণ নির্ধারণ হয়। এ অবস্থাকে বাজার ভারসাম্য বলে।

বাজারে মূলত দু'দল মানুষ থাকে। একদল ক্রেতা অপর দল বিক্রেতা। ক্রেতা এবং বিক্রেতা বাজারের দুটি কার্যকর শক্তিকে নির্দেশ করে। ক্রেতা পণ্যের চাহিদার দিক এবং বিক্রেতা পণ্যের যোগানের দিক নির্দেশ করে। ক্রেতা চায় সবচেয়ে কম মূল্যে পণ্যটি ক্রয় করতে। আবার বিক্রেতা চায় যথাসম্ভব বেশি মূল্যে পণ্যটি বিক্রি করতে। ফলে তাদের মধ্যে দর কষাকষি হয়। তবে পরিশেষে ক্রেতা মূল্য বাড়াতে বাড়াতে একটি স্তরে পৌঁছে থেমে যায়, যেখানে মূল্য প্রান্তিক উপযোগের সমান হয়- যাকে চাহিদা মূল্য বলা হয়। আবার বিক্রেতা মূল্য কমাতে কমাতে একটি স্তরে পৌঁছে থেমে যায়, যেখানে প্রান্তিক খরচের সমান হয়- যাকে যোগান মূল্য বলা হয়। চূড়ান্ত পর্যায়ে উভয়ে একটি স্তরে মিলিত হয়, যেখানে প্রান্তিক উপযোগ ও প্রান্তিক খরচ সমান হয়। ক্রেতা এবং বিক্রেতার এরূপ বিপরীতমুখী দর কষাকষির ফলে বাজারে ভারসাম্য মূল্য ও পরিমাণ নির্ধারিত হয় এবং উভয়ে ঐ মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন করতে রাজি হয়।[১৫]

---

১৪. আবুল ফাতাহ মুহাঃ ইয়াহইয়া, *ইসলামী অর্থনীতির আধুনিক রূপায়ন,* ঢাকা : আল-আমীন রিসার্চ একাডেমী বাংলাদেশ, ২০১১ খ্রি., পৃ.২০২-৪

১৫. ড. মোঃ লিয়াকত আলী খান, *ব্যষ্টিক অর্থনীতি,* ঢাকা-চট্টগ্রাম : শাওন প্রকাশনী, ২০১২ খ্রি., পৃ. ১১৩

স্বয়ংক্রিয়বিধি সমর্থনকারী দলীলসমূহ

ইসলাম পণ্যের চাহিদা ও যোগানের স্বয়ংক্রিয় বিধির আলোকেই মূল্য নির্ধারিত হওয়ার ব্যাপারে সম্মতি জ্ঞাপন করে। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মত সর্বাবস্থায় মূল্য নির্ধারণের পূর্ণ ক্ষমতা সরকারের হাতে ন্যস্ত করতে ইসলাম রাজি নয়। কারণ, এতে মেধা ও শ্রমের পূর্ণ বিকাশ ঘটে না। এ জন্য ইসলাম অর্থব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন বলে মনে করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا

আমি দুনিয়ার জীবনে তাদের জীবনোপকরণকে তাদের মাঝে বণ্টন করে দিয়েছি এবং কতিপয়ের ওপর কতিপয়ের প্রাধান্য দিয়েছি, যাতে করে একজন আরেক জনকে কাজে লাগাতে পারে।[১৬]

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা জীবনোপকরণ বণ্টনের বিষয়টি নিজ দায়িত্বে রেখেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি হয়ত কতিপয় প্রাকৃতিক নিয়মের আওতায় তা আঞ্জাম দিয়ে থাকেন। আমরা ধরে নিতে পারি, সেই প্রাকৃতিক শক্তি বা নিয়ম হলো চাহিদা ও যোগানের স্বয়ংক্রিয় বিধি। জাবির রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদীছেও এ বিষয়টির প্রতি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি বলেন, রাসূল সা. ইরশাদ করেন,

لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ – وَذَرُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ

গ্রাম থেকে আগত পণ্যের মালিকের পক্ষ হয়ে কোন শহুরে নাগরিক তা বিক্রি করে দিবে না। লোকদেরকে স্বাভাবিক অবস্থায় ছেড়ে দাও (তারা ক্রয়-বিক্রয় করুক)। আল্লাহ কতিপয়ের মাধ্যমে কতিপয়ের জীবনোপকরণের ব্যবস্থা করে থাকেন।[১৭]

অন্য একটি হাদীছে 'আলী রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট বলা হলো, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের জন্য দ্রব্যমূল্য নির্ধারিণ করে দিন। তিনি উত্তরে বললেন, إِنَّ غَلاَءَ السِّعْرِ وَرُخْصَهُ بِيَدِ اللهِ 'দ্রব্যমূল্য বাড়া-কমা আল্লাহর হাতে।'[১৮]

এই হাদীসেও দ্রব্যমূল্য বাড়া-কমার বিষয়টি আল্লাহর হাতে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি এমন একটি প্রাকৃতিক নিয়ম সৃষ্টি করেছেন, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে দরমূল্য

---

১৬. আল-কুরআন, ৪৩ : ৩২

১৭. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় :আল-বুয়ূ', অনুচ্ছেদ: ফিন্ নাহয়ি আই ইয়াবি'আ হাজিরুন লি বাদিন, বায়রূত : দারুল কিতাবিল 'আরবী, খ. ৩, পৃ. ২৬৩, হাদীছ নং- ৩৪৪৪; হাদীসটির সনদ সহীহ (صحيح); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যঈফ সুনানি আবি দাউদ*, হাদীস নং - ৩৪৪২

১৮. 'আলা উদ্দিন 'আলী বিন হুসাম, *কানযুল 'উম্মাল ফি সুনানিল আকওয়াল ওয়াল আফ'আল*, অধ্যায়: আল-বুয়ূ', অনুচ্ছেদ : আত্-তাস'য়ীর, বায়রূত : মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৪০১হি./ ১৯৮১ খ্রি., খ. ৪, পৃ. ১৮৩, হাদীছ নং-১০০৭৪; ইমাম আল-হায়ছামী বলেন, এই হাদীসটির সনদে আল-আসবাগ ইবনু নাবাতাহ নামক ব্যক্তি রয়েছেন; যাকে ইমাম আল-আজলী (العجلى) নির্ভরযোগ্য (ثقة) বললেও অন্যান্য ইমাম তাকে যঈফ (ضعيف) বলেছেন; কোন কোন ইমাম তাকে মাতরূক (متروك) বলেছেন। দেখুন, ইমাম আবূ বকর আল-হায়ছামী, *মাজমাউয যাওয়াইদ ওয়া মাম্বাউল ফাওয়াইদ*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ', পরিচ্ছেদ : আত-তাসঈর, বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৪১২ হি., খ. ৪, পৃ.১৭৯, হাদীস নং-৬৪৭০

নির্ধারণ করে। সে বিধিটি চাহিদা ও যোগানবিধি। এ বিধিকে স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে না দিলে তা অন্যায় হবে এবং এর পরিণতিতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অশুভ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে।

আনাস বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা.-এর যুগে মদীনায় এক সময় মূল্যস্ফীতি ঘটেছিল। সাহাবা কিরাম রা. দ্রব্যসমূহের ভারসাম্যপূর্ণ ও উপযুক্ত একটি মূল্য নির্ধারণের জন্য রাসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট আবেদন করলেন। রাসূলুল্লাহ সা. তাঁদের আবেদন প্রত্যাখান করলেন এবং বললেন,

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

প্রতিটি বস্তুর মূল্য আল্লাহ তাআলা নিজেই নির্ধারণ করেন, (যা বাজার প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক নিয়মেই নির্ধারিত হয়ে থাকে)। তিনিই মূল্য সংকোচনকারী ও সম্প্রসারণকারী, তিনিই রিয্কদাতা। আমি আমার রবের নিকট এমন অবস্থায় সাক্ষাত করতে চাই, যেন তোমাদের মধ্য কেউ জান-মালের ব্যাপারে আমার বিরুদ্ধে যুলমের অভিযোগ উত্থাপন করতে না পারে। না রক্তের বিষয়ে, না অর্থের বিষয়ে।[১৯]

আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা.-এর যুগে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলে এক ব্যক্তি এসে রাসূল সা.-এর কাছে মূল্য নির্ধারণের জন্য আবেদন করলেন। রাসূল সা. বললেন,

بَلْ أَدْعُو ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعِّرْ فَقَالَ بَلِ اللَّهُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عِنْدِي مَظْلَمَةٌ

না, তা পারব না। হ্যাঁ, আমি দু'আ করব (যেন মূল্য হ্রাস পায় এবং সবার ক্রয়ক্ষমতায় চলে আসে)। এরপর আরেক ব্যক্তি এসে অনুরূপ আবেদন করলেন। তখন তাকেও বললেন, 'না, তা আমার অধিকারে নেই। কারণ, আল্লাহ তা'আলা নিজেই দ্রব্যমূল্যের উত্থান-পতন ঘটান। আমি চাই আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করতে, যেন আমার বিরুদ্ধে কেউ যুলমের অভিযোগ করতে না পারে।[২০]

---

১৯. ইমাম আত্-তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ', অনুচ্ছেদ : আত্-তাস'য়ীর, বৈরূত : দারু ইহইয়ায়িত তুরাছিল 'আরবি, খ, ৩, পৃ. ৬০৩, হাদীছ নং ১৩১৪
এ হাদীসটি সামান্য শব্দগত পার্থক্যসহ একাধিক হাদীস গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। ইবনু হিব্বান রহ. হাদীসটি সহীহ বলেছেন। সুনানুন নাসায়ী ব্যতীত সিহাহ সিত্তার অন্য পাঁচটি গ্রন্থে হাদীছটি বিবৃত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী হাদীসটি উল্লেখপূর্বক হাদীসটি হাসান ও বিশুদ্ধ হিসেবে মন্তব্য করেছেন। বিশিষ্ট হাদীসবিশারদ আল-আলবানীও হাদীসটিকে সহীহ (صحيح) বলেছেন। (মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যঈফ সুনানিত তিরমিযী*, হাদীস নং-১৩১৪)

২০. ইমাম আবূ দাউদ, *আস্-সুনান*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ', অনুচ্ছেদ : আত্-তাস'য়ীর, বায়রূত : দারু কিতাবিল 'আরবি, খ. ৩, পৃ. ২৮৬, হাদীছ নং- ৩৪৫২। হাদীসটির সনদ সহীহ (صحيح) (মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যঈফ সুনানি আবি দাউদ*, হাদীস নং-৩৪৫০)

উল্লিখিত হাদীস দু'টি থেকে দু'টি বিষয় সুস্পষ্টভাবে জানা যায়। এক. সাহাবা কিরামের আবেদন সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সা. মূল্যনির্ধারণ করেননি। দুই. মূল্যনির্ধারণকে রাসূলুল্লাহ সা. যুল্‌ম হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ রা. 'উমার রা. সম্পর্কে বর্ণনা করেন, একদিন 'উমার রা. 'আলমুসাল্লা' নামক বাজারে হাতিব ইবনু আবী বালতা'আহ্ রা.-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন, তখন তাঁর সামনে দু'বস্তা কিসমিস ছিল। 'উমার রা. তাঁকে মূল্য জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন, প্রতি এক দিরহামে দু মুদ[২১]। 'উমার রা. তাঁকে বললেন, তা'য়িফের একটি কাফেলা এখানে কিসমিস বিক্রি করতে আসবে বলে আমি শুনতে পেয়েছি। তারা তোমার মূল্য অনুসারেই মূল্য দেবে (অথচ তারা তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে)। তাই তোমার উচিত হবে, হয়ত তুমি আরো বেশি মূল্যে বিক্রি করবে অথবা কিসমিসগুলো ঘরে ফেরত নিয়ে যাবে এবং যেভাবে তোমার ইচ্ছা বিক্রি করবে। এরপর যখন 'উমার রা. ঘরে আসলেন, তখন বিষয়টি নিয়ে ভাবলেন। অতঃপর হাতিব ইবনু আবী বালতা'আ রা.-এর ঘরে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমি যা তোমাকে বলেছিলাম, তা না আমার কড়া নির্দেশ ছিল, না সরকারি ফরমান ছিল। আমি তাতে শুধু শহরবাসীর জন্য কল্যাণই কামনা করেছি। অতঃপর বললেন, যেখানে ইচ্ছা এবং যেভাবে ইচ্ছা বিক্রি কর।[২২]

এ হাদীসে প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, 'উমার রা. মূল্য বাড়াতে আদেশ দেয়ার পর তা থেকে আবার ফিরে এসেছেন এবং হাতিব রা. কে বলেছেন, আমি যা বলেছিলাম তা নিছক আমার ব্যক্তিগত রায় ছিল; কোন সরকারি ফরমান ছিল না।

যোগান ও চাহিদাবিধি অস্বীকারে নেতিবাচক প্রভাব

মূল্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যোগান ও চাহিদা বিধি পরিহার করে যদি সরকার কর্তৃক মূল্যনিয়ন্ত্রণ (Price control by Government) পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়, তা হলে দু'টি পন্থার একটি গ্রহণ করতে হবে। হয়ত জনগণের সুবিধার কথা চিন্তা করে একটি সর্বোচ্চ মূল্য বেঁধে দেয়া হবে। এরূপ সর্বোচ্চ মূল্য বেঁধে দেয়াকে Price Ceiling বলা হয়। এ অবস্থায় বিক্রেতা বা উৎপাদকগণ নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে অধিক মূল্যে পণ্য বিক্রি করতে পারে না। এরূপ বেঁধে দেয়া মূল্য সাধারণত

---

২১. মুদ : মাপার পাত্র বিশেষ, যা বর্তমান প্রচলিত পরিমাপ অনুযায়ী প্রায় ৭৭৫ গ্রামের সমান। এটা ইরাকবাসী ইমামগণের অভিমত। হিজাযবাসীগণের মতে, এক মুদ প্রায় ৫১৫ গ্রামের সমান। -সম্পাদক

২২. ইমাম আল-বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ, অনুচ্ছেদ : আত্‌-তাস'য়ীর, হায়দারাবাদ : মজলিছু দায়িরাতুল মা'আরিফ আন্‌-নিযামিয়া, ১৩৪৪ হি., খ. ৬, পৃ. ২৯, হাদীছ নং- ১১৪৭৭
عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ مَرَّ بِحَاطِبٍ بِسُوقِ الْمُصَلَّى وَبَيْنَ يَدَيْهِ غِرَارَتَانِ فِيهِمَا زَبِيبٌ فَسَأَلَهُ عَنْ سِعْرِهِمَا فَسَعَّرَ لَهُ مُدَّيْنِ لِكُلِّ دِرْهَمٍ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدْ حُدِّثْتُ بِعِيرٍ مُقْبِلَةٍ مِنَ الطَّائِفِ تَحْمِلُ زَبِيبًا وَهُمْ يَعْتَبِرُونَ بِسِعْرِكَ فَإِمَّا أَنْ تَرْفَعَ فِي السِّعْرِ وَإِمَّا أَنْ تُدْخِلَ زَبِيبَكَ الْبَيْتَ فَتَبِيعَهُ كَيْفَ شِئْتَ. فَلَمَّا رَجَعَ عُمَرُ حَاسَبَ نَفْسَهُ ثُمَّ أَتَى حَاطِبًا فِي دَارِهِ فَقَالَ لَهُ : إِنَّ الَّذِي قُلْتُ لَيْسَ بِعَزْمَةٍ مِنِّي وَلاَ قَضَاءٍ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ أَرَدْتُ بِهِ الْخَيْرَ لأَهْلِ الْبَلَدِ فَحَيْثُ شِئْتَ فَبِعْ وَكَيْفَ شِئْتَ فَبِعْ

ভারসাম্য মূল্যের চেয়ে কম হয়। এমতাবস্থায় ক্রেতাসাধারণ যে পরিমাণ পণ্য ক্রয় করতে আগ্রহী, বিক্রেতাগণ সে পরিমাণ পণ্য বিক্রয় করতে রাজি হয় না। ফলে Black Marketing (কালোবাজারি) এর জন্ম হয়। তখন গোপনে বেশি মূল্যে এমনকি পূর্ব নির্ধারিত ভারসাম্য মূল্যের চেয়েও অধিক মূল্যে পণ্য বিক্রয় হয়।[২৩] (বাংলাদেশের বাজারে এ অবস্থার প্রতিফলন ঘটতে দেখা যায়।)

আবার কখনো বিক্রেতা বা উৎপাদনকারীর স্বার্থের কথা চিন্তা করে সরকার একটি সর্বনিম্ন মূল্য বেঁধে দিতে পারে- যার কমে ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে না। এরূপ সর্বনিম্ন মূল্য বেঁধে দেয়াকে Price Flooring বলা হয়।[২৪] এমতাবস্থায় ব্যবসায়ীগণ অধিক লাভবান হয়। ফলে যোগান বেড়ে যায়। যোগান বাড়ার ফলে মূল্য পূর্বের ভারসাম্য মূল্যের চেয়েও হ্রাস পায়। ফলে বিক্রেতা বা উৎপাদকগণ পূর্বের চেয়েও অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[২৫] সুতরাং প্রমাণিত হলো মূল্যনির্ধারণ সমাধানের উপায় নয়।

চাহিদা ও যোগানের প্রতিযোগিতা বিনষ্টকারী নিষিদ্ধ ব্যবসাসমূহ

যেহেতু ইসলামে মূল্যব্যবস্থা চাহিদা ও যোগানবিধির ওপর নির্ভরশীল, তাই চাহিদা ও যোগান- এর মধ্যে স্বাভাবিক প্রতিযোগিতার সুযোগ রাখা একান্ত শর্ত। কোনভাবেই 'চাহিদা' বা 'যোগান'-এর প্রতিযোগিতাকে প্রভাবিত করা যাবে না। যে সকল ব্যবসাপদ্ধতিতে এককভাবে বা সমষ্টিগতভাবে যোগান ও চাহিদা- উভয়টিকে কিংবা একটিকে প্রভাবিত করে ভারসাম্য বাজারের স্বাভাবিক প্রতিযোগিতা বিনষ্ট করা হয়, তা ইসলামে নিষিদ্ধ।

এ জাতীয় ব্যবসার মধ্যে Monopoly, Monopsony পদ্ধতি উল্লেখযোগ্য। Monopoly পদ্ধতি যোগানকে প্রভাবিত করে আর Monopsony পদ্ধতি চাহিদাকে প্রভাবিত করে। নিম্নে এ জাতীয় ব্যবসার পরিচয় এবং এ প্রসঙ্গে ইসলাম ও আধুনিক অর্থনীতির দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হলো।

একচেটিয়া ব্যবসা (Monopoly-Monopsony) (تلقي الجلب/احتكار)

সাধারণত যে সকল ব্যবসাপদ্ধতি যোগান-চাহিদার স্বাভাবিক প্রতিযোগিতা বিনষ্ট করে, তা-ই একচেটিয়া ব্যবসা। তবে যে পদ্ধতিতে যোগান-প্রতিযোগিতা বিনষ্ট হয় এবং একজনমাত্র বিক্রেতা পণ্যের সম্পূর্ণ যোগান নিয়ন্ত্রণ করে, তা Monopoly। পক্ষান্তরে যে পদ্ধতিতে চাহিদা-প্রতিযোগিতা বিনষ্ট হয় এবং একজনমাত্র ক্রেতা সম্পূর্ণ চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করে, তা

---

২৩. Price ceiling may encourage inefficient competition among consumers to acuire desired commodities: waiting, fighting, using political influence, and so forth. [Jack Hirshleifer, *Price Theory and Application,* New Delhi : Prentic-Hall sf India Private Lmd, 1993. p. 200]

২৪. ড. মোঃ লিয়াকত আলী খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৪-২৫

২৫. Price floor set above the market equilibrium price has several side-effects. Consumers find they must now pay a higher price for the same product. As a result, they reduce their purchases or drop out of the market entirely. [http://en.wikipedia.org/wiki/Price]

Monopsony। সাধারণত উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে Monopoly বাজার গড়ে উঠে এবং উপকরণ ক্রয়ের ক্ষেত্রে Monopsony বাজার গড়ে উঠে।

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ H. L. AHUJA মনোপলির সংজ্ঞায় বলেন,

> Monopoly is said to exist when one Firm is the sole producer or seller of a product which has no close substitutes.[২৬]
> যে বাজারে একজন মাত্র বিক্রেতা বা একটি মাত্র ফার্ম পণ্যের সমস্ত যোগান নিয়ন্ত্রণ করে এবং এর কোন নিকটতম বিকল্প না থাকে, তাকে মনোপলি বা একচেটিয়া বাজার বলা হয়।

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ RICHARD A. BILAS এর নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে বলেন,

> We may conclude that the monopoly price is generally higer and the output lower than in pure competation.[২৭]

প্রতিযোগিতামূলক বাজারের তুলনায় মনোপলিতে মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদন কমে যায়। একচেটিয়া কারবার তার বৈশিষ্ট্যগত কারণে পণ্যের যোগানের স্বাভাবিক প্রতিযোগিতাকে বিনষ্ট করে বিধায় মূল্যের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। ইচ্ছামত মূল্য বাড়াতে বা কমাতে পারে বলে একচেটিয়া ফার্মকে মূল্য সৃষ্টিকারী (Price Maker) বলা হয়।

আর রনজিত কুমার নাথ মনোপসনির সংজ্ঞায় বলেন,

> Monopsony refers to the case where there is single buyet of a particular input or resource.
> তা বাজারের এমন একটি পর্যায়কে বোঝায় যেখানে সুনির্দিষ্ট উপকরণ বা সম্পদের একক ক্রেতা থাকে।[২৮]

মনোপসনির নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে RICHARD A. BILAS বলেন,

> Monopsony is the result of lack of factor mobility, or the specialization of the factor to a particular user.[২৯]
> মনোপসনিতে উৎপাদনের উপকরণের অভাব দেখা দেয়, অথবা বিশেষ বা নির্দিষ্ট ব্যবহারকারী উপকরণ ব্যবহার করে।

রাসূলুল্লাহ সা.-এর সময়কালে বর্তমানকালের একচেটিয়া কারবারের পরিপূর্ণ ধরন বা অবকাঠামো না থাকলেও তখনও এ কারবারের মৌলিক অস্তিত্ব ছিল। পবিত্র হাদীসে রাসূলুল্লাহ সা. এ জাতীয় কারবরকে 'احتكار' নামে অভিহিত করেছেন এবং এ জাতীয় কারবার করতে নিষেধ করেছেন। কারণ, তা স্বাভাবিক প্রতিযোগিতায় প্রভাব

---

২৬. H. L. AHUJA, *Advanced Economic Tyeory*, New Delhi : S. Chand & Company Lmd, 1992, p. 539.
২৭. RICHARD A. BILAS. *Micro Economic theory,* Lisbon : McGRAW-HILL BOOK COMPANY, 1987, p. 224.
২৮. রনজিত কুমার নাথ, *অর্থনীতি ও বাণিজ্যিক ভূগোল*, ঢাকা : প্রবাহ প্রকাশনী, ২০০৩, পৃ. ১৯৮
২৯. RICHARD A. BILAS, *Micro Economic theory,* ibid, p. 293.

সৃষ্টি করে বাজার ব্যবস্থার 'চাহিদা ও যোগান' নামক স্বয়ংক্রিয়বিধিকে নষ্ট করে দেয়। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন,

مَنِ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامًا ضَرَبَهُ اللهُ بِالْجُذَامِ وَالْإِفْلَاسِ

যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন যাবৎ মুসলিম খাদ্যদ্রব্য মজুদ করে রাখবে, আল্লাহ তাকে কুষ্ঠরোগ ও দারিদ্র্য দ্বারা শাস্তি দিবেন।[৩০]

অপর হাদীসে রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন,

بِئْسَ العَبْدُ الْمُحْتَكِرُ إِنْ أَرْخَصَ اللهُ تَعَالَى الأَسْعَارَ حَزِنَ وَإِنْ أَغْلَاهَا اللهُ فَرِحَ

নিকৃষ্ট বান্দা হলো সে মজুদকারী, যে মূল্য কমলে ব্যথিত হয় আর মূল্য বাড়লে আনন্দিত হয়।[৩১]

ইমাম আল-আওযা'য়ী রহ. (মৃ.১৫৭ হি.) মজুদকারীর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন,

الْمُحْتَكِرُ مَنْ يَعْتَرِضُ السُّوقَ.

যিনি বাজার ব্যবস্থাকে বাধাগ্রস্ত করেন, তিনিই মুহতাকির বা মজুদকারী।[৩২]

এটা স্পষ্টত একচেটিয়া ব্যবসাকে অন্তর্ভুক্ত করে। কারণ, তাতে বাজারব্যবস্থাকে বাধাগ্রস্ত করা হয়। এমনিভাবে অপর আরেকটি হাদীসে এসেছে, মু'আয বিন জাবাল রা. রাসূলুল্লাহ সা.কে ইহতিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, রাসূল সা. উত্তর দেন,

اذا سمع برخص ساءه واذا سمع بغلاء فرح به

পণ্যের মূল্যহ্রাসের খবর যখন ব্যবসায়ীকে বেদনা দেয় এবং মূল্যবৃদ্ধির খবর আনন্দ দান করে, তাই ইহতিকার।[৩৩]

একচেটিয়া ব্যবসাতে এ-দুষ্ট চরিত্র পরিলক্ষিত হয়। চাহিদা ও যোগান-প্রতিযোগিতা বিনষ্টকারী ব্যবসাপদ্ধতিকে হাদীসের ভাষায় কখনো 'تَلَقِّى الْجَلَبِ'[৩৪], কখনো ' تلقي

---

৩০. ইমাম ইবনু মাজাহ, *আস্-সুনান*, অধ্যায় : আল্-হুকরা ওয়াল জালাব, বৈরূত : দারুল ফিকর, খ. ২, পৃ. ৭২৯; মাজমাউয যাওয়ায়িদ গ্রন্থকার এর সনদকে বিশুদ্ধ বলেছেন এবং এর বর্ণনাকারীদেরকে বিশ্বস্ত বলেছেন। তবে ইমাম আল-আলবানী হাদীসটির সনদকে যঈফ (ضعيف) বলেছেন; মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *যঈফুল জামি' আস-সগীর ওয়া যিয়াদাতুহু*, রিয়াদ : আল-মাকতাবুল ইসলামী, তা.বি., ১৪০৮ হি., হাদীস নং-৫৩৫১

৩১. 'আলাউদ্দিন ফাওরী, *কানযুল 'উম্মাল,* অধ্যায় : আল-ইহতিকার ওয়াত্ তাস'য়ীর, মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮১ খ্রি., খ. ৪, পৃ. ৯৭, হাদীছ নং-৯৭১৫; হাদীসটির সনদ যঈফ (ضعيف); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সিলসিলাতুল আহাদীছিয যঈফাহ ওয়াল মাওযূ'আহ ওয়া আছারুহাস সায়্যি ফিল* উম্মাহ, রিয়াদ : দারুল মা'আরিফ, ১৪১২হি./১৯৯২ খ্রি., খ. ১২, পৃ. ১৩০, হাদীস নং-৫৫৬৭

৩২. আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-ইজারাহ, পরিচ্ছেদ : আন্নাহয়ু 'আনিল হুকরাহ, খ. ৩, পৃ. ২৮৫, হাদীস নং- ৩৪৪৯

৩৩. ইমাম তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, মুসেল : মাকতাবাতুল 'উলূম, ১৯৮৩ খ্রি., খ. ২০, পৃ. ৯৫, হাদীস নং-১৮৬; হাদীসটির সনদ খুবই দুর্বল (ضعيف جدا); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সিলসিলাতুল আহাদীছিয যঈফাহ* ..., প্রাগুক্ত

৩৪. 'আলাউদ্দিন ফাওরী, *কানযুল 'উম্মাল*, অধ্যায় : বাবু তালাক্কি রুকবান, মুআস্সাসাতু রিসালা, খ. ৪, পৃ. ১৬৪, হাদীছ নং-৯৯৯৩ عن أبي هريرة "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب

'البيوع'[৩৫], কখনো 'تلقي الركبان' বলা হয়েছে। অর্থাৎ শহরে প্রবেশ করার পূর্বেই পণ্য আমদানীকারকদের থেকে পণ্য ক্রয় করে নেওয়া। আবার কখনো একে 'بيع الحاضر لباد' বলা হয়েছে। অর্থাৎ গ্রামীণ পণ্যের মালিকের পক্ষ হয়ে শহুরে কোন ব্যক্তি কর্তৃক পণ্য বিক্রি করে দেয়া।[৩৬] এ সব ব্যবসা করতে হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। নিষেধের কারণ হলো, এ জাতীয় ব্যবসা চাহিদা ও যোগানকে প্রভাবিত করে প্রকৃত প্রতিযোগিতা নষ্ট করে দেয়। অথচ বাজার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যোগান-চাহিদার প্রতিযোগিতা ছাড়া কোন বিকল্প নেই।

মূল্যনির্ধারণ ও ইসলাম

ফিক্‌হবিদগণের মতে, যদি ব্যবসায়ী মহলের হস্তক্ষেপ ব্যতীত প্রাকৃতিক অভাবের কারণে মূল্য বৃদ্ধি পায়, তাহলে সরকার মূল্য নির্ধারণের ক্ষমতা রাখবে না। বরং তখন যোগান বাড়ানোর চেষ্টা করবে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করবে। কারণ, প্রাকৃতিক বিপর্যয় হেতু কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ ফসল উৎপাদন না হওয়ায় উৎপাদক বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হয়। সে এ ক্ষতি লাঘবের জন্য মূল্য বেশি নিতে চেষ্টা করবে এবং তা চাহিদা ও যোগানের স্বাভাবিক নীতি। এমতাবস্থায় মূল্য নির্ধারণ করে চাহিদা ও যোগানের স্বাভাবিক নীতিকে বাধাগ্রস্ত করা যুক্তিসঙ্গত হবে না। তবে যদি ব্যবসায়ীমহল এমন কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়, যা বাজারের স্বাভাবিক বিধিকে অকেজো করে দেয় এবং বাজারদরের উপর গুটিকতেক ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ ও দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করে, তাহলে সরকার সাময়িকভাবে নির্দিষ্ট পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে সমস্যার সমাধান করতে পারবে। বরং তা শুধু সরকারের অধিকার নয়, কর্তব্যও বটে। যেহেতু ব্যবসায়ীমহল অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে বাজারের স্বাভাবিক বিধিকে প্রভাবিত করেছে, তাই অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে তাদের এ অপকর্মের প্রতিকার করা যুক্তিযুক্ত। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট ফকীহ আল-হাছকাফী (মৃ. ১০৮৮হি.) রহ. বলেন,

> ولا يسعر حاكم إلا إذا تعدى الأرباب عن القيمة تعديا فاحشا فيسعر بمشورة أهل الرأي
>
> কোন শাসক মূল্য নির্ধারণ করবেন না। তবে মালিকরা ভারসাম্য মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্য দাবি করলে, তবেই তিনি বিজ্ঞ লোকদের সাথে পরামর্শক্রমে মূল্য নির্ধারণ করবেন।[৩৭]

---

[৩৫] ইবনু মাজাহ, *আস্-সুনান*, অধ্যায় : বাবু আন্-নাহি আন তালাক্কি জালাব, বৈরূত : দারুল ফিকর, খ. ২, পৃ. ৭৩৫, হাদীস নং-২১৮০

عن عبد الله بن مسعود قال : - نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن تلقي البيوع

[৩৬] ইমাম বায্‌যার, *আল-মুসনাদ*, খ. ২, পৃ. ২২৬, হাদীস নং-৫৫০৩

عَن ابن عُمَر ، عَن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عَن تلقي الركبان وأن يبيع حاضر لباد

[৩৭] 'আলাউদ্দিন মুহাম্মাদ আল-হাছকাফী, *আদ্-দুররুল মুখতার*, বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৩৮৬ হি. খ. ৬, পৃ. ৪০০

ইমাম আবুল হাসান আল-মাওয়ার্দী (মৃ. ৪৫০হি.) বলেন,

وَلِأَنَّ الْإِمَامَ مَنْدُوبٌ إِلَى فِعْلِ الْمَصَالِحِ ، فَإِذَا رَأَى فِي التَّسْعِيرِ مَصْلَحَةً عِنْدَ تَزَايُدِ الْأَسْعَارِ ، جَازَ أَنْ يَفْعَلَهُ

রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব হলো সাধারণের কল্যাণ সুনিশ্চিত করা। মূল্যস্ফীতির সময় তাস'য়ীর (মূল্যনির্ধারন) উপকারী মনে হলে, তিনি তা করতে পারেন।[৩৮]

ইমাম ইবনুল কাইয়িম (মৃ.৭৫১হি.) বলেন,

وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على من يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل فهو جائز بل واجب

ন্যায়সঙ্গত তাস'য়ীর (মূল্যনির্ধারণ), যাতে ন্যায্য মূল্যে পণ্য বিক্রিতে বাধ্য করা হয় এবং ন্যায্য মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্যে বিক্রিতে নিষেধ করা হয় তা বৈধ; বরং কর্তব্য।[৩৯]

বিশেষ পরিস্থিতিতে মূল্যনির্ধারণ বৈধ হওয়ার প্রমাণসমূহ

এক. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

এবং তিনি (আল্লাহ) দীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোন সংকীর্ণতা রাখেননি।[৪০] আয়াতটি অবতরণের প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও স্পষ্টত তাস'য়ীরকে সমর্থন করে। কারণ, দীন ইসলামে এমন কোন সংকীর্ণতা বা অপরিপূর্ণতা নেই যে, একপক্ষ কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে অন্য পক্ষের ক্ষতি সাধন করবে আর এর প্রতিকারের কোন সুযোগ থাকবে না। মূল্যনির্ধারন মূল্যস্ফীতি প্রতিকারের অন্যতম পন্থা।

দুই. সালিম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন,

إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةً لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ ثُمَّ يُعْتَقُ

যদি কোন ক্রীতদাস দু'জন ব্যক্তির মালিকানাধীন হয়, এমতাবস্থায় তন্মধ্যে কোন একজন তার অংশ আযাদ করে দিলে, উক্ত ক্রীতদাসের কিছু অংশ স্বাধীন হয়ে যায় আবার কিছু অংশ অপর মালিকের মালিকানায় থেকে যায়। এ সংকট থেকে উত্তরণের জন্য আযাদকারী ব্যক্তি যদি ধনী হয়, তাহলে অবশিষ্ট অংশ ক্রয় করে আযাদ করে দিবে। যেহেতু উক্ত আযাদকারী ব্যক্তির ওপর বাকি অংশ ক্রয় করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে, তাই এমন একটি ভারসাম্যপূর্ণ মূল্য নির্ধারণ করা হবে, যা বাজারদরের চেয়ে কমও নয়, আবার বেশিও নয়। কারণ কম হলে অন্য অংশীদার ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর বেশি হলে ক্রয়কারী আযাদকারী ব্যক্তিটি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[৪১]

---

৩৮. আবুল হাসান আল-মাওয়ার্দী, *কিতাবুল হাভী আল-কাবীর,* বৈরূত : দারুল ফিকর, খ. ৫, পৃ. ৯০২

৩৯. ইবনুল কাইয়িম আল-জাওযিয়াহ, *আত্-তুরুকুল হুকমিয়্যাহ,* কায়রো : মাতবা'আতুল মাদানী, খ. ১, পৃ. ৩৫৫

৪০. আল্-কুরআন : ২২ : ৭৮

৪১. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান,* অধ্যায় : কিতাবুল 'ইতকি, পরিচ্ছেদ : ফী মান রুবিয়া আন্নাহু লা ইয়াসতা'আ, বৈরূত : দারু কিতাবিল 'আরবি, খ. ৪ পৃ, ৪২, হাদীস নং- ৩৯৪৯;

এ হাদীসে আযাদকারী ব্যক্তির জন্য যেহেতু উক্ত ক্রীতদাসটিকে ক্রয় করে আযাদ করে দেওয়া আবশ্যক হয়ে পড়েছে, তাই রাসূলুল্লাহ সা. একটি ভারসাম্যপূর্ণ মূল্য নির্ধারণ করতে নির্দেশ প্রদান করেছেন। অতএব, ক্রেতা সম্প্রদায়ের মুখাপেক্ষিতা রয়েছে এমন দ্রব্যেরও যদি অতিরিক্ত মূল্য হাঁকা হয়, তাহলে সরকার একটি ভারসাম্যপূর্ণ মূল্য নির্ধারণের বৈধ ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে।

তিন. আবূ বুরদাহ ইব্ন নিয়ার রা. ইবনু 'উমার রা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল সা. থেকে জিজ্ঞাসা করা হলো, উত্তম উপার্জন কী? তিনি উত্তর দিলেন,

عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

উত্তম উপার্জন হচ্ছে ব্যক্তির হাতের শ্রম এবং মাবরূর অর্থাৎ বিশুদ্ধ ও কল্যাণমূলক বেচাকেনার মাধ্যমে উপার্জিত আয়।[৪২]

ফিক্হবিদগণ 'বাই মাবরূর'-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তা হলো, যাতে ক্রেতা-বিক্রেতার পারস্পরিক সহযোগিতা ও কল্যাণ নিহিত থাকে। অর্থাৎ তাতে প্রতারণা, আত্মসাৎ, অধিক মুনাফাখোরী ও আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী না থাকে। অতএব, অধিক মুনাফাখোরী যেহেতু অনুমোদিত নয়, তাই এ ক্ষেত্রে তাস'য়ীর যুক্তিসঙ্গত।

চার. 'আলী রা. বর্ণনা করেন,

وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ –صلى الله عليه وسلم– عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ

রাসূল সা. বিপাকে পড়ে বাধ্য হয়ে বেচাকেনা (লেনদেন) করতে নিষেধ করেছেন।[৪৩]

(অর্থাৎ এ অবস্থা থেকে অবৈধ মুনাফা লুটা যাবে না।) শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহ. বাধ্যতামূলক সম্মতিকে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে অনুমোদন করেন নি। অথচ সংকট

হাদীসটির সনদ সহীহ (صحيح); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যঈফ সুনানি আবি দাউদ*, হাদীস নং-৩৯৪৭ 'وكس' শব্দের খিয়ানত ও প্রতারণা, 'شطط' শব্দের অর্থ অন্যায়-অবিচার ও বাস্তবতা বিবর্জিত। ইবরাহীম মুস্তফা ও অন্যান্য, *আল-মু'জামুল অসীত*, দারুল দা'ওয়াহ, খ. ১, পৃ. ৪৮৩ ও খ. ২, পৃ. ১০৫৪;

৪২. ইমাম বায়হাকী, *আস্-সুনানুল কুবরা,* অধ্যায় : ইবাহাতুত্ তিজারাহ, হায়দারাবাদ : মজলিছু দায়িরাতুল মা'আরিফ, খ. ৫, পৃ. ২৬৩
হাদীছটি ইমাম তাবারানী রহ. *'আল-মু'জামুল আওসাত'* ও *'আল-মু'জামুল কাবীর'*-এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন। সনদের সকল বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য। 'আল্লামা হায়ছামীও তাঁর "মাজমা'উয যাওয়ায়িদ" গ্রন্থে হাদীছটি উল্লেখ করেছেন। ইমাম আল-আলবানী হাদীসটির সনদকে সহীহ (صحيح) বলেছেন; মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব*, রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'আরিফ, হাদীস নং-১৬৯০

৪৩. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান,* অধ্যায় : আল-বুয়ূ', পরিচ্ছেদ : আত্-তাস'য়ীর, বৈরূত : দারুল কিতাবিল 'আরবী, খ. ৩, পৃ. ২৬৩, হাদীস নং- ৩৩৮৪; হাদীসটির সনদ যঈফ (ضعيف); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যঈফ সুনানি আবি দাউদ*, হাদীস নং-৩৩৮২

সৃষ্টি করে যখন ক্রেতাদের থেকে অধিক মূল্য হাতিয়ে নেয়া হয়, তখন উক্ত ব্যবসায় ক্রেতাদের মোটেও আত্মতৃপ্তি বা সন্তুষ্টি থাকেনা। তাই এমতাবস্থায় তাস'য়ীরকে বৈধ করা না হলে গণমানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

পাঁচ. ইসলামে নিজের বা অন্যের ক্ষতি করার সুযোগ নেই

আবূ সা'য়ীদ আল-খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন,

لا ضرر ولا ضرار من ضار ضره الله ومن شاق شق الله عليه

> ইসলাম কাউকে ক্ষতি চাপিয়ে দেয় না, আবার অপরকেও ক্ষতি করার অনুমতি দেয় না। যে কেউ অপরের ক্ষতি সাধন করবে আল্লাহ তার ক্ষতি সাধন করবেন আর যে কেউ অপরের জন্য সংকট সৃষ্টি করবে আল্লাহ তাকে সংকটে নিপতিত করবেন।[৪৪]

এ হাদীস থেকেও প্রতীয়মান হয় যে, ক্রেতাপক্ষকে ক্ষতি করার জন্য বিক্রেতাপক্ষকে অবাধ সুযোগ দেয়া যায় না। এমনিভাবে ক্রেতাপক্ষকেও সে ক্ষতি মেনে নেয়ার জন্য ইসলাম কখনো উৎসাহিত করতে পারে না। তাই এ ক্ষতি রোধে সরকারের তাস'য়ীরের অধিকার থাকাটা যৌক্তিক।

ছয়. গণস্বার্থ রক্ষা (مصلحة للعامة)

সরকার মূল্য নির্ধারণ করে না দিলে বিক্রেতাপক্ষ ইচ্ছেমত বিক্রি করে অধিক লাভবান হয়, তবে ক্রেতাদের বিশাল দলটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর মূল্য নির্ধারিত করে দিলে বিক্রেতারা অধিক লাভ থেকে বঞ্চিত হলেও ন্যায্য মূল্য পায়, অপরদিকে ক্রেতারাও ক্ষতি থেকে রক্ষা পায়।

সাত. মন্দের মাধ্যম রুদ্ধকরণ (سدا للذرائع)

ইসলামী শরী'য়তের একটি স্বীকৃত মূলনীতি হলো 'سد الذرائع'। অর্থাৎ মুবাহ (বৈধ) কাজ যদি হারামের দিকে ধাবিত করে, তাও হারাম হিসেবে পরিগণিত হয়। অতএব, বিক্রেতার অবাধ স্বাধীনতা যখন যুলমের কারণ হয়, তখন তা তাস'য়ীর দ্বারা রহিতযোগ্য হবে।

উল্লেখ থাকে যে, হাদীসবিশারদগণ তাস'য়ীরের বিরুদ্ধজ্ঞাপক হাদীছসমূহের এভাবে উত্তর প্রদান করেছেন যে, ঐ সময়ের মূল্যস্ফীতি মানবসৃষ্ট কোন কৃত্রিম সংকটের কারণে ছিল না। কারণ, তখনকার সাহাবা কিরাম রা. এত সচ্চরিত্রবান ছিলেন যে,

---

৪৪. ইমাম দারু কুত্বনী, *আস্-সুনান*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ', বৈরূত : দারুল মা'রিফা, ১৩৮৬হি./১৯৬৬খ্রী., খ. ৩, পৃ. ৪৭
ইমাম আহমাদ, ইবনু মাজাহ, তাবরানী প্রমূখ মুহাদ্দিছগণ হাদিসটি ইব্ন 'আব্বাস রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম বায়হাকী 'উবাদাহ ইবনুস সামিত রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম হাকিম হাদীসটিকে ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ (صحيح) বলেছেন; ইমাম আল-হাকিম, *আল-মুস্তাদ্রাক*, বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, তা.বি., হাদীস নং-২৩৪৫

তাঁদের সম্পর্কে এ রকম ধারণা করাও দুরূহ। বরং ঐ সময়ের মূল্যস্ফীতি প্রাকৃতিক কারণে দ্রব্যের অভাবহেতু সৃষ্টি হয়েছিল। আর এমতাবস্থায় যেহেতু মূল্যনির্ধারণ বৈধ নয়, তাই রাসূল সা. মূল্য নির্ধারণের আশ্রয় নেননি। দ্বিতীয়ত, হাদীসগুলোতে রাসূলুল্লাহ সা. মূল্যনির্ধারণ করেন নি, কেবল তা-ই বর্ণিত হয়েছে; মূল্যনির্ধারণ থেকে নিষেধ করেছেন- তাঁর এমন কোন বক্তব্য নেই।

মূল্যনির্ধারণের পদ্ধতি ও শর্তাবলি

যদি একান্তই মূল্যনির্ধারণ করতে হয়, তাহলে কিছু পদ্ধতি ও শর্তাবলি পূরণ করতে হবে। যেমন,

(১) নির্দিষ্ট দ্রব্যের প্রতি জনগণের ব্যাপক প্রয়োজন থাকতে হবে।

(২) মূল্য নির্ধারণের সময় বিক্রেতার স্বার্থের দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

(৩) মূল্য নির্ধারণের জন্য ভোক্তা, উৎপাদক, ব্যবসায়ী, অর্থনীতিবিদ ও বাজার সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে। তাঁরা পর্যাপ্ত যাচাইয়ের পর ভোক্তা-উৎপাদক-ব্যবসায়ীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের স্বার্থ সংরক্ষিত হয় এমন একটি মূল্য নির্ধারণ করবেন।

(৪) নির্ধারিত মূল্য একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কার্যকর রাখা হবে। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে তা রহিত করা হবে।

(৫) খাদ্যসহ সকল ধরনের পণ্যে প্রয়োজনবোধে তাস'য়ীর বৈধ হবে।

(৬) মূল্যবৃদ্ধি কৃত্রিম সংকটের কারণে হতে হবে। প্রাকৃতিক কারণে দ্রব্যের অভাবহেতু মূল্য বৃদ্ধি পেলে মূল্যনির্ধারণ করা যাবে না।

(৭) ব্যবসায়ীরা ভারসাম্য মূল্যের (قيمة المثل) চেয়ে বেশি মূল্য দাবি করলে তাস'য়ীরের আশ্রয় নেয়া হবে।

(৮) কেউ কম মূল্যে বিক্রি করলে তাকে তাস'য়ীর দ্বারা বেশি মূল্যে বিক্রিতে বাধ্য করা যাবে না। কারণ, তাতে জনগণ লাভবান হয় এবং যোগান ও চাহিদার স্বয়ংক্রিয় বিধি কার্যকর থাকে। অনেক সময় পণ্য নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে বিক্রেতাকে কম মূল্যেও বিক্রি করতে হয়।

উপসংহার

ইসলাম গণমানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার অগ্রগতি সাধনের লক্ষ্যে ব্যক্তি মালিকানা ও যোগান-চাহিদার স্বয়ংক্রিয় বিধিটি মেনে নিয়ে শ্রম ও মেধা বিকাশে উৎসাহিত করে। তবে ইসলাম সর্বদা ব্যক্তি স্বার্থের চেয়ে জনস্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। সুতরাং অবাধ স্বাধীনতার সুযোগে ব্যবসায়ীমহল যোগান-চাহিদার স্বাভাবিক বিধিকে অকেজো করে দিয়ে মূল্য বৃদ্ধি করে জনস্বার্থের ক্ষতি সাধন করলে ইসলাম সরকারকে এ ক্ষতি প্রতিকারের জন্য মূল্যনির্ধারণের ক্ষমতা অর্পণ করে।

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১০ সংখ্যা : ৩৮
এপ্রিল - জুন : ২০১৪

ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল : একটি পর্যালোচনা

ড. হাফিজ মুজতাবা রিজা আহমাদ *

[**সারসংক্ষেপ :** *ইসলাম দারিদ্র্যকে এমন এক সমস্যা বলে বিবেচনা করে, যা সমাধান করা অতীব জরুরী। ইসলাম এ কথাও ঘোষণা করে যে, এর সমাধান সম্ভব। এটি ভাগ্য উন্নয়নের পক্ষে সংগ্রাম, আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংগ্রাম নয়। যারা দারিদ্র্যকে পবিত্র মনে করে, একে স্বাগত জানায় এবং ধনাঢ্যতাকে এমন পাপ মনে করে, যার শাস্তি দেয়া হয়- এই ধরনের দর্শনকে ইসলাম অস্বীকার করে। এমনিভাবে ঐ শ্রেণীর লোকদের দর্শনকেও ইসলাম অস্বীকার করে, যারা দারিদ্র্যকে অবধারিত ভাগ্য মনে করে, যা থেকে পলায়ন করা সম্ভব নয়। সন্তুষ্টি এবং আত্মতুষ্টি ছাড়া এর আর কোন সমাধান নেই। ইসলাম সকল প্রকার চরমপন্থী দর্শনেরও বিরোধী, যা সরল পথ থেকে দূরে রয়েছে। ইসলাম দারিদ্র্য সমস্যার সমাধানে ইতিবাচক পদক্ষেপে এবং বাস্তবসম্মত উপায়ে অগ্রসর হয়। অধিকন্তু, ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদ আল্লাহর, এ সম্পদ যেন মানবতার কল্যাণে ব্যয় হয় তার জন্যই রাসূলুল্লাহ সা. অবিরাম সংগ্রাম ও সাধনা করেছিলেন। তিনি পৃথিবী থেকে যেমন মনের দারিদ্র্য দূর করতে এসেছিলেন, তেমনি এসেছিলেন ধনের দারিদ্র্য দূর করতে। ফলে ইসলাম প্রতিষ্ঠার পর মাত্র তের বছরে তিনি তাঁর জাতিকে এতটা সমৃদ্ধ করতে পেরেছিলেন যে, আরবে যাকাত নেয়ার মত কোন লোক ছিল না। আজও তাঁর আদর্শ গ্রহণ করলে পৃথিবী এমনি সুখী, সুন্দর ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারে। রাসূলুল্লাহ সা. এর আদর্শ গ্রহণের মধ্যেই রয়েছে বিশ্ব থেকে অভাব ও দারিদ্র্য দূর করার একমাত্র উপায়। এ কথা বিশ্ব মানবতা যত দ্রুত বুঝতে সক্ষম হবে, তত দ্রুত তাদের কল্যাণ সাধিত হবে। এ ছাড়া বিশ্ব থেকে দারিদ্র্য দূর করা কোনভাবেই সম্ভব নয়। সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণের নিমিত্ত ইসলামের কৌশলগুলোর ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনা আলোচ্য প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে।*]

দারিদ্র্য বিমোচনের চিন্তা-চেতনা

দারিদ্র্য বিমোচন বলতে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বুঝানো হয়। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর যাতে দারিদ্র্য লাঘব এবং টেকসই (Sustainable) উন্নয়ন হয় সে জন্য তাদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সাথে সাথে মাথাপিছু আয় এবং সঞ্চয়ও বৃদ্ধি পেতে হবে। যার ফলে তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সৃষ্টি এবং বিভিন্ন সামাজিক খাত- শিক্ষা,

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

পুষ্টি, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ইত্যাদি উন্নয়নের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নীত হয়।[১] ধর্মসমূহেও দারিদ্র্য বিমোচন এবং নিঃস্বদের কল্যাণের জন্য উদাত্ত আহ্বান রয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনে বিভিন্ন মানবীয় দর্শনের তুলনায় সেসবের অবদান ছিল অনবদ্য। আল-কুরআনুল কারীমে বিভিন্ন নবীর দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী হিসেবে 'যাকাত' ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইব্রাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূব আ. সম্পর্কে কুরআন ঘোষণা করেছে,

﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ﴾

> আমি তাঁদেরকে ইমাম বানিয়েছি। তাঁরা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করতেন। আমি তাঁদের প্রতি ওহী নাযিল করলাম সৎকর্ম করার, সালাত প্রতিষ্ঠা করার এবং যাকাত দান করার জন্য। তাঁরা আমার ইবাদতে ব্যাপৃত ছিল।[২]

তাওরাত ও ইনজীলের নতুন এবং পুরাতন নিয়মে দেখা যায়, বহুস্থানেই দুর্বল ও দরিদ্র লোকদের প্রতি সহৃদয়তা ও সহানুভূতিপূর্ণ আচরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নির্দেশ দেয়া হয়েছে বিধবা, ইয়াতীম, দুর্বল ও অক্ষম লোকদের অধিকার আদায়ের জন্য। আদি পুস্তকে বলা হয়েছে, 'যে দরিদ্রকে দান করে, সে পরমুখাপেক্ষী হয় না। আর যে তার চক্ষুদ্বয় আড়াল করে, তার উপর অশেষ অভিসম্পাত।'[৩] মথিতে বলা হয়েছে,

> যখন তুমি দান কর তখন তোমার দক্ষিণ হস্ত কি করছে তা বাম হস্তকে জানতে দিও না। এরূপে তোমার দান যেন গোপনে হয়, তাতে তোমার পিতা, যিনি গোপনে দেখেন, তিনি তোমাকে ফল দেবেন।[৪]

অন্যত্র বলা হয়েছে, 'সুনয়ন ব্যক্তি আশীর্বাদযুক্ত হবে, কারণ সে দীনহীন লোককে আপন খাদ্যের অংশ দেয়।'[৫] উপর্যুক্ত আলোচনায় দরিদ্র ও নিঃস্বদের প্রসঙ্গে প্রাচীন ধর্মগুলোর অবদানের কথাই পরিস্ফুট। এটাই ছিল আল-কুরআনের পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থসমূহের শিক্ষা।

---

১. আনু মাহমুদ, *বাংলাদেশে এনজিও : দারিদ্র্য বিমোচন ও উন্নয়ন*, ঢাকা : হাক্কানী পাবলিশার্স, ১৯৯৮, পৃ. ১৩৬

২. আল-কুরআন, ২১ : ৭৩

৩. হিতোপদেশ : ২৭; ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, *আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ২০০৪, পৃ. ৬৩

৪. মথিঃ (নাস্ত) ১-৪

৫. হিতোপদেশ, ২২ : ৯; নাজীর আহমদ জীবন, *ইসলাম ও দারিদ্র্য বিমোচন*, ঢাকা : পালক পাবলিশার্স, ২০০৮, পৃ. ৫৩

দারিদ্র্য বিমোচন

দারিদ্র্য একটি সামাজিক অভিশাপ এবং সাধারণ মানুষের জন্য দারিদ্র্য পাপের প্রথম পর্যায়। অনুন্নত দেশসমূহে দেখা যায়, জাতীয় চরিত্রের অবনতি, মিথ্যার বেসাতি, ক্রমবর্ধমান অপরাধ প্রবণতা-এসবের অন্যতম কারণ দারিদ্র্য।[৬] আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

শায়তান তোমাদেরকে অভাব-অনটনের ভীতি প্রদর্শন করে এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তোমাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের ওয়াদা করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও মহাবিজ্ঞ।[৭]

অন্যদিকে চরম দারিদ্র্যের ন্যায় চরম প্রাচুর্যও মানুষকে বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যেতে পারে। আল-কুরআনুল কারীমে 'তাকাছুর' বা প্রাচুর্যের লালসার পরিণতি সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা এবং অসংখ্য আয়াত নাযিল হয়েছে। এ কারণেই অধিকাংশ নবী-রাসূল এবং মহৎ ব্যক্তিবর্গ স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যের পথ বেছে নিয়ে বিশ্ব মুসলিমের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এখনও মুসলিম সমাজে ধনীর চেয়ে দরিদ্ররাই বেশি ধার্মিক।[৮] তবে দারিদ্র্য যে সাধারণ মানুষের ঈমানের জন্য মারাত্মক হুমকি স্বরূপ, এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন,

كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا

অভাব-দারিদ্র্য মানুষকে কুফরের দিকে নিয়ে যায়।[৯]

অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যত জ্ঞানীই হোক না কেন, তার যদি প্রয়োজনীয় সম্পদ ও জীবনোপকরণ না থাকে, তবে সে দারিদ্র্যের কষাঘাতে নিজের অলক্ষ্যেই নীতিভ্রষ্ট হয়ে উঠে। দারিদ্র্যপীড়ায় জর্জরিত জীবন থেকে রক্ষাকল্পে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের নির্দেশ দিয়েছেন এভাবে,

﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা আল্লাহর এই পৃথিবীতে তাঁর প্রদত্ত রিযকের অন্বেষণে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও।[১০]

---

৬. নুরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত, *দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭, ২য় সংস্করণ, পৃ. ৬৩

৭. আল-কুরআন, ২ : ২৬৮

৮. নুরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত, *দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

৯. ইমাম বায়হাকী, *শুআবুল ঈমান*, পরিচ্ছেদ : আল-হাছছু আলা তারকিল গিল্লি ওয়াল হাসাদ, হাদীস নং-৬৬১২; হাদীসটির সনদ যঈফ (ضعيف); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সিলসিলাতুল আহাদীছিছ যঈফাহ ওয়াল মাওযূআহ ওয়া আছারুহাহু ছায়্যি ফিল উম্মাহ*, রিয়াদ : দারুল মা'আরিফ, ১৪১২ হি., ১৯৯২ খ্রি., হাদীস নং-৪০৮০

১০. আল-কুরআন, ৬২ : ১০

ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল

অসীম দয়ালু ও মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ এই পৃথিবীকে বিপুল নিয়ামতরাজি দ্বারা পূর্ণ করেছেন। আল-কুরআনুল কারীমের পাতায় পাতায় তার ধারা বর্ণনা উপস্থাপিত হয়েছে। আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত করেছেন।[১১] প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব হলো- মানুষ কুরআন ও সুন্নাহ অনুসারে প্রাকৃতিক সম্পদরাজি ব্যবহারের মাধ্যমে সুশৃঙ্খল, সুখী ও সভ্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করবে। মানুষের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্বের মধ্যেই রয়েছে দারিদ্র্য বিমোচনের ইশারা। প্রতিটি মানুষের জন্যই প্রাকৃতিক সম্পদরাজির ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। আল্লাহর নবীগণও এ দায়িত্বে অংশগ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সা.-এর মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন যে, দুর্দশা ছাড়া ভিক্ষা করা নিষিদ্ধ। এটা ঘৃণার কাজ, পরনির্ভরশীলতা মানবতার শ্রেষ্ঠত্বের পরিপন্থী। রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন,

مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ

> যে ব্যক্তি সর্বদা লোকদের নিকট ভিক্ষা করে বেড়ায়, কিয়ামাতের দিন সে এমনভাবে হাযির হবে যে, তার মুখমণ্ডলে সামান্য গোশতও থাকবে না।[১২]

দারিদ্র্যের কারণে মানুষ অসংখ্য অপকর্মের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। দারিদ্র্যের কারণে মানুষ স্বীয় স্রষ্টার কুফরী করতেও দ্বিধাবোধ করে না। হাদীসে এ কথারই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সা. একই সাথে কুফরী ও দারিদ্র্য থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন।

ড. ইউসুফ আল-কারযাভী বলেন,

> ইসলাম ধনাঢ্যতাকে আল্লাহর নিয়ামত বলে মনে করে, যার কৃতজ্ঞতা আদায় করা উচিত। আর দারিদ্র্যকে মনে করে একটি সংঘাত, যা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা অত্যাবশ্যক।[১৩]

সুতরাং ইসলামে দারিদ্র্য কোন কল্যাণের বিষয় নয়।

কোন সমস্যার সমাধান বা কোন বিষয়ে উন্নতির ক্ষেত্রে ইসলাম শুরুতেই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারণ করে দেয়। অন্যদিকে দেখা যায়, আল্লাহর দাসত্ব পরিহার করে বিভিন্ন যুগে মানুষেরা কোন কোন সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে অজস্র সমস্যার উৎপত্তি ঘটিয়েছে। আবার কোন বিষয়ে উন্নতি করতে গিয়ে অজস্র উন্নতির পথকে

---

১১. আল-কুরআন, ২ : ৩০ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

১২. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আয-যাকাত, পরিচ্ছেদ : মান সাআলান-নাসা তাকাছ্ছুরান, বৈরূত : দারু ইবনি কাছীর, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি., হাদীস নং-১৪০৫

১৩. ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, *মুশকিলাতুল ফাকরি ওয়া কাইফা আলাজাহাল ইসলামু*, বৈরূত, ১৯৯৪, ১ম সংস্করণ, পৃ. ১৩

রুদ্ধ করেছে। কিন্তু ইসলাম মানুষের সার্বিক বা সুষম উন্নতির পথ দেখায়। তাই ইসলাম হলো দৃষ্টিভঙ্গি ও অবস্থান নির্ধারণের জীবনাদর্শ। বর্তমান সময়ে বাংলাদেশসহ দরিদ্র মুসলিম দেশসমূহে পাশ্চাত্য কৌশলে বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন পরিচালিত হচ্ছে এবং দারিদ্র্য বিমোচন করতে গিয়ে মুসলিম নেতৃবৃন্দ আগ্রাসন দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছেন। তারাও বস্তুবাদীদের মত বলছেন যে, দারিদ্র্য, অপরাধ, সন্ত্রাস নিবিড়ভাবে জড়িত। আরো বলা হচ্ছে, দারিদ্র্য বিমোচনে জিহাদ ঘোষণা করতে হবে। মূলত জিহাদ দারিদ্র্য বা সমৃদ্ধির বিরুদ্ধে নয়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে। সুতরাং ইসলামের সার্বিক বক্তব্যের আলোকে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রচারণা সময়ের দাবি।[১৪]

ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলগুলোর সংক্ষিপ্তসার

ইসলামের দারিদ্র্য দূরীকরণ কৌশল-পদ্ধতি মানবরচিত মতবাদগুলোর তুলনায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কৌশলগুলোর মধ্যে রয়েছে সুদের মূলোৎপাটন। কেননা সুদ অর্থনীতিকে ধ্বংস করে এবং মানুষে মানুষে বৈষম্য সৃষ্টি করে। মওজুদদারীও নিষিদ্ধ, কেননা এতে ধনী-গরীব সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দারিদ্র্য বিমোচনের অন্যতম কৌশল হলো সম্পদের সুষম আবর্তন নিশ্চিতকরণ। কেননা এতে ব্যত্যয় ঘটলে সম্পদ মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে আবদ্ধ হয়ে যায় এবং সংকট সৃষ্টি হয়। ইসলাম ভিক্ষাবৃত্তিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে কর্মে উৎসাহ প্রদান করে এবং কর্মক্ষেত্র তৈরি করে, যা দারিদ্র্য বিমোচনের যথার্থ হাতিয়ার।

ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান। মানুষ হিসেবে মালিক-শ্রমিকে কোন পার্থক্য ইসলাম স্বীকার করে না। শ্রমিক সমাজের উপযুক্ত মর্যাদা দানে ইসলাম কঠোর নির্দেশ প্রদান করেছে। ইসলাম একে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল হিসেবে গ্রহণ করেছে। সমাজে সকল মানুষ উপার্জনে সক্ষম নাও হতে পারে। শারীরিক অসুস্থতা অথবা বয়সের কারণে কেউ কেউ উপার্জনক্ষম নয়। এসমস্ত লোকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা গেলে সমাজ থেকে দরিদ্রতা অনেকাংশেই লাঘব হবে।

ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কোন ভূমিকে অনাবাদী রাখার শিক্ষা নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ স. পতিত ভূমি আবাদকরণকেও দারিদ্র্য বিমোচনের অন্যতম পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। প্রতিবেশীর অধিকার আদায় ও নিশ্চিতকরণে কুরআন ও হাদীসে অত্যন্ত জোরালো ভাষায় নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাই ইসলাম দারিদ্র্য বিমোচনে প্রতিবেশীর হক আদায় করার প্রতি প্রবল গুরুত্বারোপ করেছে। অসহায়, দরিদ্র জনগোষ্ঠী এবং প্রতিবেশীর প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া বিত্তবানদের অন্যতম কর্তব্য বলেও ইসলাম নির্দেশনা প্রদান করেছে।

---

১৪. মুহাম্মদ মুজাহিদ মূসা, 'ইসলামের দৃষ্টিতে দারিদ্র্য ও দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল', *দৈনিক সংগ্রাম*, ৪ ডিসেম্বর' ২০০৬

প্রতি বছর ঈদুল আযহায় এ দেশে অসংখ্য পশু কুরবানী করা হয়। এসব পশুর চামড়ার বিক্রীত টাকার মালিক কিন্তু দরিদ্র জনসাধারণ। বিক্রীত চামড়ার টাকা সরকারিভাবে একত্রিত করে এক এক বছর দারিদ্র্যের নিম্নসীমা অনুসারে এক এক এলাকাকে নির্বাচন করে যথার্থ পরিমাণ অর্থ প্রদানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে তোলা যায়। এ কারণে ইসলাম দারিদ্র্য বিমোচনের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে কুরবানীকে গ্রহণ করেছে। ইসলাম ওয়াকফ প্রদানকেও দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশল হিসেবে সাব্যস্ত করেছে। ওয়াকফ করা সাদাকায়ে জারিয়া, যার ফল অনন্তকাল মানুষ ভোগ করতে থাকেন। ফলে সমাজ সার্বিকভাবে দারিদ্র্য মুক্ত হতে পারে। 'কার্য হাসান' তথা বিনা লাভে অর্থ ঋণ প্রদানের মাধ্যমে সম্পদ ও ব্যবসায়িক কার্যাবলি ত্বরান্বিত হয়। মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও প্রীতি গড়ে উঠে, ফলে দরিদ্রতা লাঘব হয়। এজন্য ইসলাম 'কার্য হাসান' প্রচলনকেও দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল হিসেবে গ্রহণ করেছে।

মুসলিম সম্পদশালীদের সম্পদে পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা ও শুদ্ধতা আনয়নে যাকাত অন্যতম বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা সালাতের সাথে সাথে অনেক স্থানেই যাকাত আদায়ের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন। যাকাত ইসলামী অর্থনীতির মূল সোপান এবং ইসলামী রাষ্ট্রের রাজস্বের প্রধানতম উৎস। সরকারিভাবে যাকাত আদায় এবং সুনির্দিষ্ট ও যথার্থ পরিমাণ বণ্টনের মাধ্যমে দরিদ্রতা দূর হতে বাধ্য। ইসলাম এ ব্যবস্থাকে দারিদ্র্য বিমোচনের প্রধানতম কৌশল হিসেবে সাব্যস্ত করেছে। যাকাতের সাথে উশর তথা কৃষিপণ্যের হক আদায় করাও ইসলামের দৃষ্টিতে দারিদ্র্য বিমোচনের অন্যতম কৌশল।

এছাড়া খারাজ তথা ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের ভূমিকর, জিযয়াহ্ কর অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্র-এর অমুসলিম নাগরিকদের থেকে প্রয়োজন অনুসারে ধার্য ও আদায়কৃত নিরাপত্তা কর, যার মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করা হয়- ইত্যাদিও ইসলামের দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলগুলোর অন্যতম। নিম্নে ধারাবাহিকভাবে এ সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো :

১. সুদের মূলোৎপাটন

সুদী ব্যবস্থা অর্থনীতিকে ধ্বংস করে এবং মানুষে মানুষে বৈষম্য সৃষ্টি করে। কেননা সুদ হচ্ছে শোষণের শক্তিশালী হাতিয়ার। সুদের কারণেই সমাজের দরিদ্র শ্রেণী আরও দরিদ্র হয় এবং বণিক শ্রেণী আরও ধনবান হয়।[১৫] দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত মানুষ প্রয়োজনের সময়

---

[১৫] ড. হাসান জামান, *ইসলামী অর্থনীতি*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮১, ৩য় সংস্করণ, পৃ. ২৪

সাহায্যের কোন পথ খোলা না পেয়ে সুদে ঋণ গ্রহণে বাধ্য হয়।[১৬] সুদের নিন্দায় সর্বপ্রথম আয়াত অবতীর্ণ হয় মক্কী যুগে হাবশায় হিজরতকালীন সময়ে নাযিলকৃত সূরা রূমে। সেখানে বলা হয়েছে,

﴿وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾

মানুষের ধনে বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা যে সুদ দিয়ে থাক, আল্লাহর দৃষ্টিতে তা ধন-সম্পদের বৃদ্ধি ঘটায় না; কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে যাকাত তোমরা দিয়ে থাক (তাই বৃদ্ধি পায়); এরাই সমৃদ্ধশালী।[১৭]

অতঃপর সূরা আল-ইমরানের ১৩০ এবং সূরা আল-বাকারার ২৭৫-২৭৮ নং ধারাবাহিক আয়াতগুলোর মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে সুদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। যেমন কুরআনে ঘোষিত হয়েছে,

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

আল্লাহ্ ব্যবসাকে করেছেন হালাল এবং সুদকে করেছেন হারাম বা নিষিদ্ধ।[১৮]

সুদের ভয়াবহ ও জঘন্য কুফল থেকে মানবজাতিকে রক্ষার জন্য রাসূলুল্লাহ সা. আল্লাহর বিধান অনুযায়ী সুদকে নিষিদ্ধ করে বিনিয়োগ ও উৎপাদনকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেছিলেন।[১৯] সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার ফলে অর্থবণ্টন ব্যবস্থায় সুসামঞ্জস্য ও ভারসাম্যের সৃষ্টি হয়। মদীনায় সুদমুক্ত অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সুদজনিত মুদ্রাস্ফীতি, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, মন্দা ও অস্থিতিশীলতা থেকে অর্থব্যবস্থা রক্ষা পায় এবং বিনিয়োগ ও উৎপাদনে সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় থাকে। সুদের মাধ্যমে সৃষ্ট শোষণ ও বৈষম্যের অবসান ঘটে। বন্ধ হয়ে যায় দারিদ্র্য বৃদ্ধির পথ।[২০]

২. মওজুদদারী নিষিদ্ধকরণ

বর্তমানে বাংলাদেশসহ পুরো পৃথিবীতে বাজারসমূহে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ অসৎ ব্যবসায়ীদের ঘৃণ্য মওজুদদারী। উৎপাদন মওসূমে চাহিদামত সরবরাহ বন্ধ করে উৎপাদন মওসূম ও পরবর্তী সময়ে চড়া মূল্যে বিক্রয় করাই মওজুদদারী।

---

১৬. মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *সুদ, সমাজ, অর্থনীতি*, ঢাকা : ইসলামিক ইকনমিকস রিসার্চ ব্যুরো, ১৯৯২, পৃ. ১৯

১৭. আল-কুরআন, ৩০ : ৩৯

১৮. আল-কুরআন, ২ : ২৭৫

১৯. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *ইসলামের অর্থবণ্টন ব্যবস্থা*, ফরীদ উদ্দীন মাসউদ অনূদিত, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩, ৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ২৪

২০. ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, *আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮; নাজীর আহমদ জীবন, *ইসলাম ও দারিদ্র্য বিমোচন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

এতে ধনী-গরীব সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মওজুদদারী নিষিদ্ধ করে ইসলাম দারিদ্র্য বিমোচনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে। আল-কুরআনের ঘোষণা,

﴿الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا﴾

যারা নিজেরা কার্পণ্য করে এবং অন্য মানুষকেও কার্পণ্য করতে নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যা তাদেরকে দান করেছেন তা গোপন করে, আর আমি আখিরাতে কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।[২১]

রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন,

مَنْ احتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِئَ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرِئَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ

মূল্যবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যদি কেউ ৪০ দিন পর্যন্ত খাদ্যদ্রব্য মওজুদ রাখে, তবে সে আল্লাহ থেকে সম্পর্কচ্যুত হয়ে যায় এবং আল্লাহও তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।[২২]

৩. দানশীলতার চেতনাকে হিদায়াত প্রাপ্তির জন্য শর্তকরণ

দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদ্যোগ হলো দানশীলতার চেতনাকে হিদায়াত প্রাপ্তির জন্য শর্তকরণ। আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ - فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ - وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ - فَكُّ رَقَبَةٍ - أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ - يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ- أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾

বস্তুত আমি তাকে দু'টি পথ প্রদর্শন করেছি। অতঃপর সে ধর্মের ঘাঁটিতে প্রবেশ করেনি। আপনি জানেন, সে ঘাঁটি কী? তা হচ্ছে দাসমুক্তি অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে অন্নদান ইয়াতীম আত্মীয়কে অথবা ধূলি-ধূসরিত মিসকীনকে।[২৩]

অন্যত্র বলা হয়েছে,

﴿ فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى - وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى - فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى﴾

অতএব যে দান করে এবং আল্লাহভীরু হয় এবং উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে, আমি তাকে সুখের বিষয়ের জন্য সহজ পথ দান করব।[২৪]

আয়াতগুলোতে আল্লাহ এ কথাই বলেছেন যে, মায়া-দয়া বর্জিত লোকেরা হেদায়াত পায় না।

---

[২১] আল-কুরআন, ৪ : ৩৭

[২২] ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, অধ্যায় ; মুসনাদুল মুকছিরীনা মিনাস-সাহাবাহ, পরিচ্ছেদ : মুসনাদু আব্দিল্লাহ ইবনি উমারিবনিল খাত্তাব রা, বৈরূত : মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি., হাদীস নং-৪৮৮০

[২৩] আল-কুরআন, ৯০ : ১০-১৬

[২৪] আল-কুরআন, ৯২ : ৫-৭

রাসূলুল্লাহ সা. এর সময়ে তাঁর সাহাবীগণ রা. দানশীলতার চরম দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যকার দারিদ্র্য দূরীকরণে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছিলেন। জারীর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

> রাসূলুল্লাহ সা. একবার মুদার গোত্রের কিছু অভাবগ্রস্ত লোকের জন্য সাহায্যের কথা বললে সবাই তাদের জন্য ছুটে আসেন; কেউ খাদ্য, কেউ বা কাপড় নিয়ে আসেন। আর একজন আনসারী বেশ বড় মাপের অর্থ দান করেন।[২৫]

মূলত রাসূলুল্লাহ সা. দারিদ্র্য বিমোচনের অন্যতম মাধ্যম দানশীলতাকে প্রতিষ্ঠা করতে যথার্থই সক্ষম হয়েছিলেন।

৪. সম্পদের সুষম আবর্তন নিশ্চিতকরণ

রাসূলুল্লাহ সা.-এর অনুসৃত অর্থ ব্যবস্থার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো এক স্থানে বা গুটি কয়েক ব্যক্তির হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত না হয়ে সমাজের সকলের মধ্যে সুষম আবর্তন। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান ত্রুটি হলো সম্পদ আবর্তনের পথ রুদ্ধ হয়ে যাওয়া এবং স্বল্প লোকের মাঝে তা কেন্দ্রীভূত হওয়া। ফলে ধন-সম্পদ বণ্টন ও বিস্তারে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না।[২৬] ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখা অত্যন্ত নিন্দনীয়। আল-কুরআনুল কারীমে এ প্রসঙ্গে কঠোর শাস্তির সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে,

> ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ – يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴾
>
> যারা স্বর্ণ-রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে রাখে আর তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদের মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দিন; যে দিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং এর দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে। বলা হবে এই তো যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করতে। সুতরাং যা পুঞ্জীভূত করেছিলে তা আস্বাদন কর।[২৭]

রাসূলুল্লাহ সা. এ অবস্থার অবসান কল্পে সমাজের সর্বস্তরের লোকদের মাঝে সম্পদের সুষম আবর্তনের ব্যবস্থা করেন। এজন্য তিনি যাকাত, সাদাকাতুল ফিতর, উশর, মিরাসী আইন, দান, কার্য হাসান, হিবা ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, যার ফলে সম্পদ শুধু ধনীদের কাছে পুঞ্জীভূত না থেকে সমাজের দরিদ্র-জনগোষ্ঠীর কাছেও ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

---

২৫. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-ইলম, দিল্লী : আল-মাকতাবা রশীদিয়া, ১৩৭৬ হি., খ. ২, হাদীস নং ৪৮৩০

২৬. সাইয়েদ আবুল আলা, *ইসলাম ও আধুনিক অর্থনীতির মতবাদ*, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম অনূদিত, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৭৬, পৃ. ৮৩-৮৪

২৭. আল-কুরআন, ৯ : ৩৪-৩৫

৫. শ্রমিকের মর্যাদা ও উৎপাদনের মুনাফায় অংশপ্রদান

রাসূলুল্লাহ সা.-এর অর্থব্যবস্থায় শ্রমিক শ্রেণীর মর্যাদা ও উৎপাদনের মুনাফায় তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। সমাজের দরিদ্র জনগণই সাধারণত শ্রমিকের কাজ করে। ধনীদের দ্বারা তারা হয় শোষিত ও নির্যাতিত। শ্রমিক শ্রেণীকে দারিদ্র্যের কষাঘাত এবং শোষণ-নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষার জন্য রাসূলুল্লাহ সা. শ্রমিক-মালিক সবাইকে ভাই-ভাই বলে ঘোষণা করেছেন। শ্রমিকদের শোষণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তিনি ঘোষণা করেন,

اعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه

শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার মজুরী পরিশোধ কর।[২৮]

শ্রমিক শ্রেণীর দারিদ্র্য দূরীকরণ ও তাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সা. এর উপর্যুক্ত ঘোষণা একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। রাসূলুল্লাহ সা. কর্তৃক নবগঠিত মদীনা রাষ্ট্রে তাঁর বাণীসমূহের বাস্তব প্রয়োগ ঘটায় স্বল্প সময়ের মধ্যেই তথাকার শ্রমিক সমাজের আমূল পরিবর্তন ঘটে।

৬. ভিক্ষাবৃত্তি নিষিদ্ধকরণ ও কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি

ইসলামে দানশীলতার যে বিপুল নির্দেশনা দেয়া হয়েছে তা থেকে এরূপ ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টির অবকাশ নেই যে, ইসলাম ভিক্ষাবৃত্তি বা মানুষের দান সংগ্রহ করা পছন্দ করে। বরং কুরআন ও হাদীসে আল্লাহর নিয়ামতরাজি সংগ্রহের নির্দেশ আছে। তবে দুর্দশা মানবজীবন ও সমাজজীবনের অংশ। দারিদ্র্য ও বিত্ত উভয়টিই আল্লাহর আনুগত্য ও ধৈর্যের পরীক্ষা। তাই ইসলামের নির্দেশনা হলো- হাত পাতার আগেই স্বচ্ছল ব্যক্তিরা অভাবীদের অধিকার বুঝিয়ে দিবে।

রাসূলুল্লাহ সা. ভিক্ষাবৃত্তিকে ঘৃণা করতেন। কেননা দারিদ্র্যের বিকাশ ও প্রকাশের অন্যতম উপায় ভিক্ষাবৃত্তি। তাই তিনি এটা নিষিদ্ধ করেন। আত্মকর্মসংস্থান ও জীবিকা অর্জনের সুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে তোলার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামের যে আদর্শ, তা হতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, নিজের শক্তি ও সামর্থ্যকে বেকার নষ্ট করে অন্যের উপার্জনে ভাগ বসাতে যাওয়া ইসলামে আদৌ শোভা পায়না।

৭. কর্ম ও ব্যবসায় উৎসাহ প্রদান

দারিদ্র্য দূরীকরণের অন্যতম উপায় হলো কর্ম ও ব্যবসায় উৎসাহ প্রদান। রাসূলুল্লাহ সা. সর্বদা কাজে ব্যস্ত থাকতেন এবং সাহাবীগণকেও কাজে উৎসাহ দিতেন।[২৯] তিনি বলেন,

---

২৮. ইমাম ইব্‌ন মাজাহ, *আস্-সুনান*, অধ্যায় : আর-রুহূন, পরিচ্ছেদ : আজরুল উজারা, দেওবন্দ : আল-মাকতাবাতুর রহীমিয়া, ১৩৮৫ হি., হাদীস নং-২৪৪৩; হাদীসটির সনদ সহীহ (صحيح); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যঈফ সুনানি ইবনি মাজাহ*, হাদীস নং-২৪৪৩

২৯. Maulana Farid Uddin Masuod, *Workers Right in Islam*, Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh, 1987, p. 44

طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ

হালাল রুজি উপার্জন করা ফারযের পর ফারয[৩০] অর্থাৎ একটি বড় দায়িত্ব।

কোন উপার্জন সর্বোত্তম? -এমন প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেন,

عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِه وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

ব্যক্তির নিজ হাতের উপার্জন এবং প্রত্যেক সৎ ব্যবসা থেকে উপার্জন।[৩১]

অন্যত্র তিনি বলেন,

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ والصِّدِّيقِينَ والشُّهَدَاء

বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী ব্যবসায়ী আখিরাতে নবী, সিদ্দীক ও শহীদগণের সাথে থাকবেন।[৩২]

ব্যবসাকে হালাল এবং একে উৎসাহ দিয়ে কুরআন ঘোষণা করছে,

﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾

আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন।[৩৩]

রাসূলুল্লাহ সা. নিজে ব্যবসা করেছেন এবং এক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতার কথাও জানা যায়। একদা তিনি খাদীজা রা.-এর পণ্যসামগ্রী নিয়ে শামে যান এবং প্রায় দ্বিগুণ মুনাফা অর্জন করেন।[৩৪] তিনি আরো বলেন,

تِسْعَةُ أَعْشَارِ الرِّزْقِ فِي التِّجَارَةِ

রুজির দশভাগের নয় ভাগই রয়েছে ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে।[৩৫]

---

৩০. ইমাম আল-বায়হাকী, *আস্-সুনানুল কুবরা,* অধ্যায় : আল-ইজারাহ, পরিচ্ছেদ : কাসবুর রাজুলি ওয়া 'আমালাহু বি-ইয়াদিহি, বৈরূত : দারুল মা'আরিফ, ১৪০৬ হি., খ.৬, পৃ.১২৮, হাদীস নং : ১১৪৭৫; হাদীসটির সনদ যঈফ (ضعيف); মুহাম্মাদ আত-তাবরিযী, তাহকীক : মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *মিশাকাতুল মাসাবীহ,* বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি., হাদীস নং-২৭৮১

৩১. ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ,* বৈরূত : মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি., হাদীস নং-১৭২৬৫; হাদীসটির সনদ সহীহ (صحيح); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ,* রিয়াদ : মাকতাবাতুল মাআরিফ, হাদীস নং-৬০৭

৩২. ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান,* অধ্যায় : আল-বুয়ূ, পরিচ্ছেদ : আত-তুজ্জার ওয়া তাসমিয়াতুন নাবিয়্যি সা. ইয়্যাহুম, বৈরূত : দারু ইহ্ইয়াইত তুরাছিল আরাবিয়্যি, তা.বি., হাদীস নং-১২০৯; হাদীসটির সনদ যঈফ (ضعيف); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যঈফ সুনানিত তিরমিযী,* হাদীস নং-১২০৯, তবে তিনি অন্যত্র হাদীসটিকে সহীহ লি-গায়রিহী (صحيح لغيره) বলে মন্তব্য করেছেন; দ্র. *সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব,* রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'আরিফ, হাদীস নং-১৭৮২

৩৩. আল-কুরআন, ২ : ২৭৫

৩৪. মুহাম্মদ ইবন সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা,* বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৩২৬ হি., খ. ৩, পৃ. ৮৩

৩৫. আলাউদ্দীন আল-মুত্তাকী, *কানযুল উম্মাল,* অধ্যায় : আল-বুয়ূ, পরিচ্ছেদ : আনওয়াউল কাসব, বৈরূত : মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৯ খ্রি., হাদীস নং-৯৩৪২; হাদীসটির সনদ যঈফ (ضعيف); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সিলসিলাতুল আহাদীছিয যঈফাহ ওয়াল মাওযূ'আহ ওয়া আছারুহাছ ছায়ই ফিল উম্মাহ,* রিয়াদ : দারুল মাআরিফ, ১৪১২ হি./১৯৯২ খ্রি., হাদীস নং-৩৪০২

এমনিভাবে কুরআনুল কারীমের ঘোষণা এবং রাসূলুল্লাহ সা.-এর বাণীসমূহ কর্মে ও ব্যবসায় উৎসাহ দানের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

৮. পতিতভূমি আবাদের নির্দেশনা

আল্লাহ্ জমিনেই মানুষের প্রাচুর্য্যের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। আল্লাহর ঘোষণা,

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورِ﴾

তিনিই মহান সত্তা যিনি জমিনকে তোমাদের জন্য নরম ও সুগম করেছেন। অতএব, তোমরা তার কাঁধে বিচরণ কর (পরতে পরতে পৌছতে চেষ্টা কর) এবং তার দেয়া (সেখান থেকে পাওয়া) রিয্ক ভক্ষণ কর। (আর শেষ পর্যন্ত) তাঁরই কাছে তোমাদের উত্থান ঘটবে।[৩৬]

রাসূলুল্লাহ সা. পতিতভূমি আবাদকরণকেও দারিদ্র্য বিমোচনের অন্যতম পথ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন,

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ

যার (অতিরিক্ত) ভূমি রয়েছে, হয় সে তা নিজে চাষ করবে, অথবা তার কোন ভাইকে বিনামূল্যে চাষ করতে দিবে। যদি সে তা করতে অস্বীকার করে, তা হলে সে তার জমিটি অনাবাদী ফেলে রাখবে।[৩৭]

তিনি আরো বলেন,

مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ

'যে লোক অনাবাদী জমি আবাদ ও চাষযোগ্য করে নিবে সে তার মালিক হবে।'[৩৮]

এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ সা.-এর শিক্ষা ও বাণীর মাধ্যমে তদানীন্তন মদীনা রাষ্ট্র একটি মডেল রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে ওঠে এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে এসব পদক্ষেপ যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করে।

৯. বায়তুল মাল

'বায়তুলমাল' শব্দটি সাধারণত 'রাষ্ট্রীয় কোষাগার' অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বায়তুলমাল বলতে সরকারের অর্থ বিভাগীয় কর্মকাণ্ডকে বুঝায় না, পুঞ্জীভূত ধন-সম্পদকেই বলা হয় বায়তুল মাল।[৩৯] অন্যভাবে বলা যায়, রাসূলুল্লাহ সা. ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বাস্ত

---

[৩৬] আল-কুরআন, ৬৭ : ১৫

[৩৭] ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : আল-মুযারা'আহ, পরিচ্ছেদ : মা কানা আসহাবুন নাবিয়্যি সা. ইউওয়াছী বা'যুহুম বা'যান, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২২১৬

[৩৮] ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান,* অধ্যায় : আল-আহকাম, পরিচ্ছেদ : মা যুকিরা ফী ইহইয়াই আরযিল মাওয়াত, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৩৭৯; হাদীসটির সনদ সহীহ (صحيح); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যঈফ সুনানিত তিরমিযী,* হাদীস নং-১৩৭৯

[৩৯] মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামের অর্থনীতি,* ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৮৭, ৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ৫৩, পৃ. ২৮৯

বায়নের নিমিত্ত মদীনা রাষ্ট্রের জন্য সরকারি যে অর্থভাণ্ডার গড়ে তুলেছিলেন, তাই হলো বায়তুলমাল।[৪০] বায়তুলমালে ইসলামী রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের অধিকার স্বীকৃত। এ কথাই ঘোষিত হয়েছে রাসূলুল্লাহ সা.-এর এ বাণীতে,

مَا أُعْطِيكُمْ وَلَا أَمْنَعُكُمْ إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ

> আমি তোমাদেরকে দানও করি না, বঞ্চিতও করিনা। আমি তো বণ্টনকারী মাত্র। আমাকে যেরূপ আদেশ করা হয়েছে, আমি সেভাবেই জাতীয় সম্পদ বণ্টন করে থাকি।[৪১]

মূলত বায়তুলমাল সেসব নাগরিকের শেষ আশ্রয়স্থল, যারা নিজ নিজ চেষ্টা-সাধনা ও শ্রমব্যয়ের সর্বশেষ পর্যায়ে পৌঁছেও তাদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণে ব্যর্থ হয়েছে।[৪২] বায়তুলমালের অর্থ দিয়ে লা-ওয়ারিছ শিশু, মীরাছ বঞ্চিত সন্তান-সন্ততি, ইয়াতীম এবং বিধবাগণকেও সাহায্য করা হত। এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ সা. বায়তুলমালের অর্থের মাধ্যমে সমাজ থেকে দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বায়তুলমালের আয়ের প্রধান প্রধান উৎস ছিল- যাকাত, উশর, সাদাকাতুল ফিতর, আওকাফ, দান, মালে গনীমাহ, খুমুস, ফাই, মুক্তিপণ, কার্য, উপহার সামগ্রী, জিয্য়া, খারাজ ইত্যাদি।[৪৩]

১০. যাকাত

ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল বা ব্যবস্থার মধ্যে যাকাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা। যাকাত শব্দটি আরবী। বলা হয় زكا (যাকা) অর্থাৎ পবিত্র হল, পরিমাণে বৃদ্ধি পেল। (زكا فلان) যাকা ফুলানুন অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি পূত-পবিত্র হল। সুতরাং যাকাত অর্থ বরকত, পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়া, প্রবৃদ্ধি লাভ, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা, শুদ্ধতা[৪৪], সুসংবৃদ্ধতা[৪৫] ইত্যাদি। প্রাচ্যবিদ Milton Crown তার সুপরিচিত

---

৪০. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, 'মহানবী সা. এর অর্থপ্রদান', *অগ্রপথিক*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬, সীরাতুন্নবী সা. সংখ্যা, পৃ. ২৩০; শাহ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *ইসলামী অর্থনীতি : নির্বাচিত প্রবন্ধ*, রাজশাহী : স্কয়ার পাবলিকেশন্স, ১৯৯৬, পৃ. ৫১

৪১. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-খুমুস, পরিচ্ছেদ : কওলুল্লাহি তাআলা "ফা-আন্না লিল্লাহি খুমুসাহু ওয়ালির রসূলি", প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৯৪৯

৪২. সাইয়্যেদ হাসান মুসান্না নদভী, *ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩, পৃ. ৩০

৪৩. M.A Sabjawari, 'Economics and Fiscal System During the life of Muhammad (Sm.)' *The Journal of Islamic Banking and Finance*, 1984, Oct-Dec, p. 22

৪৪. আল্লাহর বাণী, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا "তাদের পবিত্র, পরিশুদ্ধ করার জন্য তাদের মালামাল থেকে সাদাকাহ/যাকাত গ্রহণ কর"। (আল-কুরআন, ৯ : ১০৩)

৪৫. ড. ইউসুফ আল কারযাভী, *ইসলামের যাকাত বিধান*, মুহাম্মদ আবদুর রহীম অনূদিত, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২, খ. ১, পৃ. ৪১; ফারিশতা জ. দ. যায়াস, *যাকাতের আইন ও দর্শন*, হুমায়ুন খান অনূদিত, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৪, পৃ. ১

আরবী-ইংরেজী অভিধান 'মু'জামুল লুগাতিল 'আরাবিয়াতিল মু'আসিরাহ'তে যাকাতের অর্থ হিসেবে- সমৃদ্ধি, বৃদ্ধি পাওয়া, অন্তরে পবিত্রতা লাভ করা, উপযুক্ত হওয়া, সততা, অপরাধশূন্যতা, পাপশূন্যতা, সত্যতা প্রতিপাদন, ন্যায়নিষ্ঠা ইত্যাদি উল্লেখ করেছেন।[৪৬] ইমাম রাগিব ইস্পাহানীর 'আল-মুফরাদাত' গ্রন্থেও যাকাতের উপর্যুক্ত অর্থগুলো সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে।[৪৭]

শারঈ পরিভাষায় জীবন যাত্রার অপরিহার্য প্রয়োজন পূরণের পর পূর্ণ এক বছরকাল সঞ্চিত সম্পদের শরীআত নির্ধারিত পরিমাণ অংশ, শরীআত নির্ধারিত খাতে কোন প্রকার বিনিময় ছাড়া মালিকানা হস্তান্তরকে যাকাত বলে।[৪৮] যাকাত ইসলামী অর্থনীতির মূল স্তম্ভ।[৪৯] ইসলামী রাষ্ট্রের রাজস্বের অন্যতম উৎস এবং এটি একটি জনকল্যাণমূলক বিধান।[৫০] যাকাত ব্যবস্থাকে আল্লাহ্ তাআলা সম্পদশালীদের সম্পদের পবিত্রতা এবং তাদের জন্য আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহের এক মহামাধ্যম হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। যাকাত দানের ফলে যাকাতদাতার অবশিষ্ট ধন-সম্পদ ও সেই সাথে তার আত্মার পরিশুদ্ধি ঘটে।[৫১] যাকাতের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং বিত্তবানদের সম্পদ পবিত্রকরণের ক্ষেত্রে ইসলামের দৃঢ় প্রতিফলন ঘটে। এর মাধ্যমে আল্লাহর রিয্কের প্রতি ব্যক্তির কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে এবং তার রহমতও কামনা করা হয়। ফলশ্রুতিতে সকলের কল্যাণ ও সম্পদ বৃদ্ধির কারণ ঘটে।[৫২]

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, যাকাত হচ্ছে ধনীদের ধন-সম্পদে আল্লাহর নির্ধারিত সেই অপরিহার্য অংশ যা সম্পদ ও আত্মার পবিত্রতা সাধন, সম্পদের ক্রমবৃদ্ধি এবং সর্বোপরি আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের আশায় শরীআত নির্ধারিত খাতে বন্টন করার জন্য প্রদান করা হয়।

---

৪৬. আবদুস শহীদ নাসিম, 'ইসলামের যাকাত দর্শন', ইসলামিক ইকনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ঢাকা, বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধ, ডিসেম্বর ১৪-১৫, ১৯৯৮, পৃ. ৩

৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

৪৮. অধ্যাপক মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ, 'যাকাতের শরয়ী গুরুত্ব ও অবদান', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ১৯৯৭, এপ্রিল-জুন, ৩৬ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ৬

৪৯. Zohirul Islam, *Islamic Economics*, Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh, 1997, p. 183

৫০. Salam Azzam, *Islam and Contemporary Society*, London : Islamic Council of Europe, 1982. p. 102

৫১. আবদুল খালেক, *অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যাকাত*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭, পৃ. ৩

৫২. ড. এম, উমর চাপরা, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ*, ড. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব ও অন্যান্য কর্তৃক অনূদিত, ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০০০,পৃ. ২৬৬

যাকাত ও এর সমার্থক শব্দ

আল-কুরআনুল কারীমে যাকাত শব্দটি অসংখ্যবার ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া এর সমার্থক আরো দু'টি শব্দও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। একটি হলো- 'সাদাকাহ', অপরটি- 'ইনফাক্ব'।[৫৩] আল-কুরআনুল কারীমে যাকাত শব্দটি বিভিন্ন গঠন প্রক্রিয়ায় ৫৮ বার ব্যবহৃত হয়েছে। এর মধ্যে অর্থনৈতিক যাকাত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ৩০ বার। আর ২৭ বার সালাতের সাথে যাকাতের উল্লেখ করা হয়েছে।[৫৪] এর মধ্যে নয় বার 'যাকাত প্রদান কর' বলে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। বাকী ২১ বার যাকাত প্রদান করা এবং যাকাত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা মু'মিনদের ও ইসলামী রাষ্ট্রের কাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আল-কুরআনুল কারীমে 'সাদাকাহ' শব্দটি ১৪ বার ব্যবহৃত হয়েছে। এর মধ্যে বেশ কয়েকবারই তা যাকাত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।[৫৫] হাদীসে যাকাত অর্থে সাদাকাহ শব্দটি অনেকবারই ব্যবহৃত হয়েছে। ইনফাক্ব শব্দটি বিভিন্ন গঠন প্রক্রিয়ায় কুরআনে ৭৩ বার ব্যবহৃত হয়েছে। এর মধ্যে অনেকবারই তা ব্যবহৃত হয়েছে যাকাত অর্থে।[৫৬] আল-কুরআনুল কারীম ও সুন্নাহ-র ভাষায় শরীআহ সম্মত 'যাকাত' 'সাদাকাহ' নামে অভিহিত। কাযী আবুল হাসান আল-মাওয়ার্দী রাহ. (মৃ. ৪৫০হি.) বলেন, সাদাকাহ যাকাত আর যাকাত সাদাকাহ। নামে পার্থক্য থাকলেও যে জিনিসের নামকরণ করা হয়েছে, তা এক ও অভিন্ন।[৫৭]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ﴾

তাদের ধন-সম্পদ থেকে সাদাকাহ গ্রহণ কর, যাতে তুমি তাদেরকে পবিত্র ও বরকতময় করতে পার এর মাধ্যমে।[৫৮]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ... ﴾
সাদাকাহ ফকীর ও মিসকীনদের জন্য...।[৫৯]

---

৫৩. আবদুস শহীদ নাসিম, 'ইসলামের যাকাত দর্শন', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

৫৪. আল-কুরআন, সূরা রূম : ৩৮-৩৯, নামল : ১-৩, লুকমান : ৪, বাকারা : ৮৩, ১১০, তাওবা : ৫, ১১, ১৮, ৭১, ১০৩, আরাফ : ১৫৬, মায়িদা : ১২, ৫৫-৫৬, হজ্জ : ৪০-৪১, আম্বিয়া :৭৩, মারিয়াম : ৩১, ৫৬

৫৫. আল-কুরআন, সূরা তাওবা : ৫৮-৬০, ১০৩

৫৬. আবদুস শহীদ নাসিম, *ইসলামের যাকাত দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪; আল-কুরআন, সূরা বাকারা: ২-৩, ২৬১, আনফাল : ৩-৪, তাওবা : ৩৪-৩৫, ৯৯; মোহাম্মদ আবদুল মুকিম, *বাংলাদেশের দারিদ্র্য দূরীকরণে যাকাতের ভূমিকা*, পিএইচ.ডি থিসিস, অপ্রকাশিত, ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০, পৃ. ৬০-৬১

৫৭. ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, *ইসলামের যাকাত বিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

৫৮. আল-কুরআন, ৯ : ১০৩

৫৯. আল-কুরআন, ৯ : ৬০

আবূ সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন,

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ.

খেজুরের মধ্যে পাঁচ ওয়াসকের[৬০] কমে যাকাত নেই, রৌপ্যের মধ্যে পাঁচ উকিয়ার[৬১] কমে যাকাত নেই। আর উটের মধ্যে পাঁচটির কমে যাকাত নেই।[৬২]

আলোচ্য দলীলসমূহ যাকাত সম্পর্কেই উদ্ধৃত হয়েছে। যদিও শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে সাদাকা, তবুও এর দ্বারা যাকাতকেই বুঝানো হয়েছে।

যাকাত বন্টনের খাতসমূহ

ইসলাম যেমন যাকাত সংগ্রহের উপর গুরুত্বারোপ করেছে, তেমনি বন্টনের উপরও গুরুত্বারোপ করেছে। তবে সংগ্রহের তুলনায় যাকাতের সম্পদ সঠিকভাবে ব্যয় ও বন্টনের উপর অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

এই সাদাকাহ[৬৩] মূলত ফকীর, মিসকীন এবং সাদাকাহ (যাকাত) সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত লোকদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তের জন্য, আল্লাহর পথে এবং মুসাফিরের জন্য- এটা আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।[৬৪]

---

৬০. পাঁচ ওয়াস্ক = ত্রিশ মণ, (সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী, *উশর*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯২, পৃ. ১৩) কারো মতে ২৬.৫ মণ, (ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন, 'দারিদ্র বিমোচনে যাকাত : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ', ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উচ্চতর গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রকল্প বাস্তবায়ন সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধ, ৩ জুন, ১৯৯৮, পৃ. ৩৯) আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী বলেন, পাঁচ ওয়াসক হিজাজী ওজনে ১৮ মণ ৩০ সের এবং ইরাকী ওজনে ২৮ মণ ৫ সের হয় (ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, *ইসলামের যাকাত বিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০)

৬১. উকিয়া এর বহুবচন আওয়াক। এক উকিয়া = ৪০ দিরহাম। সুতরাং ৫ উকিয়া = ২০০ দিরহাম। আর ১ দিরহাম = ২.৯৭ গ্রাম। সুতরাং ২০০ দিরহাম = ৫৯৪ গ্রাম। (ইউসুফ আল-কারযাভী. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮২, ২৯৩)

৬২. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আয-যাকাত, পরিচ্ছেদ : লাইসা ফীমা দূনা খামসি যাওদিন সদাকাহ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৩৯০

৬৩. পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সাদাকাহ অর্থ যাকাত, যাকাত মানে সাদাকাহ, এদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তবে কোন কোন ইমামের মতে, সাদাকাহ শব্দের অর্থ ব্যাপক, যা দ্বারা আল-কুরআনুল কারীমের সকল প্রকার দানকে বুঝানো হয়েছে। (Afzalur Rahman, *Economics Doctrines of Islam,* Lahor : Islamic Publications Ltd., Pakistan, 1971, Vol. III. p. 194)

৬৪. আল-কুরআন, ৯ : ৬০

আলোচ্য আয়াতে আট শ্রেণীর কথা বলা হয়েছে যারা যাকাতের হকদার। তারা হলেন-

ক. **ফকীর** : ফকীর সেই ব্যক্তি যার নিসাব পরিমাণ সম্পদ নেই। যে ব্যক্তির অভাব মিটানোর প্রয়োজনীয় সম্পদ নেই, সেই ফকীর। অন্যভাবে - যে সকল স্বল্প সামর্থ্যের দরিদ্র মুসলমান যথাসাধ্য চেষ্টা করা সত্ত্বেও বা দৈহিক অক্ষমতাহেতু দৈনন্দিন ন্যায়সঙ্গত প্রয়োজনটুকুও মেটাতে ব্যর্থ তারাই ফকীর।[৬৫] আরো বলা যায়, যাদের নিকট অভাব মোচনের উপযুক্ত সম্পদ থাকে না এবং যারা অতিকষ্টে অভাবের মধ্যে দিনাতিপাত করে কিন্তু কারো নিকট কোন কিছু ভিক্ষা করে না তারাই ফকীর।[৬৬] কারযাভী বলেন- ফকীর সেই মুখাপেক্ষীকে বলে যে মানুষের কাছে সাওয়াল করে না বা হাত পাতে না।[৬৭]

খ. **মিসকীন** : যার কিছুই নেই সেই মিসকীন। তাদের অবস্থা এমন খারাপ যে, অন্যের নিকট হাত পাততে বাধ্য হয় এবং তারা নিজের পেটের আহারও যোগাতে সক্ষম নয়। উমর রা. বলেন, 'যারা সক্ষম কিন্তু বেকার অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে তারাও মিসকীনদের মধ্যে গণ্য হবে।'[৬৮]

রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন,

لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلَكِنْ الْمِسْكِينُ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ وَلَا يُفْطَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ

সেই ব্যক্তি মিসকীন নয় যে ভিক্ষা করে দু'এক গ্রাস আহার কিংবা দু'একটি খেজুর পেলেই চলে যায়। বরং প্রকৃত মিসকীন সে, যে নিজের অভাব মোচনের সামর্থ্য রাখে না, অথচ নিজের দুরাবস্থা প্রকাশ করে লোকের নিকট ভিক্ষা করে বেড়ায় না।[৬৯]

---

৬৫. ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন, 'দারিদ্র বিমোচনে যাকাত : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

৬৬. আল-কুরআনুল কারীমে ফকীর সম্পর্কে বলা হয়েছে,

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

'যাকাত বা সাদাকার হকদার ঐ সমস্ত ফকীর- যারা দ্বীনের সেবায় আল্লাহর রাস্তায় আবদ্ধ থাকে এবং ভূপৃষ্ঠে চলাফেরা করে তাদের আহারের সংস্থান করতে পারে না। অনভিজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে ভিক্ষাবৃত্তি থেকে বেঁচে করার কারণে সম্পদশালী মনে করে। তুমি তাদেরকে বাহ্যিক অবস্থাদৃষ্টে চিনতে পারবে। তারা ভিক্ষা চেয়ে মানুষদেরকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে না। তোমরা যে অর্থ ব্যয় করবে, তা আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই পরিজ্ঞাত।' (আল-কুরআন, ২ : ২৭৩)

৬৭. ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, *ইসলামের যাকাত বিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০

৬৮. ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, *আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩

৬৯. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আয-যাকাত, পরিচ্ছেদ : কওলুল্লাহি তাআলা "লা ইয়াসআলূনান্ নাসা ইলহাফা" (০২ (সূরা বাকারা) : ২৭৩), প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৪০৯

ড, ইউসুফ আল-কারযাভী বলেন, 'মিসকীন সেই ব্যক্তি যে মানুষের কাছে গিয়ে কিছু চায় এবং হাত পাতে।'[৭০]

গ. **যাকাত আদায়ে নিযুক্ত কর্মচারী :** যাকাত আদায় ও বণ্টন কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ যাকাত তহবিল হতে তাদের বেতন পাবেন। এসব লোকজন নিজেরা ফকীর-মিসকীন না হলেও এমনকি বিপুল পরিমাণ সম্পদের মালিক হলেও তাদের বেতনাদি যাকাত ফান্ড থেকে দেয়া হবে।[৭১]

ঘ. **মন জয় করার জন্য :** যাকাত বণ্টনের ৪র্থ খাত হচ্ছে মুয়াল্লাফাতুল কুলুব বা মন জয় করার জন্য যাকাত দেয়া। দু'ধরনের লোক এ শ্রেণীভূক্ত। প্রথমত, যাদের অন্তর ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট তাদেরকে প্রকাশ্যে দলভূক্ত করে নেয়ার জন্য যাকাত প্রদান করা। দ্বিতীয়ত, নবদীক্ষিত মুসলিম, যাদের অন্তরে ইসলাম সুদৃঢ় হয়নি- এ পর্যায়ের লোকদেরকে যাকাত ফান্ড থেকে যাকাত প্রদান করা, যাতে তারা প্রকৃত মুসলমান হয়।[৭২] বর্তমানে এ খাতটির ব্যবহার হতে পারে- যারা ইসলামের বিপক্ষে কাজ করছে তাদের মোকাবিলার জন্য সর্বাত্মক কার্যক্রম গ্রহণ এবং যারা মুসলমান হয়েও প্রকৃত ইসলাম থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে, তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য সকল ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ।[৭৩]

ঙ. **দাসত্ব মুক্তির জন্য :** দাসত্ব থেকে মুক্তি বা বন্দীদশা থেকে মুক্ত করার জন্য যাকাত ব্যয় করা যাবে। এ অর্থ দিয়ে সে তার মনিবের দাসত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করবে। বর্তমানে যারা অর্থাভাবে জরিমানা আদায় করতে না পেরে কারাগারে বন্দী জীবন-যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন বা যারা অর্থাভাবে মামলা পরিচালনা করতে পারছেন না তাদেরকে যাকাতের অর্থ দেয়া যেতে পারে।[৭৪]

চ. **ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধ :** যারা ঋণী অথবা ঋণ পরিশোধ করার মত যাদের সম্বল নেই, এমন লোকজনও ঋণ পরিশোধের জন্য যাকাত গ্রহণ করতে পারবেন। তবে শর্ত হলো ঋণ পরিশোধ করার পর যাকাত ফরজ হওয়ার মত সম্পদ তার কাছে থাকলে তিনি যাকাত গ্রহণ করতে পারবেন না। কারযাভীর মতে, যদি ঋণ বিলম্বিত ও দীর্ঘ মেয়াদী হয় তবে যাকাত দেয়া যাবে না।[৭৫]

---

৭০. ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, *ইসলামের যাকাত বিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০
৭১. ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন, 'দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাত : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬
৭২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬
৭৩. ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, *ইসলামের যাকাত বিধান*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৯২-৯৩
৭৪. সাইয়েদ আবুল আলা, *যাকাতের হাকীকাত*, মুহাম্মদ আবদুর রহীম অনূদিত, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৪, পৃ. ৪৫
৭৫. ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, *ইসলামের যাকাত বিধান*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১১৪

ছ. আল্লাহর পথে : কুরআনুল কারীমে এ খাতের নাম 'ফী সাবিলিল্লাহ'। যার অর্থ আল্লাহর পথে। কারযাভী বলেন, সাবীলিল্লাহ অর্থ আক্বীদা-বিশ্বাস ও কাজের দিক দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয় যে পথ, তা।[৭৬] তাফসীরকারকগণ এখানে আল্লাহর পথ বলতে আল্লাহর পথে জিহাদ করার অর্থ নিয়েছেন।[৭৭] ব্যাখ্যায় বলা যায়, যেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠা পায়নি সেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা এবং যেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত আছে সেখানে একে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য যে সব বিশাল কাজের আঞ্জাম দিতে হয় সে জন্য যাকাতের অর্থ বণ্টন করা যাবে।[৭৮] ইসলাম প্রচার, প্রসার ও ইসলামকে শক্তিশালী করার কাজে অর্থ ব্যয় এ খাতের অন্তর্ভুক্ত।

জ. নিঃস্ব পথিক : পথিককে এখানে 'ইবনুস সাবীল' বলা হয়েছে। এ জন্য যে, পথিকের জন্য পথই হয় অবিচ্ছিন্ন সাথী।[৭৯] জমহুর আলিমগণের মতে 'ইবনুস সাবীল' বলতে সেই সকল মুসাফিরকে বুঝায়, যারা এক শহর থেকে অন্য শহরে, এক দেশ থেকে অন্য দেশে চলে যায়।[৮০] পথিককে যাকাত পেতে হলে যে স্থানে সে রয়েছে সে স্থানে তাকে অভাবগ্রস্ত হতে হবে স্বদেশে পৌঁছার সম্বলের জন্য।[৮১] এ যুগে নিঃস্ব পথিক সম্পর্কে কোন কোন আলিম বলেন যে, এখন আর নিঃস্ব পথিক পাওয়া যায় না। কারণ এ কালের যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই উন্নত, দ্রুত গতিবান। মনে হচ্ছে গোটা পৃথিবী একটি শহরে পরিণত হয়েছে। তাছাড়া উপায় উপকরণও বিপুল, সহজলভ্য, দুনিয়ার যে কোন স্থান থেকে মানুষ স্বীয় ধন-মাল নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।[৮২]

১১. উশর

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণ। মহান আল্লাহ যেহেতু এক এক জন মানুষকে এক এক ধরনের যোগ্যতা ও দক্ষতা দিয়েছেন, তাঁর নিদর্শনাবলি সম্পূর্ণভাবে পরিপালন করার পরও মানুষের কাছে বিভিন্ন পরিমাণ অর্থ সঞ্চিত থাকতে পারে এবং এ সঞ্চিত অর্থও যাতে সমাজে কোনরূপ ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি না করে তার জন্য আল্লাহ তাআলা যাকাত ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছেন। স্বর্ণ-

---

৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮

৭৭. ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন, 'দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাত : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

৭৮. সাইয়্যেদ আবুল আলা, *যাকাতের হাকীকাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

৭৯. আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনু জারীর, *তাফসীর তাবারী*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২, খ. ১৪, পৃ. ৩২০

৮০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২০

৮১. ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, *ইসলামের যাকাত বিধান*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৯২

৮২. শায়খ আহমদ আল-মুস্তফা আল-মারাসী, তাফসীরে আল-মারাসীর ২৮ নং পৃষ্ঠায় সূরা হাশরের ৬ষ্ঠ আয়াতের তাফসীরে এ মত ব্যক্ত করেছেন।

রৌপ্য, ব্যবসায়ী পণ্য সামগ্রী এবং গৃহপালিত পশু ইত্যাদির যাকাত দেয়া যেমন ফরজ, তেমনি ভূমির যাকাত 'উশর' দেয়াও ফরজ। ইসলামের ভূমি ব্যবস্থা অপূর্ব, অনন্য ও ন্যায়-নীতি নির্ভর। এ ভূমি ব্যবস্থারই এক গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো 'উশর'।

স্বর্ণ-রৌপ্য ও ব্যবসায়িক পণ্যের এক-চল্লিশাংশ যাকাত দিতে হয়। গবাদি পশুর জন্য রয়েছে ভিন্ন নিয়ম। অন্যদিকে ভূমি যাকাতের বিধান হিসেবে ইসলাম উপস্থাপন করেছে এক স্বতন্ত্র নীতিমালা। অবস্থাভেদে উৎপাদিত ফসলের এক-দশমাংশ দেয়া ফরজ হয়, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে উৎপাদিত ফসলের অর্ধ উশর অর্থাৎ ১/২০ ভাগ উৎপন্ন ফসলের যাকাত তথা উশর আদায় করা ফরজ হয়। কিন্তু ফিকহি পরিভাষায় সহজভাবে বলার জন্য 'উশর' শব্দটি দ্বারা এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়। কোন জিনিসকে সমান দশটি ভাগে ভাগ করা হলে তার একটি ভাগকে 'উশর' বলা হয়। উশরের অর্ধেক তথা ১/২০ ভাগকে আরবীতে বলা হয় 'নিসফুল উশর'। মুসলিমদের অধিকারভুক্ত জমিতে উৎপন্ন ফসলের যাকাতই উশর।

১২. খারাজ

'খারাজ' শব্দটি ফার্সী, আরবী ভাষায় বলা হয় (طسق) তাসক। 'কিতাবুল আমওয়াল' গ্রন্থে বলা হয়েছে- وعلى ارضهم الطسق 'তাদের (অমুসলিমদের) ভূমির উপর ট্যাকস ধার্য করা হয়েছে'। এই আরবী طسق কেই ইংরেজীতে Task কিংবা Tax বলা হয়।[৮৩] পরিভাষায় ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের মালিকানা ও ভোগাধিকৃত জমি হতে যে রাজস্ব আদায় করা হয়, তাকে খারাজ বলা হয়।[৮৪] অমুসলিমদের জমিতে উশর নেই, আছে খারাজ। উশর ইবাদত হলেও খারাজ শুধু নিছক ভূমি কর। এটা অমুসলিমদের জমির সাথেই নির্দিষ্ট ও সংশ্লিষ্ট। খারাজের পরিমাণ নির্ধারণ করা ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য। ইসলামী রাষ্ট্রকে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা বিশেষ সতর্কতার সাথে জমির জরিপ ও গুণাগুণ নির্ণয় করে খারাজ নির্ধারণ করতে হয়। খারাজের অর্থ ব্যয় করা যাবে- সৈন্য ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ইত্যাদিতে এবং রাষ্ট্রের সাধারণ ব্যয় ও জনকল্যাণমূলক কাজে।[৮৫] ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'কিতাবুল খারাজ'-এ বলা হয়েছে- 'খারাজ সমগ্র মুসলিমের- ইসলামী রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের সম্মিলিত সম্পদ।'[৮৬]

১৩. জিযয়াহ্ কর

ইসলামের দারিদ্র্য দূরীকরণের সহায়ক আর একটি উৎস হল 'জিযয়াহ' কর। 'জিযয়াহ' অর্থ 'বিনিময়'; রাষ্ট্র প্রজা-সাধারণের রক্ষণাবেক্ষণের যে দায়িত্ব গ্রহণ করে,

---

৮৩. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামের অর্থনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫

৮৪. প্রাগুক্ত।

৮৫. ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, *ইসলামের যাকাত বিধান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৪৩

৮৬. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামের অর্থনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬

তাদেরকে যে নিরাপত্তা দান করে তারই বিনিময়ে প্রয়োজন পরিমাণে কর আদায় করার অধিকার লাভ করে থাকে। ইসলামী অর্থনীতির পরিভাষায় 'জিযয়াহ' বলা হয়- ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত অমুসলিম নাগরিকদের নিকট হতে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন পূরণের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণে একটি বিশেষ কর গ্রহণ করা।[৮৭] এ প্রসঙ্গে কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে,

﴿ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾

> যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা অধীনতা ও রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করে জিযয়াহ দিতে প্রস্তুত হবে।[৮৮]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম বলেন,

> ইসলামী রাষ্ট্রের অধীন অমুসলিম প্রজাদের প্রধানত দু'টি কর্তব্য রয়েছে। প্রথমত : রাষ্ট্রের পূর্ণ আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করা এবং দ্বিতীয়ত : রাষ্ট্রীয় কার্য পরিচালনায় আর্থিক প্রয়োজন পূরণের জন্য সাধ্যানুযায়ী অর্থ দান করা।[৮৯]

১৪. আল-ফাই

মুসলমানগণ যুদ্ধ ব্যতীত যে সম্পদ লাভ করে বা যা মুসলমানগণের দখলে আসে এবং বিজিত দেশসমূহের যে ভূ-সম্পত্তি তাদের অধীকারভুক্ত হয় তাই 'ফাই'। আল-কুরআনুল কারীম ফাই ব্যয়ের ক্ষেত্রে দারিদ্র্য দূরীকরণকে প্রাধান্য দিয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ﴾

> আল্লাহ জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রাসূলকে যা দিয়েছেন তা আল্লাহর, তার রাসূলের, তার আত্মীয়-স্বজনের, ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্তদের এবং মুসাফিরদের জন্যে, যাতে ধনৈশ্বর্য কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়।[৯০]

দারিদ্র্য বিমোচনে এ প্রকার সম্পদও রাসূলুল্লাহ সা. ব্যয় করতেন। সুতরাং আল-ফাই দারিদ্র্য দূরীকরণে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

১৫. সাদাকাতুল ফিতর

রমাযান মাসান্তে ঈদুল ফিতর-এর দিন প্রত্যেক ধনী ব্যক্তি গরীবদের মধ্যে নির্দিষ্ট হারে যে শস্য কিংবা তার মূল্য রোযার ফিতরা বাবদ বণ্টন করেন- একে 'সাদাকাতুল ফিতর' বলা হয়। এই সাদাকাহ প্রত্যেক বিত্তশালী তার পরিবারের সকল সদস্যের পক্ষ থেকে আদায় করতে বাধ্য। এ প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ ইবন উমর হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

---

৮৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭

৮৮. আল-কুরআন, ৯ : ২৯

৮৯. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামের অর্থনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮

৯০. আল-কুরআন, ৫৯ : ০৭

فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ أَوْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ

রাসূলুল্লাহ সা. মুসলমানদের প্রত্যেক গোলাম, স্বাধীন ব্যক্তি, নারী-পুরুষ, ছোট-বড় সকলের উপর সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা ফরয করে দিয়েছেন।[৯১]

ইসলামী অর্থনীতির দৃষ্টিতে একেও রাষ্ট্রীয় আয় হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। ইমাম বুখারী রহ. লিখেছেন, ইসলামী খিলাফতের যুগে এই সাদাকাহ বায়তুল মালে জমা করা হতো এবং তথা হতে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী এলাকার গরীবদের মধ্যে তা বণ্টন করা হত।[৯২] এমনিভাবে দারিদ্র্য দূরীকরণে ইসলামী প্রক্রিয়াগুলো সক্রিয় ছিল।

১৬. ওয়াকফ

'ওয়াকফ' শব্দটি আরবী। কোন সম্পত্তি আল্লাহর নামে নির্দিষ্ট করে দেয়াকে 'ওয়াকফ' বলা হয়।[৯৩] এটি একটি নফল ইবাদত, যার জন্য রাসূলুল্লাহ সা. বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করেছিলেন। ওয়াকফ করা সাদাকায়ে জারিয়া (অনন্তকালের জন্য দান বা প্রীতি)। কেননা এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে সৎভাবে উপার্জন করে কোন সম্পত্তি মুসলিম জাতির জন্য দান করে গেলে তা মানুষের কল্যাণ বহন করে এবং সাদাকায়ে জারিয়া হিসেবে বহাল থাকে। যতদিন মানুষ এর ফলে উপকার পেতে থাকবে ততদিন সাদাকাকারী এর সওয়াব বা পুরস্কার পেতে থাকবে।[৯৪]

মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে ওয়াকফ সম্পত্তি একাধারে জনকল্যাণে সহায়ক ও সরকারি ভূমি প্রশাসনেও গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। নিঃস্ব ও দরিদ্র মানুষের মৌলিক মানবিক প্রয়োজন পূরণে সহায়তার উদ্দেশ্যে ধনাঢ্য মুসলিম ব্যক্তিবর্গ তাঁদের সম্পত্তি ওয়াকফ করে যান। একদা ইসলামী রাষ্ট্রসমূহে বিপুল সংখ্যক লোকের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হতো ওয়াকফ সম্পত্তির আয় হতেই। ইসলামের দৃষ্টিতে ওয়াকফকৃত সম্পত্তির আয় গরীব, মিসকীন, মুসাফির, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ও ইয়াতীমদের জন্য বণ্টন করা হবে।[৯৫]

বাংলাদেশেও প্রচুর ওয়াকফ সম্পত্তি রয়েছে। হাজী মুহম্মদ মহসিন ওয়াকফ এস্টেট, নবাব ফয়জুন্নেসা ওয়াকফ এস্টেট এবং নবাব সলিমুল্লাহ ওয়াকফ এস্টেট-এর কথা এদেশের অনেকেরই জানা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ সব সম্পত্তির সুষ্ঠু তদারকি ও ব্যবহার পরিলক্ষিত হচ্ছে না। বস্তুত যথাযথ ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পিত ব্যবহার হলে

---

৯১. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : আয-যাকাত, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৬৩৬

৯২. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামের অর্থনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭

৯৩. উবায়দুল্লাহ, *শরহুল বিকায়া*, দেওবন্দ : মাকতাবায়ে রহমানিয়া, খ. ২, পৃ. ৩৫০

৯৪. ড. ইউসূফ আল-কারাদাভী, *দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম*, মোহাম্মদ মিজানুর রহমান ও মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ অনূদিত, সেন্ট্রাল শরীআহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, ঢাকা : ২০০৮, পৃ. ১৭৯

৯৫. ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

এ উৎস হতেই যেমন আরো বেশি আয় হতে পারতো, তেমনি বাস্তবভিত্তিক কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে অধিকতর কল্যাণমুখী তথা কর্মসংস্থান, উৎপাদনক্ষম ও আয়বর্ধনমূলক কাজ করাও সম্ভব হতো। এছাড়া ইতোমধ্যে যেসব ওয়াকফ সম্পত্তির পুরো অংশ বা অংশবিশেষ বেদখল হয়ে গেছে সেগুলো উদ্ধার ও যথাযথ ব্যবহারে সরকার যথার্থ তৎপর হলে দরিদ্র ও অভাবী মানুষের মৌলিক চাহিদার অনেকটাই মিটানো সম্ভব হতে পারে।

১৭. 'আল-কার্‌যুল হাসান' বা 'কার্‌য হাসান'

সুদ মুক্ত ঋণ দানকে 'আল-কার্‌যুল হাসান' বলা হয়। রাসূলুল্লাহ সা. এর সময়কাল হতে মুসলিম সমাজে 'আল-কার্‌যুল হাসান' পদ্ধতি চালু হয়ে আসছে। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ সমাজের দরিদ্র ও অভাবী মানুষের প্রয়োজন পূরণের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে পরিশোধের শর্তে 'আল-কার্‌যুল হাসান' প্রদান করতেন। পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা, প্রীতি, ভালবাসা ও সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য দরিদ্র, অসহায়, নিঃস্ব ও অভাবী লোকদের নিঃস্বার্থভাবে ঋণ প্রদান করা স্বাবলম্বীদের কর্তব্য। আল্লাহ তাআলা সমাজের বিত্তশালীদের বিনা সুদে ঋণদানে উৎসাহিত করেছেন এভাবে,

﴿ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾

> কে সেই ব্যক্তি যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে, এরপর তিনি তার জন্যে তা বহুগুণ বৃদ্ধি করবেন এবং তার জন্য রয়েছে সম্মানিত পুরস্কার।[৯৬]

অন্য আয়াতে সালাত এবং যাকাতের সাথে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে-

﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾

> তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে কার্য হাসান বা উত্তম ঋণ দান কর।[৯৭]

'কার্য হাসান'-এর এ বিধান সমাজে প্রয়োজন পূরণের জন্য অর্থ লেন-দেন এবং ব্যবসায়িক কার্যাবলি সচল রাখার পথ তৈরি করে দিয়েছে।

সুতরাং এর ফলে সমাজে যেমন কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে, তেমনি নির্দিষ্ট আয়ের মানুষের ক্রয় ক্ষমতা স্থির রাখার সুযোগ সৃষ্টি হবে। এ বিষয়ে সরকারের দায়িত্ব 'কার্য হাসান'-এর অর্থ পরিশোধের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও বিধিমালা তৈরি এবং সে সাথে ধনী ব্যক্তিদের এ ক্ষেত্রে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা। সরকার যদি প্রকৃত 'কার্য হাসান' প্রদানকারীদের 'কার্য হাসান'-এর উপর আয়কর রেয়াতের সুবিধা প্রদান করেন, তাহলে এ উদ্যোগ অনেকটাই সফলতা লাভ করবে। বর্তমানে ইসলামের এই সুমহান শিক্ষা

---

৯৬. আল-কুরআন, ৫৭ : ১১

৯৭. আল-কুরআন, ৭৩ : ২০

প্রতিপালিত হচ্ছে না বিধায় সুদ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে আর অর্থনীতির চাকা স্থবির হচ্ছে। পরিণামে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। নষ্ট হচ্ছে সামাজিক ভারসাম্য। সুতরাং দারিদ্র্য দূরীকরণে ইসলামের এই পদ্ধতির বাস্তবায়ন অত্যন্ত জরুরী।

১৮. সম্পদের মালিকানায় রাসূলুল্লাহ সা.-এর দিক-দর্শন

সম্পদের উপর মানুষের একচ্ছত্র মালিকানা তাদের মধ্যে স্বেচ্ছাচারিতা ও লাগামহীনতার জন্ম নেয়।[৯৮] এই স্বেচ্ছাচারী মানসিকতাই হচ্ছে শোষণের মূল, যা সমাজের দরিদ্রতা বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। রাসূলুল্লাহ সা. সম্পদের উপর মানুষের একচ্ছত্র মালিকানার ধারণা রহিত করে সূচনাতেই শোষণবাদী মানসিকতার মূলোৎপাটন করেন। এ লক্ষ্যে তিনি দু'টি যুগান্তকারী মূলনীতি আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষকে জানিয়ে দেন। প্রথমটি হচ্ছে 'সার্বভৌমত্ব ও মালিকানা শুধু আল্লাহর।'[৯৯] সৃষ্টি জগতের যে কোন বস্তু তা যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন মানুষ তার মূল মালিক নয়।[১০০]

আল-কুরআনুল কারীমে আল্লাহ ঘোষণা করেন,

﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾

> আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সকল কিছুর মালিকানা আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন।[১০১]

দ্বিতীয়টি হচ্ছে 'মানুষ হলো সম্পদের আমানতদার মাত্র'। এ ব্যাপারে তারা আল্লাহর বিধানকে পুরোপুরি মেনে চলবে এবং আল্লাহর ইচ্ছার বিপরীত এক পয়সাও খরচ করবে না। সুতরাং আল্লাহর সম্পদ ভোগ-ব্যবহারে সমস্ত মানুষের অভিন্ন ও সম-অধিকার রয়েছে। অতএব, যে লোক এ উদ্দেশ্য ও নিয়মে সম্পদের ব্যবহার করবে তার হাতে এ সম্পদ তার নিজের ও সমাজের সাধারণ কল্যাণে নিয়োজিত থাকবে।[১০২] রাসূলুল্লাহ সা. এর আলোচ্য দৃষ্টিভঙ্গির কারণে মানুষের মধ্যে সম্পদ অর্জনের প্রতিযোগিতায় ভাটা পড়ে, বন্ধ হয়ে যায় সম্পদ অর্জনের উন্মত্ততা ও অবৈধ চাহিদা। ফলশ্রুতিতে দিন দিন ধনী-গরীবের ব্যবধান হ্রাস পেয়ে দূরীভূত হয় দারিদ্র্য।

---

৯৮. ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, 'রাহমাতুল্লিল আলামীনের অর্থদর্শনের কতিপয় বৈশিষ্ট্য', *অগ্রপথিক*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জানুয়ারী ১৯৯৫, পৃ. ৯৪

৯৯. আল-কুরআন, ০৭ : ৫৪; ০২ : ১০৭; ২৫ : ০২; ৬৭ : ০১; ৯৫ : ০৮; ৪৩ : ৮৪; ১১ : ১০৭; ৮৫ : ১৬; ০৫ : ০১

১০০. ড. নাজাতুল্লাহ সিদ্দিকী, *ইসলামে মালিকানার রূপরেখা*, মাওলানা সেকান্দার মমতাজী অনূদিত, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০, পৃ. ৭

১০১. আল-কুরআন, ০৫ : ১৭

১০২. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামের অর্থনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

১৯. উপার্জনহীনদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ

সমাজের সকল শ্রেণীর লোকই উপার্জনের যোগ্যতা সম্পন্ন এবং কর্মক্ষম হবে এমন নয়। সমাজে কর্মক্ষমতাহীন লোকও থাকতে পারে। রাসূলুল্লাহ সা.-এর সমাজেও কর্মক্ষমতাহীন, ইয়াতীম, শিশু, অক্ষম ও পঙ্গু লোক ছিল। তারা ছিল দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত। রাসূলুল্লাহ সা. এসব লোকের দরিদ্রতা দূরীকরণার্থে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি যাকাত, সাদাকাতুল ফিতর, স্বেচ্ছাকৃত দান ইত্যাদির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয়ভাবে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও উপার্জনহীনদের কল্যাণের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সমাজের কর্মহীন লোকদের সামাজিক সহানুভূতি প্রদানের নিমিত্ত তিনি নবগঠিত মদীনা রাষ্ট্রের নাগরিকদের এরূপ শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, তাদের অর্জিত ধন-সম্পদ শুধু তাদের নিজের জন্যই নয় বরং তা তাদের পরিবারের অন্য সদস্যদের জন্য এবং সে সাথে সমাজের কর্মক্ষমতাহীন, আশ্রয়হীন ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্যও।

২০. প্রতিবেশীর হক

প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে অত্যধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

﴿ وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا ﴾

আর ইবাদত কর আল্লাহর, শরীক করো না তার সাথে অপর কাউকে। পিতা-মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন, আত্মীয় ও অনাত্মীয় প্রতিবেশী, সহকর্মী, মুসাফির এবং নিজের দাস-দাসীর প্রতিও। নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক গর্বিতজনকে।[১০৩]

রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন,

إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ

যখন তোমরা তরকারি রান্না কর, তখন তাতে একটু বেশি পানি দাও। যাতে তুমি তোমার প্রতিবেশীর খোঁজ-খবর নিতে পার।[১০৪]

রাসূলুল্লাহ সা. আরো বলেছেন,

مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَيُوَرِّثَنَّهُ

---

[১০৩]. আল-কুরআন, ৪ : ৩৬

[১০৪]. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-বিররু ওয়াস সিলাহ ওয়াল আদব, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৪৭৫৮

জিবরাঈল আ. আমাকে প্রতিবেশী প্রশ্নে অব্যাহতভাবে ওসিয়ত করতে থাকলেন। আমার ধারণা হতে লাগল যে, তিনি প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিবেন।[১০৫]

দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম প্রতিবেশীর হক আদায় করার প্রতি অত্যন্ত সুস্পষ্ট বক্তব্য প্রদান করেছে। অসহায়, নিঃস্ব, দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও প্রতিবেশীর প্রতি সাহায্যের হাত সম্প্রসারিত করা বিত্তবানদের দায়িত্ব-কর্তব্য বলেও ঘোষণা করা হয়েছে।

২১. দারিদ্র্য বিমোচনে কুরবানী

প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তির পক্ষেই কুরবানী করা আবশ্যক। এ কুরবানীর গোশতের একটি অংশ গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে তাদের সাহায্য করা হয়। এভাবে কুরবানীর গোশত প্রদানের মাধ্যমে সামাজিক যে ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি হয়, তার গুরুত্বও অপরিসীম। কুরবানীর দ্বারা অভাবক্লিষ্ট মানুষকে আর্থিক সাহায্যের আর একটি পথ হলো কুরবানীর পশুর চামড়ার অর্থ প্রদান। কুরবানীর পশুর বিক্রীত চামড়ার মূল্য বা অর্থের পরিমাণও বিপুল। তবে এদেশে ইসলামী শাসন পদ্ধতি না থাকায় যাকাতের মতো চামড়া বিক্রি খাতের টাকাটাও ব্যক্তিগতভাবে বিলি বণ্টন করা হয়। এমনিভাবে যদি ব্যক্তিগতভাবে বিলি-বণ্টন না করে পরিকল্পিত উপায়ে আদায় ও বণ্টন করা হয় তাহলে দারিদ্র্য বিমোচনে কুরবানী বিরাট ভূমিকা পালন করবে।[১০৬]
এছাড়াও দারিদ্র্য দূরীকরণে ইসলামী কৌশলের মধ্যে রয়েছে ফিদয়া, হিবা, ওয়াসিয়াত, কাফ্ফারা, মিরাছী আইনের বাস্তবায়ন ইত্যাদি।[১০৭]

সুপারিশমালা

সমাজকে দারিদ্র্য মুক্ত করে একটি সুখী সমৃদ্ধ ও অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠন করতে হলে নিম্নোক্ত সুপারিশগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে:

১. সমাজের সর্বস্তর থেকে সুদ বর্জন;
২. মৌলিক অধিকার নিশ্চিতকরণ;
৩. কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মাথা পিছু আয় ও সঞ্চয় বৃদ্ধি;
৪. দারিদ্র্যকে আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা হিসেবে গ্রহণ করা এবং দারিদ্র্যাবস্থায় নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বিসর্জন না দেয়া;

---

[১০৫] ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-আদাব, পরিচ্ছেদ : আল-অসাতু বিল জার, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫৬৬৮

[১০৬] আফতাব চৌধুরী, 'দারিদ্র্য বিমোচনে ঈদুল আযহা', *দৈনিক নয়া দিগন্ত*, ক্রোড়পত্র- অবকাশ, নভেম্বর ২২, ২০০৯, পৃ. ৯

[১০৭] বিস্তারিত জানার জন্য দেখা যায়- ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, *আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪-৮৯

৫. দারিদ্র্য বিমোচন কল্পে গৃহীত কর্মসূচীগুলো মানবরচিত বিধায় ভুলের উর্ধ্বে নয়, তাই সর্বাবস্থায় এ বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহর বিধানকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সমুন্নত রাখা;
৬. অবৈধ পথে সম্পদ অর্জন ও ব্যয় বর্জন করা এবং সম্পদ গুদামজাতকরণের মানসিকতা পরিহার করা;
৭. সমাজ থেকে যুলম, নির্যাতন ও শোষণের পথকে মূলোৎপাটন করে ভারসাম্যপূর্ণ ও কার্যকর অর্থব্যবস্থা প্রবর্তন করা;
৮. যাকাত, উশর, খারাজ, জিযয়াহ কর ও সাদাকাতুল ফিতরের আদায় ও বণ্টনে সুষ্ঠু নীতিমালা প্রণয়ন ও সরকারের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা;
৯. পাশ্চাত্য কৌশলের বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনে না জড়িয়ে ইসলামের সার্বিক বক্তব্যের আলোকে দারিদ্র্য নিরসন কল্পে দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করা;
১০. ত্রাণ ও পুনর্বাসন এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচীকে অগ্রাধিকার প্রদান; এবং
১১. ইসলামের দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলগুলোর যথাযথ বাস্তবায়ন।

উপসংহার

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, রাসূলুল্লাহ সা. যেমনিভাবে তাঁর পুরো জীবনকে মানবজাতির কল্যাণ সাধনে সংগ্রামে ব্যাপৃত রেখেছিলেন, তেমনিভাবে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্যও তিনি সংগ্রাম করেছেন। এ বিষয়ে ইসলামের কৌশল ও নির্দেশনা অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও কার্যকরী। কিছু বিষয়ে রয়েছে আল-কুরআনুল কারীমের সরাসরি শিক্ষা-দর্শন ও নির্দেশনা। আর কিছু বিষয়ের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও কর্মপদ্ধতি এসেছে রাসূলুল্লাহ সা.-এর বাণী ও কর্মের মাধ্যমে। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের জন্য যে দ্বীন ও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা নিয়ে এসেছেন এর প্রতিটি ক্ষেত্রেই রয়েছে অনন্ত প্রশান্তি ও অফুরন্ত রহমতের ফল্গুধারা। মানবজীবনের যত সমস্যা রয়েছে সবচে' জটিল সমস্যা হচ্ছে অর্থনৈতিক সমস্যা।

বিশ্ববিপ্লবের অগ্রনায়ক রাসূলুল্লাহ সা. প্রবর্তিত শাশ্বত সুন্দর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিশ্ব জুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তিনি শুধু অন্ধকারাছন্ন সমাজ ব্যবস্থাকে সুসংহত করেননি। মানুষের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার উপরও গুরুত্বারোপ করেছেন। কিভাবে অর্থ উপার্জন করতে হবে, কিভাবে ব্যয় করতে হবে, কোন পথে অর্থনৈতিক মুক্তি-তার সঠিক নির্দেশনা দিয়েছেন তাঁর প্রবর্তিত অর্থব্যবস্থার মাধ্যমে। রাসূলুল্লাহ সা. প্রবর্তিত অর্থব্যবস্থার মূল লক্ষ্য ছিল সমাজ থেকে যুলম, নির্যাতন ও শোষণের পথকে মূলোৎপাটনকরণ এবং সে সাথে সুষম-ভারসাম্যপূর্ণ ও কার্যকর অর্থ-ব্যবস্থা প্রচলনের

মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন। এ বিষয়ে তিনি সফলও হয়েছিলেন। মাত্র কয়েক বছরের পরিসমাপ্তিতে নেমে এসেছিল এক অনাবিল সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি। খুঁজে পাওয়া যায়নি যাকাত গ্রহণ করার মত কোন অস্বচ্ছল লোককে।

অতএব বলা যায়, ইসলাম তথা রাসূলুল্লাহ সা. প্রবর্তিত অর্থব্যবস্থা এবং এর দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলের সফল বাস্তবায়নে ইসলামের সোনালি যুগে দারিদ্র্য দূরীকরণের যে বাস্তব চিত্র ও ফলাফল পরিলক্ষিত হয়েছিল আজও সে ফলাফল বয়ে আনবে নিঃসন্দেহে। দারিদ্র্যক্লিষ্ট এ সমাজ ও মানবজাতিকে দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ থেকে মুক্ত করে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ জাতি হিসেবে গড়ে তুলতে ইসলামের দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলগুলোর বাস্তবায়নের কোন বিকল্প নেই। প্রয়োজন শুধু কার্যকর ও সম্পূর্ণভাবে তা গ্রহণ এবং সৎ মানসিকতার। সুতরাং ইসলামের দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলগুলোর বাস্তবায়ন আজ সময়ের দাবি।

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১০ সংখ্যা : ৩৮
এপ্রিল - জুন : ২০১৪

সরকারি মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা-এর সিলেবাসে ফিকহশাস্ত্র : একটি পর্যালোচনা

মোঃ মনজুরুর রহমান*

[**সারসংক্ষেপ :** *বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে অবদান রাখা ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারি মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা। এই মাদরাসার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও অবদান এবং ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে এর ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়ে ইতঃপূর্বে সামান্য কিছু গবেষণা বা লেখালেখি হলেও এই প্রতিষ্ঠানটির শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত প্রায় আড়াইশ' বছরের পরিক্রমায় এর সিলেবাসে ফিক্‌হ শাস্ত্রের অবস্থানের প্রকৃতি ও ব্যপ্তি ইত্যাদি বিষয়ে কোন গবেষণামূলক মৌলিক কাজ হয়েছে বলে আমরা পাইনি। এই প্রতিষ্ঠানটি দেশের সর্বপ্রাচীন ও আলিয়া নেসাবের পথিকৃৎ মাদরাসা হিসেবে বাংলাদেশে ফিক্‌হ চর্চার ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। অত্র প্রবন্ধে মাদরাসা-ই-আলিয়া প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট, বৃটিশ আমল থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত বিভিন্ন কমিটির রিপোর্টে এবং বিভিন্ন সময়ে প্রণীত ও সংস্কারকৃত সিলেবাসে ফিক্‌হ ও উসূলুল ফিক্‌হ বিষয়ে বিভিন্ন শ্রেণিতে কী কী বিষয় ও গ্রন্থ পড়ানো হতো এবং বর্তমানে হচ্ছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রবন্ধটিতে ধারাবাহিকভাবে সিলেবাসে ফিক্‌হ শাস্ত্রের অবস্থান বিশ্লেষণহীন ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। শেষে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করে কিছু প্রস্তাবনা উপস্থাপন করা হয়েছে। বিশ্বায়নের এই যুগে মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিশেষ করে ফিক্‌হ চর্চাকে আধুনিকায়নের কোন বিকল্প নেই। তাই নীতিনির্ধারণী কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে এই প্রস্তাবনাগুলো বাস্তবায়নে আশু ব্যবস্থা গ্রহণ একান্ত বাঞ্ছনীয়। বাংলাদেশে ফিক্‌হ বা ইসলামী আইন চর্চার বিস্তারিত ইতিহাস প্রণয়নের ক্ষেত্রে এই গবেষণা কর্মটি সহায়ক হবে। তবে এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত ও বিশ্লেষণমূলক গবেষণা হওয়া খুব জরুরী।*]

ভূমিকা

সরকারি মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা পাক-ভারত উপমহাদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম। ইসলামী শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিকাশের ক্ষেত্রে এটি কেবল একটি প্রতিষ্ঠানের নাম নয়; বরং একটি অবিস্মরণীয় শিক্ষা আন্দোলনের নাম, যা প্রবহমান নদীর মত আজও প্রবাহিত। ১৭৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত কোলকাতা মাদরাসা-ই-আলিয়াই এ উপমহাদেশের সর্বপ্রথম নিয়মিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

---

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামী শিক্ষা বিভাগ, সরকারি মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা- ১২১১

রাসূলুল্লাহ সা. কর্তৃক মদীনায় কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হতে মসজিদ কেন্দ্রিক মাদরাসা শিক্ষা তথা ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়। পরবর্তীকালে খুলাফায়ে রাশিদীন, বানূ উমায়্যা, বানূ আব্বাস, ফাতিমী ও তুর্কী সুলতানগণের গোত্রীয় শাসন আমলে ইউরোপ ও আফ্রিকার দেশসমূহে ইসলামী রাষ্ট্রের বিস্তৃতি ঘটে এবং মুসলিম শাসকদের সহায়তায় সাহাবা, তাবিঈন, তাবা' তাবিঈন এবং অসংখ্য আলিম ও পীর-মাশাইখের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় সারা মুসলিম বিশ্বে মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থাই একমাত্র দীনি শিক্ষা ব্যবস্থা হিসাবে বিস্তার লাভ করে।

আলিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট

১৭৫৭ সালে পলাশি বিপর্যয়ের পর অবিভক্ত পাক-ভারত উপমহাদেশে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে ইংরেজ শাসকগণ সুকৌশলে এদেশের মাদরাসা ও মসজিদসমূহের বিরাট বিরাট ওয়াক্ফ এস্টেট রাষ্ট্রায়ত্ত করে নেয় এবং এগুলোর আয়ে স্বাধীনভাবে পরিচালিত অবৈতনিক মাদরাসাসমূহের বিলোপ সাধন করে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির অপমৃত্যু ঘটানোর প্রয়াস চালায়। শুধু তাই নয়; বরং রাষ্ট্রায়ত্ত ভূ-সম্পত্তিসমূহ হিন্দু জমিদারদেরকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দিয়ে তাদের আনুকূল্য নিয়ে এদেশে বৃটিশ শাসন পাকাপোক্ত করার অপকৌশল গ্রহণ করে। এমনি এক সময়ে পাক-ভারত উপমহাদেশের বিখ্যাত আলিমে দীন শাহ ওয়ালিউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী রহ.-এর সুযোগ্য ছাত্র মাওলানা মাজদুদ্দীন ওরফে মোল্লা মদন রহ. ও তৎকালীন মুসলিম নেতৃবৃন্দের জোরালো দাবির মুখে বৃটিশ সরকার ভারতীয় বড়লাট স্যার ওয়ারেন হেস্টিংস-এর নির্দেশনায় ১৭৮০ সালে পশ্চিমবঙ্গের কোলকাতায় মাদরাসা-ই-আলিয়া প্রতিষ্ঠার সরকারি পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এটা ছিল রাজ্যহারা ও নেতৃত্বহারা মুসলমানদের গভীর হতাশার নিকষ অন্ধকারে জ্বলে ওঠা হঠাৎ কোন বাতিঘরের মত, যা আজও পথহারা মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দিচ্ছে।[১]

১৯৪৭ সালে পাক-ভারত বিভাগের পর ভারত সরকার অত্র প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ভার বহন করতে অনীহা প্রকাশ করে। এদিকে পাকিস্তান সরকার সাগ্রহে এর যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করার ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং অতি দ্রুত মাদরাসার যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি, বইপত্র তৎকালীন পূর্ব বাংলার রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরের ব্যবস্থা করে।[২] সেই থেকে অদ্যাবধি মাদরাসাটি স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার বখশিবাজারে স্বগৌরবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

---

১. মাওলানা মমতাজ উদ্দিন আহমদ, *মাদরাসা-ই-আলিয়ার ইতিহাস*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ. ৬

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮

মাদরাসার সিলেবাসে ফিক্‌হ শাস্ত্র

বৃটিশ আমল

১৭৮০ সালে মোল্লা মাজদুদ্দীন রহ. দরসে নিযামিয়ার[৩] রীতি অনুযায়ী মাদরাসার কার্যক্রম শুরু করেন। উল্লেখ্য, তিনি নিজেও দরসে নিযামিয়ার ছাত্র ছিলেন।[৪]

মাদরাসার মূল লক্ষ্য সম্পর্কে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে গভর্নরের সুপারিশ

১৭৮১ সালে অত্র অঞ্চলের তৎকালীন গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস মাদরাসার ব্যাপারে তাঁর উদ্যোগ সম্পর্কে কোম্পানির ডিরেক্টরদেরকে অবহিত করে বলেন–

> আমি এমন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন করেছি যেখানে মুসলমান ছাত্রদের আইন শিক্ষা দেয়া হবে। শিক্ষা লাভের পর তারা সরকারের অধীনে জজ ও পরিসংখ্যানবিদের (assessor) পদ অলংকৃত করবেন। এতকাল আমি বই, মাদরাসার যাবতীয় খরচপত্র আমার বিশেষ তহবিল হতে পূরণ করেছি। কিন্তু এখন কোম্পানিকে এই প্রতিষ্ঠানের সকল দায়িত্ব গ্রহণ করার সময় এসেছে। মাদরাসার জন্য ইতঃপূর্বে যে জমি নেয়া হয়েছে কোম্পানি সেখানে মানসম্মত মাদরাসা ভবন নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। আমার হিসাব মতে এতে একান্ন হাজার টাকা ব্যয় হবে।[৫]

এ বক্তব্য দ্বারা বুঝা যায়, এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠায় কোম্পানির মূল উদ্দেশ্য ছিল ফিকহশাস্ত্র অধ্যয়ন পূর্বক জজ বা কাযীর পদ গ্রহণ করা এবং মুসলিম জনসাধারণের একটি অংশকে সরকারি কাজে লাগানো, যাতে বৃটিশদের প্রতি মুসলমানদের বিদ্বেষ কমে আসে।

মাদরাসার সিলেবাস সংস্কারের উদ্দেশ্য

বিভিন্ন সময়ে মাদরাসা-ই-আলিয়ার সিলেবাস সংস্কার করা হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীনতম এই ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন করে এতে পাশ্চাত্য শিক্ষাধারা প্রবর্তন করা। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ড. ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার এ সম্পর্কে সরকারকে যে পরামর্শ দিয়েছিলেন তা হচ্ছে–

> ....কিন্তু এটাও বুদ্ধিমানের কাজ হবে না মাদরাসার শিক্ষা ধারা থেকে ফিক্‌হশাস্ত্র সম্পূর্ণ তুলে দেয়া। কেননা, এতে বর্তমান প্রজন্মের নিকট এই মাদরাসার কোন গুরুত্ব থাকবে না। স্মরণ রাখা উচিত যে, এই ইসলামী বিষয়টি (ফিক্‌হশাস্ত্র) দেয়ার আসল উদ্দেশ্য হল ' কাযী' তৈরি করা। অতএব, এটা উঠে গেলে এ শিক্ষার আর কোন প্রয়োজনই থাকবে না। আর ছাত্ররাও এতে লাভবান হবে না।[৬]

---

৩. দরসে নিযামিয়ার প্রবর্তক– মোল্লা নিযামুদ্দিন ছাহালুভী

৪. আব্দুস সাত্তার, *আলিয়া মাদরাসার ইতিহাস*, অনূ: মোস্তফা হারুন, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০, পৃ. ৩৬

৫. প্রাগুক্ত

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

দরসে নিযামিয়াতে ফিক্‌হ শাস্ত্রের অবস্থান

মোল্লা মাজদুদ্দীন রহ.-এর তত্ত্বাবধানে মাদরাসা-ই-আলিয়ায় দরসে নিযামিয়া কোর্স চালু হয়। সামান্য কিছু পরিবর্তনসহ উক্ত কোর্স ১৮৩৩ সাল পর্যন্ত চালু ছিল। ঐ কোর্সের প্রথম যে সিলেবাস প্রণীত হয় তা হচ্ছে– (১) ধর্মতত্ত্ব, (২) আইন, (৩) তর্কশাস্ত্র, (৪) দর্শন, (৫) ব্যাকরণ, (৬) অলংকার শাস্ত্র, (৭) গণিত এবং জ্যোতির্বিদ্যা।[৭] লক্ষ্য করা যায়, উক্ত সিলেবাসে ফিক্‌হ শাস্ত্রের কোন অবস্থান নেই এবং কোন শ্রেণিতে কোন বিষয় পাঠদান করা হয় তারও কোন বর্ণনা নেই। ১৮৫৯ সালে মাদরাসা-ই-আলিয়ায় যে সিলেবাসের প্রচলন ঘটে সেখানে শায়খ মাহমূদ ইব্‌ন আহমদ রচতি 'বিকায়া' নামক কিতাবটি ফিক্‌হ শাস্ত্রের সর্বপ্রথম পাঠ্যভুক্ত কিতাব। তবে উক্ত কিতাবের কোন্ কোন্ অধ্যায় পাঠ্যভুক্ত ছিল তার কোন উল্লেখ নেই।

দরসে নিযামিয়ার পরীক্ষা পদ্ধতি

সে সময়ে পরীক্ষা গ্রহণের নিয়ম-কানূন ছিল ভিন্ন ধরনের। তখন বিদ্যা অর্জন ও জ্ঞানানুশীলনের প্রাধান্য ছিল বেশি। একেবারে তুলাদণ্ডে ওজন করে পরীক্ষা নিতে হবে এরূপ কোন ধারণা ছিল না সে সময়ে। সেকালে পরীক্ষা পাশের জন্য না ছিল নির্দিষ্ট কোন সময়, না ছিল ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক পরীক্ষা পদ্ধতি আর প্রশ্নপত্রের বেড়াজাল। তখন একবার এবং শেষবারের মত একটি পরীক্ষা গ্রহণ করা হত। এর পদ্ধতি অনেকটা এরূপ ছিল যে, নির্দিষ্ট কিতাবাদি পড়া শেষ হলে শিক্ষক ব্যক্তিগতভাবে নিজস্ব কায়দায় পরীক্ষা গ্রহণ করতেন। শিক্ষক যদি মনে করতেন, লেখাপড়ায় ছাত্রটির কোন দৈন্য নেই, সে যথেষ্ট বিদ্যা অর্জন করেছে এবং অপরকে জ্ঞান দান করার মত যোগ্যতা অর্জন করেছে, ঠিক তখনই তাকে পরীক্ষা পাশের সনদ প্রদান করা হত। পক্ষান্তরে শিক্ষক যে ছাত্রকে পরীক্ষা পাশের অনুপযুক্ত মনে করতেন তাকে কোনভাবেই রেহাই দিতেন না। যে বিষয়ে সে দুর্বল রয়েছে সে বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ দিতেন। সে সময়ে যোগ্যতা অর্জন করা ছাড়া কোন ছাত্রই অহেতুক পাশ করার ভাবাবেগ প্রকাশ করত না। যতদিন না শিক্ষক তার জ্ঞানার্জন সম্পর্কে আশ্বস্ত হতেন, ততোদিন তাকে অবিরাম পরিশ্রম করতে হত।[৮]

সর্বপ্রথম নিয়মতান্ত্রিক পরীক্ষা গ্রহণ ও পরীক্ষা পদ্ধতি

মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে প্রায় ৪০ বছর পর্যন্ত উক্ত নিয়মে পরীক্ষা গ্রহণ করা হত। এরপর ১৮২১ সালের ১৫ আগস্ট সর্বপ্রথম নিয়মতান্ত্রিক পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়।[৯] তখনকার প্রশাসন হেড মৌলবী ও হেড মাস্টারের নেতৃত্বে গঠিত দু'টি

---

৭. G.M.D. Sufi, *Al Minhaj, Being the Evaluated of Carriculam in the Muslim Educational Institutione of Indo-Pakistan Sub. Continent*, 2nd ed. Lahor 1981, p. 92-93

৮. ড. জিয়াউদ্দিন, 'নেযামে ইমতেহান', *মুসলিম ইউনিভার্সিটি জার্নাল*, খ. ১, পৃ. ৩০৪

৯. আব্দুস সাত্তার, *আলিয়া মাদরাসার ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

কমিটি গঠন করে দিতেন। প্রত্যেক শিক্ষক সংশ্লিষ্ট বিষয়ের দায়িত্ব পালন করতেন। আবার এই কমিটিকে জনশিক্ষার ডিরেক্টর অনুমোদন করতেন। পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর পরই কমিটির সদস্যগণ নিজ নিজ রিপোর্ট, প্রশ্নপত্র (ইংরেজিতে অনুবাদ করে) ও উত্তরপত্র ডিরেক্টর সমীপে পেশ করতেন।[১০]

১৮৭১ সালের নতুন সিলেবাস

১৮৭১ সালে ফিক্হ শাস্ত্রের কলেবর আরো বৃদ্ধি করা হয় এবং কয়েকটি পর্যায়ে পাঠদান চলতে থাকে। তখনকার সিলেবাসে উসূলুল ফিক্হ (ফিক্হ শাস্ত্রের নীতিমালা) নতুন সংযোজিত হয়। তখন ফিক্হ শাস্ত্রের যে পাঠ্য পুস্তক পড়ানো হত তা হচ্ছে– ১. 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ প্রণীত শরহুল বিকায়া। এ গ্রন্থ থেকে তাহারাত, সালাত, যাকাত, সাওম, হজ্জ, নিকাহ্, তালাক, ঈমান, মফকূদ ও ওয়াকফ অধ্যায়সমূহ পাঠ্য ছিল। ২. বুরহানুদ্দীন আল-মারগীনানী রহ. প্রণীত হিদায়া গ্রন্থ। এ গ্রন্থ থেকে পাঠ্য ছিল বুয়ূ', কারাহিয়া, হিবা, ইজারাত, যাবা'ইহ ও আশ্‌রিবা অধ্যায়সমূহ। ৩. শায়খ হাফিয আহমাদ বিন আবূ সা'ঈদ ওরফে মোল্লা জীওয়ান প্রণীত নূরুল আনওয়ার গ্রন্থ। ৪. উবায়দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ প্রণীত তাওযীহ। ৫. মুহিব্বুল্লাহ আল বিহারী প্রণীত মুসাল্লামুল ছুবূত। ৬. হাফিয মুহাম্মদ শরীফ প্রণীত ফারাইযে শরীফিয়্যাহ। শেষোক্ত ৪ টি গ্রন্থের পাঠ্য কী কী ছিল তা জানা যায়নি। এখানে ছাত্ররা ৭ বছর শিক্ষালাভ করত। এরপর পরীক্ষার মাধ্যমে সার্টিফিকেট লাভ করত।[১১]

১৮৭১ সালের সিলেবাস বিশ্লেষণে দেখা যায়– জাগতিক প্রয়োজনেই মানুষের মধ্যে ফিকহী মাসআলা জানার এবং বাস্তব জীবনে এর প্রয়োগের ব্যাপক প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। সময়ের প্রয়োজনেই কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ের উপর বিভিন্ন শ্রেণিতে উচ্চতর সিলেবাস সন্নিবেশ করে। যেমন ১৮৫৯ সালে অত্র প্রতিষ্ঠানের ক্লাশসমূহ ৭ থেকে ৮ এ উন্নীত করা হয়। নিম্নস্তরে ৪টি এবং উচ্চস্তরে ৪টি। লক্ষ্য করা যায়, নিম্নস্তরের দ্বিতীয় শ্রেণি থেকেই ফিক্হ শাস্ত্রের প্রামাণ্য কিতাব 'হিদায়া'র ৪টি অধ্যায় পাঠদান করা হত। এভাবে তৃতীয় শ্রেণিতে 'নূরুল আনওয়ার' (২য় খণ্ড) এবং শরহে বেকায়ার ৭টি অধ্যায় পাঠ দান করা হত। অনুরূপভাবে চতুর্থ শ্রেণিতে নূরুল আনওয়ার (১ম খণ্ড) এবং শরহুল বিকায়ার ৫টি অধ্যায় পাঠদান করা হত। এভাবে ৫ম শ্রেণিতে শারহুত তাহযীব (পূর্ণাঙ্গ) এবং শারহে মোল্লাহ (প্রথমার্ধ), ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে নাফহাতুল ইয়ামান (প্রথমার্ধ) এবং আখলাকে মুহসিনীন (প্রথম বিশ অধ্যায়) এবং ৭ম শ্রেণিতে নাফহাতুল ইয়ামান (১ম অধ্যায়) পাঠদান করা হত।[১২] উক্ত

---

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

১১. *Report of the madrasah Education (Maula Baksh) Committee*. 1938, p. 9

১২. Ibid, p. 10

শ্রেণিসমূহের ফিক্‌হ শাস্ত্রের পাঠ্যপুস্তকের শুধু নাম পাওয়া যায়। বিস্তারিত পাঠ্যসূচি জানা যায় না। অনুরূপভাবে পরীক্ষার মোট নম্বর ও কতঘন্টা ব্যাপী পরীক্ষা গ্রহণ করা হত তারও কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না।

আর্ল কমিটির রিপোর্ট

বৃটিশ সরকারের আদেশ নং- ২৮৭৮ টিজি ও ২৮৮০ টিজি তাং- ১০ অক্টোবর ১৯০৭ মোতাবেক জনশিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর মি. আর্লকে মুসলমানদের শিক্ষা সম্পর্কিত একটি চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রদানের জন্য একটি বড় সম্মেলনের আয়োজন করার জন্য বিশেষ দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়। তিনি একটি বড় সম্মেলনের আয়োজন করেন। এই সম্মেলনে তৎকালীন বাংলাদেশের প্রায় সকল অঞ্চলের প্রতিনিধি নিয়োগ দেয়া হয়। এই সম্মেলন শেষে মি. আর্ল মাদরাসা শিক্ষা সম্পর্কিত একটি সংস্কারমূলক প্রতিবেদন বৃটিশ সরকারের কাছে পেশ করেন। এই প্রতিবেদনকে আর্ল কমিটির রিপোর্ট বলা হয়।[১৩]

এই সভায় শিক্ষা বিষয়ক সকল স্তরের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। কোন্ শ্রেণিতে কোন্ বিষয় সপ্তাহে কতদিন কতটি পিরিয়ড পাঠদান চলবে তার সুস্পষ্ট বিবরণ থাকলেও ফিক্‌হ শাস্ত্রের কোন বিষয় ও পিরিয়ডের বরাদ্দ রাখা হয়নি।[১৪] উল্লেখ্য, সিনিয়র স্তরের ১ম বর্ষ থেকে ফিক্‌হ শাস্ত্রের পাঠদান শুরু হয়।

এখানে আরেকটি বিষয় তাৎপর্যপূর্ণ যে, তৎকালীন সময়ে অত্র অঞ্চলে শীয়া ও সুন্নী সম্প্রদায়ের বিশেষ প্রভাব থাকায় তাদের জন্য ফিক্‌হ ও 'আকাইদ শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন কিতাব পাঠ্যভুক্ত ছিল। যেমন– ১ম বর্ষে সুন্নী সম্প্রদায়ের জন্য পাঠ্য ছিল শায়খ দাউদ বিন আবদুল্লাহ ফাতানী প্রণীত মুনিয়্যাতুল মুসল্লী আর শীয়া সম্প্রদায়ের জন্য ইমাম ইব্‌ন হাজার আল-আসকালানি প্রণীত নুজহাতুল ইবাদ। ২য় বর্ষে সুন্নী সম্প্রদায়ের জন্য 'উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ রহ. প্রণীত শারহুল বিকায়া (১ম খণ্ড) আর শীয়া সম্প্রদায়ের জন্য শারাউল ইসলাম নামক গ্রন্থ। ৩য় বর্ষে সুন্নী সম্প্রদায়ের জন্য 'উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ রহ. প্রণীত শারহুল বিকায়া-এর ২য় খণ্ড এবং শীয়া সম্প্রদায়ের জন্য শারাউল ইসলাম গ্রন্থের ২য় খণ্ড। অনুরূপভাবে ৩য় বর্ষে উসূলুল ফিক্‌হ হিসাবে সুন্নী সম্প্রদায়ের জন্য তাওযীহ্ এবং শীয়া সম্প্রদায়ের জন্য আব্দুল মালিক বিন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ প্রণীত তালখীস গ্রন্থদ্বয় পড়ানো হতো। ৪র্থ বর্ষে সুন্নী সম্প্রদায়ের জন্য বুরহানুদ্দীন আল-মারগীনানী প্রণীত হিদায়া (৩য় খণ্ড) আর শীয়া সম্প্রদায়ের জন্য আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী প্রণীত শরহে লুম'আহ

---

[১৩]. আব্দুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩

[১৪]. *A.N. Waheed's note for A. Earle conference*, pp. 1-2,

(ইবাদাত অংশ) পাঠ্য ছিল। উসূলুল ফিক্‌হ বিষয়ে সুন্নী সম্প্রদায়ের জন্য পাঠ্য ছিল তাওযীহ (২য় অধ্যায়)। ৫ম বর্ষে ফিকহ শাস্ত্রে বুরহানুদ্দীন আল-মারগীনানী প্রণীত হিদায়া (৪র্থ খণ্ড) সুন্নী সম্প্রদায়ের জন্য এবং আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী প্রণীত শরহে লুম'আহ (পূর্ণাঙ্গ) শীয়া সম্প্রদায়ের জন্য পাঠ্য ছিল। উসূলুল ফিক্‌হ শাস্ত্রে সুন্নী সম্প্রদায়ের জন্য মুহিব্বুল্লাহ আল বিহারী প্রণীত মুছাল্লামুছ ছুবূত এবং শীয়া সম্প্রদায়ের জন্য কাওয়ানীন নামক গ্রন্থ সিলেবাসভুক্ত ছিল।[১৫]

উক্ত সিলেবাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, সিনিয়র স্তরের বিভিন্ন শ্রেণিতে ফিক্‌হ ও উসূলুল ফিক্‌হ শাস্ত্রের প্রামাণ্য কিতাবসমূহ পাঠ্যভুক্ত করা হয়েছে। তবে কিতাবের কোন কোন পাঠ পাঠ্যভুক্ত তার উল্লেখ নেই। এমনকি একই কিতাবের বিভিন্ন খণ্ড বিভিন্ন শ্রেণিতে পাঠ্যভুক্ত থাকলেও কোন কোন শ্রেণিতে কোন কোন পাঠ সিলেবাসভুক্ত ছিল তারও উল্লেখ নেই।

টাইটেল কোর্সে ফিক্‌হ শাস্ত্র

আর্ল কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯০৮ সালে অত্র প্রতিষ্ঠানে সর্বপ্রথম ৩ বছর মেয়াদী টাইটেল কোর্স শুরু হয়। তখনকার সিলেবাসে হাদীস, ফিক্‌হ, আরবী ও দর্শন এই চারটি বিষয়ে টাইটেল কোর্সের অনুমোদন দেয়া হয়। এ সকল বিষয়ের ১ম বর্ষে সম্মিলিত (combined) সিলেবাস অনুসরণ করা হত। ফিক্‌হ ১ম বর্ষে (combined syllabus) ফিক্‌হ সম্পর্কযুক্ত 'আকাইদ বিষয়ে সুন্নী সম্প্রদায়ের জন্য ১০০ নম্বরে শায়খ আহমাদ সেরহিন্দ প্রণীত আকাইদে জালালী এবং শীয়া সম্প্রদায়ের জন্য তানযীহুল আম্বিয়া। ফিকহ ২য় বর্ষে সুন্নী সম্প্রদায়ের জন্য ১০০ নম্বরে বুরহানুদ্দীন আল-মারগীনানী প্রণীত হিদায়া (১ম ও ২য় খণ্ড) এবং উসূলুল ফিক্‌হ বিষয়ে সুন্নী সম্প্রদায়ের জন্য ১০০ নম্বরে ইবনুল হুমাম প্রণীত আত-তাহরীর এবং শীয়া সম্প্রদায়ের জন্য ১০০ নম্বরে শায়খ মুরতাজা প্রণীত রাসাইলুশ শায়খ মুরতাজা (১ম অংশ) পড়ানো হতো। ফিক্‌হ ৩য় বর্ষে ফিক্‌হ বিষয়ে হিদায়া (৩য় ও ৪র্থ খণ্ড) ও ফাতহুল কাদীর (৩য় ও ৪র্থ খণ্ড) এবং উসূলুল ফিক্‌হ বিষয়ে সুন্নী সম্প্রদায়ের জন্য ১০০ নম্বরে ফখরুল ইসলাম বাযদাবি প্রণীত উসূলে বাযদাবি ও শীয়া সম্প্রদায়ের জন্য ১০০ নম্বরে শায়খ মুরতাজা প্রণীত রাসাইলুশ শায়খ মুরতাজা (২য় অংশ) পড়ানো হতো।[১৬]

টাইটেল কোর্স পর্যালোচনায় দেখা দেখা যায়, এখানেও শীয়া ও সুন্নী সম্প্রদায়ের জন্য আলাদা আলাদা কিতাব সিলেবাসভুক্ত ছিল এবং পূর্বানুরূপ কোন কোন অধ্যায়

---

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১-২

১৬. ড. শরীফা সুলতানা হাসানাত, *মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার সোয়া দু'শ বছরের ইতিহাস (১৭৮০–২০০৫)*, এম. ফিল গবেষণা কর্ম, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, ২০০৭, পৃ. ৬৮-৬৯

পাঠ্যসূচিতে ছিল তারও উল্লেখ নেই। পরীক্ষার মোট নম্বর ১০০ জানা গেলেও পরীক্ষার সময়কাল কত ছিল জানা যায়না। তৎকালীন সময়ে টাইটেল কোর্সের পাশ নম্বর ছিল ৭০। তিন বছর পর সেন্টার পরীক্ষায় দেখা গেল যে, এক দু' নম্বরের জন্য কোন পরীক্ষার্থীই ৭০ নম্বর পাচ্ছে না। শুধু তাই নয় ১৯০৮ সাল হতে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৭ বছর পর্যন্ত একজন শিক্ষার্থীও উত্তীর্ণ হতে পারেনি। শিক্ষা বিভাগ হতে এর কৈফিয়ত জানতে চাওয়া হলে মাদরাসা কর্তৃপক্ষ জানালেন যে, শতকরা ৭০ নম্বর পাশ নম্বর নির্ধারণ করা যুক্তিযুক্ত হয়নি। বিশ্বের কোথাও ৭০ নম্বর পাশ নম্বর হিসাবে ধর্তব্য হয় না। মাদরাসা কমিটির সুপারিশ মতে পাশের হার ৫০ নম্বর ধার্য করা হলে ১৯১৫ সালে মাত্র দু'জন শিক্ষার্থী টাইটেল পাশ করেন।[১৭]

এ. এন. ওয়াহিদের রিপোর্টে ফিক্হ শাস্ত্র

১৯০৮ সালে ২২ এপ্রিল শামসুল উলামা আবূ নছর ওয়াহিদ মাদরাসা-ই-আলিয়ার সিলেবাস প্রণয়ন করে ভারতের কোলকাতায় অনুষ্ঠিত আর্ল কনফারেন্সের ২য় সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, দরসে নিযামিয়ার উপর ভিত্তি করে এ সিলেবাস তৈরি করা হয়েছে। সেখানে তিনি ফিক্হ শাস্ত্র সম্পর্কেও বিশেষ মন্তব্য করেন। তিনি বলেন–

> The madrasah course now framed and laid us is in a sense based on the Nizamiah system hundred of years old, that obtained in the Nizamiah Collaeg at Bagdad founded in 1067 A.B. It was originally designed to propagate the Asharite system of theolegy. The Nizamiah system embraced a full course of studies in Arabic literature, Grammar, Law, Principles of Law, Hadith, Tafsir, Theology, Rhetorie, Aristotelion system of Logic, Dilecties, Philosophy and Mathematics.[18]

তিনি তাঁর প্রণীত সিলেবাসে জুনিয়র/সিনিয়র, এ্যাংলো ওরিয়েন্টেড এবং সিনিয়র ডিপার্টমেন্ট ওরিয়েন্টেড এ তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। সেখানে তিনি এ্যাংলো ওরিয়েন্ট সিনিয়র গ্রুপ-এর ৮ম থেকে ১১শ শ্রেণির জন্য ফিক্হ ও উসূলুল ফিক্হ-এর প্রতিটির ক্ষেত্রে ২ টি করে সাপ্তাহিক পিরিয়ড বরাদ্দ করেছেন। অন্যদিকে ওরিয়েন্ট সিনিয়র গ্রুপের ৮ম ও ৯ম শ্রেণির জন্য ফিক্হ ও উসূলুল ফিক্হ-এর প্রতিটির ক্ষেত্রে ২ টি করে এবং ১০ম ও ১১শ শ্রেণির জন্য ফিক্হ ও উসূলুল ফিক্হ-এর প্রতিটির ক্ষেত্রে

---

১৭. মাওলানা মমতাজ উদ্দিন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

১৮. *A.N. Waheeds note for A. Earle Conference 1907*, pp. 1-2

৩ টি করে সাপ্তাহিক পিরিয়ড বরাদ্দ করেছেন। এখানে লক্ষণীয় যে, ওরিয়েন্ট সিনিয়র গ্রুপের কোর্সের ১০ম ও ১১শ ক্লাশের সংখ্যা ২ থেকে ৩ এ উন্নীত করা হয়।[১৯]

শামছুল হুদা কমিটির (১৯২৮) রিপোর্টে ফিক্হ শাস্ত্র

মাদরাসা শিক্ষার সিলেবাস ব্যাপক পরিবর্তন করে আরো যুগোপযোগী করার জন্য ১৯২১ সালে শামছুল হুদা কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটি ১৯২২ সালের আগস্ট মাসে একটি মানসম্মত সিলেবাসসহ একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ১৯২৮ সালের জানুয়ারি মাসে তৎকালীন সরকার একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে এবং ১৯২৮/২৯ সাল থেকে এ সিলেবাস চালু করে।[২০] বিশ্লেষণে দেখা যায়, উক্ত সিলেবাসের ১ম থেকে ৪র্থ বর্ষ পর্যন্ত ফিক্হ শাস্ত্রের কোন পাঠ ও পঠন সিলেবাসভুক্ত ছিল না। উক্ত সিলেবাসের জুনিয়র স্তরের ৫ম ও ৬ষ্ঠ পর্বে ফিক্হ শাস্ত্র পাঠ্যভুক্ত করা হয়। উল্লেখ্য, এ কমিটির রিপোর্টে কামিল ৩ বছরের কোর্সকে সংক্ষিপ্ত করে ২ বছরের কোর্স করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৫ম বর্ষে শায়খ দাউদ ইবনু আবদিল্লাহ আল-ফাতানী প্রণীত মুনিয়্যাতুল মুসল্লী ও আবূ হামিদ আল-গাযালী প্রণীত বিদায়াতুল হিদায়া, ৬ষ্ঠ বর্ষে শুধু শায়খ ইবনু আবদিল্লাহ আল-ফাতানী প্রণীত মুনিয়্যাতুল মুসল্লী গ্রন্থ পড়ানো হতো।[২১]

এভাবে সিনিয়র স্তরের ১ম বর্ষে ফিকহ বিষয়ে ওবায়দুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ প্রণীত শারহুল বিকায়া, উসূলুল ফিকহ বিষয়ে শায়খ হাফিয আহমদ বিন আবূ সাঈদ প্রণীত নূরুল আনওয়ার এবং ফারাইয বিষয়ে সিরাজুদ্দীন প্রণীত সিরাজী পড়ানো হতো। ২য় বর্ষে ফিক্হ বিষয়ে শারহুল বিকায়া, উসূলুল ফিকহ বিষয়ে শায়খ হাফেজ আহমদ বিন আবূ সা'ঈদ প্রণীত নূরুল আনওয়ারসহ মুহাম্মদ ইব্ন আল হোসাইন প্রণীত যুবদাতুল উসূল ইত্যাদি গ্রন্থাবলি পড়ানো হতো। ৩য় বর্ষে ফিক্হ বিষয়ে বুরহানুদ্দীন আল-মারগীনানী প্রণীত হিদায়া ও উসূলুল ফিক্হ বিষয়ে তাওযীহ, শরহুত তাহযীব, মুহাম্মদ ইব্ন হুসাইন জীযানী প্রণীত মায়ালিমু উসূলুল ফিক্হ নামক গ্রন্থাবলি সিলেবাসভুক্ত ছিল। ৪র্থ বর্ষে ফিক্হ বিষয়ে হিদায়া এবং উসূলুল ফিক্হ বিষয়ে মায়ালিমু উসূলুল ফিক্হ নামক গ্রন্থ সিলেবাসভুক্ত ছিল।

পর্যালোচনায় দেখা যায়, ১৯২৮ সালের সিলেবাসে জুনিয়র স্তরের ৫ম ও ৬ষ্ঠ বর্ষে মুনিয়্যাতুল মুসল্লী পাঠ্যভুক্ত করা হয়েছে। এভাবে সিনিয়র স্তরের ১ম ও ২য় বর্ষে শরহুল বিকায়া এবং ৩য় ও ৪র্থ বর্ষে হিদায়া ও মায়ালিমু উসূলুল ফিক্হ পাঠ্যভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু কোন বর্ষে কোন কোন পাঠ পাঠ্যভুক্ত আছে তা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়নি।

---

১৯. ড. শরীফা সুলতানা হাসানাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১-৭২

২০. *Bengal Education code 1931*, p. 298

২১. ibid

টাইটেল কোর্সের ফিক্হ বিভাগের ১ম বর্ষে ফিক্হের দুররুল মুখতার, উসূলুল ফিক্হের ইবনু নুজাইম মিসরী রচিত আল-আশবাহ্ ওয়ান নাযাইর, ইমাম তাফতাযানী রচিত আত-তালবীহ্সহ অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে শারহুল মাকাসিদ, আল-মাফাতিহ্, শারহুত তাহযীব ও আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রচিত শরহে লুমআহ পাঠ্য ছিল। ২য় বর্ষে দুররুল মুখতার, আল-আশবাহ্ ওয়ান নাযাইর, ফখরুল ইসলাম আল-বাযদাবী রচিত উসূলুল বাযদাবী ও সৈয়দ আশ-শরীফ আল-জুরজানী রচিত শরহুল মাওয়াকিফ পড়ানো হতো। তবে উক্ত বিষয়সমূহের পাঠ জানা যায়নি। ১৯৪৭ সালের জুলাই পর্যন্ত মাদরাসা-ই-আলিয়ার উক্ত সিলেবাস ফিক্হ শাস্ত্রের জন্য চালু ছিল।[২২]

স্বাধীনতাপূর্ব তথা বৃটিশ আমলের দীর্ঘ ১৬৭ বৎসরের সিলেবাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিভিন্ন শ্রেণিতে ফিক্হ শাস্ত্রের পঠন-পাঠনে বেশ গতি পেয়েছে। আবার কখনো দেখা গেছে, এই শাস্ত্রের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়নি। যেমন আর্ল কন্ফারেন্সের রিপোর্টে উক্ত বিষয়ের জন্য সপ্তাহে কতদিন এবং কয়টি পিরিয়ড বরাদ্দ রাখা হয়, তার উল্লেখ নেই। পরবর্তীতে জুনিয়র ও সিনিয়র বিভিন্ন স্তরে এবং টাইটেল কোর্সের বিভিন্ন বর্ষে উচ্চমানের কিতাবাদি সন্নিবেশ করা হয়েছে।

সিলেবাস পর্যালোচনায় আরো জানা যায় যে, একই কিতাব বিভিন্ন বর্ষে পাঠ্যভুক্ত করা হয়েছে। যেমন হিদায়া, শারহুল বিকায়া, মুনিয়্যাতুল মুসল্লী, মুসাল্লাবুছ ছুবূত ইত্যাদি। তবে এসকল কিতাবের কোন কোন অধ্যায়/পরিচ্ছেদ কোন কোন বর্ষে/শ্রেণিতে পাঠ্যভুক্ত করা হয়েছে তা উল্লেখ করা হয়নি। এমনকি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের ধরন, মানবন্টন, মোট নম্বর ও পরীক্ষার সময়কাল মোট কত ঘন্টা তারও উল্লেখ নেই।

আরো লক্ষণীয় যে, তৎকালীন সময়ে শীয়া ও সুন্নীদের জন্য পৃথক পৃথক ফিক্হ ও 'আকাইদের কিতাব পাঠ্যভুক্ত করা হয়েছিল, যা ১৯২৮ সালে শামছুল হুদা প্রণীত শিক্ষা রিপোর্ট উপস্থাপন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত চালু ছিল। তৎকালীন পাক ভারত উপমহাদেশে শীয়া ও সুন্নীদের বেশ প্রভাব ছিল বিধায় তখন আলাদা করে ফিক্হ ও 'আকাইদের কিতাব পাঠ দান করার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। পরবর্তীকালে এদেশ থেকে শীয়াদের প্রভাব কমে গেলে পাঠ্য তালিকা থেকে তাদের ফিক্হি কিতাবাদি বাদ পড়ে।

বৃটিশ-উত্তর যুগ (১৯৪৭-১৯৭৫)

১৯৪৩ সালের ৪ জুলাই ১৭২২ নম্বর শিক্ষা পত্রে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী সৈয়দ মুয়াজ্জিম উদ্দিন হোসেনের সভাপতিত্বে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি মাদরাসা সিলেবাস কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটিকে ওল্ড এবং নিউ স্কিম উভয় শ্রেণির জন্য সংশোধিত সিলেবাস প্রণয়ন করার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। কমিটি একটি সিলেবাস প্রণয়ন করে

---

২২. ibid, pp. 1-9

সরকারের নিকট উপস্থাপন করে। বেঙ্গল গভর্নমেন্ট ১৯৪৭ সালের ৪ জুলাই ১৯৯০ নম্বর শিক্ষাপত্রে এ কমিটির রিপোর্ট বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করে। সে অনুযায়ী ১৯৪৭ সালের ১ জুলাই হতে এ সিলেবাস কার্যকর হয়।[২৩]

ঢাকায় মাদরাসা স্থানান্তর

১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসেই দেশ ভাগাভাগি হয়ে যায়। পাকিস্তান নামে একটি আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্ববাংলা (বর্তমান বাংলাদেশ) পাকিস্তানের অংশে চিহ্নিত হয়। ঢাকা পূর্ববাংলার রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। দেশ বিভাগের মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ অফিস আদালত ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ভাগবণ্টন সম্পর্কে সকলেই অস্থিরচিত্ত ছিলেন। এই জটিল সময়ে আলিয়া মাদরাসা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হয়। শিক্ষা দফতর কর্তৃক গঠিত একটি কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে মাদরাসাকে ঢাকায় স্থানান্তর করার ব্যবস্থা করা হয় এবং মাদরাসার তৎকালীন অধ্যক্ষ খান বাহাদুর জিয়াউল হকের প্রাণান্তকর চেষ্টায় মাদরাসাটি ঢাকাতে স্থানান্তরিত হয়। কমিটির সিদ্ধান্ত হয় যে, মাদরাসার এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগ কলিকাতাতেই থাকবে এবং আরবী বিভাগ ঢাকায় স্থানান্তরিত হবে।[২৪]

এ কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী– ক) ইবতিদায়ী (প্রাথমিক স্তর) ৪ বছর, খ) দাখিল ৪ বছর, গ) আলিম ৪ বছর, ঘ) ফাযিল ২ বছর, ঙ) কামিল ২ বছর করা হয়। লক্ষ্য করা যায়, ইবতিদায়ীর ৪র্থ বর্ষে দীনিয়াত নামক একটি কিতাব পাঠ্যভুক্ত ছিল যার মধ্যে ফিক্‌হ শাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয়াবলি সন্নিবেশিত ছিল। এভাবে দাখিলের ৪ বর্ষেও ফিক্‌হশাস্ত্র আলাদা বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত ছিল। অনুরূপভাবে আলিমের ৪ বর্ষেও ফিক্‌হ, উসূলুল ফিক্‌হ ও ফারা'ইযের বিভিন্ন পাঠ সিলেবাসভুক্ত ছিল। এভাবে ফাযিলের ২ বর্ষে ফিক্‌হ ও উসূলুল ফিক্‌হ সিলেবাসভুক্ত ছিল। এভাবে কামিল ফিক্‌হ বিভাগের জন্য ২ বৎসর মেয়াদি একটি কোর্স চালু ছিল। এ কোর্সের বিষয়াবলির মধ্যেও ফিক্‌হ, উসূলুল ফিক্‌হ, ফিক্‌হ শাস্ত্রের ইতিহাস ও ইফতা অন্তর্ভুক্ত ছিল।

উল্লেখ্য, এ সকল শ্রেণিতে বিষয় হিসাবে ফিক্‌হ ও উসূলুল ফিক্‌হ ইত্যাদি উল্লেখ আছে। কিন্তু উক্ত বিষয়ের কোন কোন পাঠ বা পরিচ্ছেদ সিলেবাসভুক্ত ছিল তা বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়নি। এই সিলেবাস মাদরাসা-ই-আলিয়াসহ দেশের সকল মাদরাসায় ১৯৪৭ সালের জুলাই হতে চালু হয়ে সামান্য পরিবর্তনসহ ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত চালু থাকে।[২৫]

---

২৩. *Report of the Madrasah Syllabus (Muazzamuddin) Committee*, 1949-47, pp. 25-42

২৪. আব্দুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩-২০৪

২৫. *Report of the Madrasah Syllabus (Muazzamuddin) Committee, 1949-47*, pp. 25-42

শামছুল হক কমিটি (১৯৭৫-১৯৮৫)

১৯৭৫ সালের ২২ অক্টোবর বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর মোঃ শামছুল হককে প্রধান করে তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার ৪৭ সদস্যের একটি জাতীয় কারিকুলাম কমিটি গঠন করে উক্ত কমিটি বিভিন্ন স্তরের সিলেবাস ও কারিকুলাম তৈরি করার জন্য বেশ কয়েকটি সাবকমিটি গঠন করে। এর আওতায় মাদরাসা সিলেবাস প্রণয়ন করার জন্যও একটি সাবকমিটি গঠন করা হয়। উক্ত সাবকমিটি মাদরাসা শিক্ষার প্রচলিত সিলেবাস ও কারিকুলাম পরীক্ষা করে ১৯৭৫ সালে নতুন একটি সিলেবাস প্রণয়ন করে। কমিটি নতুন কারিকুলাম ও এর আলোকে প্রণীত সিলেবাসকে অনুমোদন করে।[২৬]

১৯৭৬ সাল থেকে মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় দাখিল স্তরে ৬ বৎসরের কোর্স চালু হয়। অন্যান্য স্তর যেভাবে ছিল সেভাবেই থেকে যায়। এই কারিকুলাম ১৯৮৪ সালে মাদরাসার সেকিউলার বিষয়গুলো আরো একধাপ উন্নীত করে স্কুলের শিক্ষার সঙ্গে এক করে দেয়া হয়। যার ফলে মাদরাসার দাখিল পরীক্ষা সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমিক পরীক্ষার সমমান লাভ করে। সে ক্ষেত্রে একজন ছাত্র দাখিল পাশ করে কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ১ম বর্ষে ভর্তি হওয়ার সুযোগ লাভ করে। এভাবে মাদরাসায় আলিম পাশ করে একজন ছাত্র কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণিতে ভর্তি হওয়ার সুযোগ লাভ করে। অবশ্য এ হিসাবে মাদরাসার ফাযিল পাশ করলেও স্নাতক ডিগ্রীর সমান হওয়ার কথা, কিন্তু তখন তা ঐ মানের গণ্য করা হয়নি। যদিও ঐ পর্যায়ে ডিগ্রী স্তরের সিলেবাস পড়ানো হত।[২৭]

১৯৭৫ সালে প্রণীত সিলেবাস অনুযায়ী ১. ইবতিদায়ী (প্রাথমিক স্তর) ৪ বছর, ২. দাখিল স্তর ৬ বছর, ৩. আলিম (মানবিক) ২ বছর, আলিম (বিজ্ঞান) ২ বছর, ৪. ফাযিল (মানবিক) ২ বছর, ফাযিল (বিজ্ঞান) ২ বছর, ৫. কামিল হাদীস/ তাফসীর/ ফিক্‌হ/ আদব ২ বছর করা হয়।[২৮]

উপরোল্লিখিত সিলেবাস অনুযায়ী ইবতিদায়ী স্তরের ৪ শ্রেণিতেই ফিক্‌হ শাস্ত্র হিসাবে দীনিয়াত নামক বই পাঠ্যভুক্ত ছিল।[২৯] দাখিল স্তরের ছয় শ্রেণিতেই ফিক্‌হ ও উসূলুল ফিক্‌হের বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত বই পাঠ্য ছিল।[৩০]

দাখিল নবম ও দশম শ্রেণিতে ফিক্‌হ বিষয়ে পাঠ্য বই ছিল আবুল হুসাইন আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ রচিত মুখতাসারুল কুদূরী ও উসূলুল ফিক্‌হ বিষয়ে পাঠ্য বই ছিল

---

২৬. ড. শরীফা সুলতানা হাসানাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

২৮. বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের ১৯৭৫ সালের সকল শ্রেণির সিলেবাস

২৯. বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের ইবতেদায়ি স্তরের ১৯৭৫ সালের সিলেবাস

৩০. বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের দাখিল শ্রেণির ১৯৭৫ সালের সিলেবাস

আল্লামা নিযামুদ্দিন আশ-শাশী আল হানাফী রচিত উসূলুশ শাশী। বোর্ড পরীক্ষায় ফিক্‌হ ও উসূলুল ফিক্‌হ দু'টি মিলে মোট নম্বর ছিল ১০০।

আলিম (মানবিক) ১ম ও ২য় বর্ষে ফিক্‌হ বিষয়ে পাঠ্য বই ছিল 'উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ রচিত শারহুল বিকায়া ও উসূলুল ফিক্‌হ বিষয়ে পাঠ্য বই ছিল শায়খ হাফিয আহমাদ বিন আবূ সা'ঈদ ওরফে মোল্লা জীওয়ান রচিত নূরুল আনওয়ার। আলিম (বিজ্ঞান) ১ম ও ২য় বর্ষে বাধ্যতামূলক হিসেবে ফিক্‌হ বিষয়ে পাঠ্য বই ছিল শারহুল বিকায়া ও অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে উসূলুল ফিক্‌হ বিষয়ে পাঠ্য বই ছিল নূরুল আনওয়ার।[৩১] ফাযিল (মানবিক) ১ম ও ২য় বর্ষে ফিক্‌হ বিষয়ে পাঠ্য বই ছিল হিদায়া ও তারিখু ইলমিল ফিক্‌হ এবং উসূলুল ফিক্‌হ বিষয়ে পাঠ্য বই ছিল নূরুল আনওয়ার। ফাযিল (বিজ্ঞান) শাখায় ফিক্‌হ শাস্ত্র পাঠ্য তালিকায় রাখা হয়নি।[৩২]

কামিল ফিক্‌হ বিভাগে মোট ১০ টি পত্রে প্রতিটি ১০০ নম্বরে যেসব গ্রন্থ পড়ানো হতো সেগুলোর তালিকা নিম্নরূপ : ১. হাদীস ১ম পত্র : মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল বুখারী প্রণীত সহীহুল বুখারী (১খণ্ড পূর্ণাঙ্গ), ২. হাদীস ২য় পত্র : সহীহুল বুখারী (২য় খণ্ড পূর্ণাঙ্গ), ৩. ফিক্‌হ ৩য় পত্র : আবূ জা'ফর আত-তাহাবী প্রণীত শারহু মা'আনিল আছার, ৪. ফিক্‌হ ৪র্থ পত্র : ইব্‌ন নুজাইম মিসরী প্রণীত আল-আশবাহ্ ওয়ান নাযাইর, ৫. ফিক্‌হ ৫ম পত্র (কালাম ১ম) : সৈয়দ আশ-শরীফ আল-জুরজানী প্রণীত শারহুল মাওয়াকিফ, ৬. ফিক্‌হ ৬ষ্ঠ পত্র (কালাম ২য়) : শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী প্রণীত হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, ৭. ফিক্‌হ ৭ম পত্র (উসূলুল ফিক্‌হ ১ম) : ফখরুল ইসলাম আল-বাযদাবী প্রণীত উসূলুল বাযদাবী (১ম ও ২য় খণ্ড), ৮. ফিক্‌হ ৮ম পত্র (উসূলুল ফিক্‌হ ২য়) : ফখরুল ইসলাম আল-বাযদাবী প্রণীত উসূলুল বাযদাবী (৩য় ও ৪র্থ খণ্ড), ৯. ফিক্‌হ ৯ম পত্র : ইসলামের ইতিহাস ১ম পত্র প্রাচীন যুগ, ১০. ফিক্‌হ ১০ম পত্র : ইসলামের ইতিহাস ২য় পত্র আধুনিক যুগ।[৩৩] মাদরাসা-ই-আলিয়াসহ দেশের সকল আলিয়া মাদরাসায় ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত এই সিলেবাস বহাল থাকে।

১৯৮৫ সালের সিলেবাসে ফিক্‌হ শাস্ত্র

ইবতিদায়ী ও দাখিল শ্রেণির সিলেবাসে ফিক্‌হ শাস্ত্র

শিশু শ্রেণিতে ফিক্‌হ শাস্ত্রের কোন বই পাঠ্যভুক্ত ছিল না। ইবতিদায়ী ১ম-৪র্থ শ্রেণি পর্যন্ত আকাইদ ও ফিক্‌হ এই নামে একটি কিতাব পাঠ্যভুক্ত ছিল।[৩৪] অনুরূপভাবে

৩১. বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের ১৯৭৫ সালের আলিমের সিলেবাস

৩২. বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের ১৯৭৫ সালের ফাযিলের সিলেবাস

৩৩. বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের ১৯৭৫ সালের কামিল ফিকহ বিভাগের সিলেবাস

৩৪. মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের ইবতেদায়ী শ্রেণির পাঠ্য তালিকা- ১৯৮৫ খ্রী.

দাখিল ৫ম হতে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত আকাইদ ও ফিক্‌হ শাস্ত্রের আরো উচ্চতর পাঠ সিলেবাসভুক্ত করা হয়। কিন্তু তখন পর্যন্ত ফিক্‌হ ও 'আকাইদ বিষয়ের কোন্ কোন্ পাঠ বা পরিচ্ছেদ সিলেবাসভুক্ত ছিল তা জানা যায় না।[৩৫]
এভাবে দাখিল ৯ম ও ১০ম শ্রেণির মানবিক, বিজ্ঞান, মুজাব্বিদ ও হিফযুল কুরআন বিভাগে ফিক্‌হ হিসাবে আবুল হুসাইন আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ প্রণীত মুখতাসারুল কুদূরী এবং উসূলল ফিক্‌হ হিসাবে আল্লামা নিযামুদ্দিন আশ-শাশী আল-হানাফী প্রণীত উসূলুশ শাশী গ্রন্থদ্বয় পাঠ্য ছিল।[৩৬] তবে গ্রন্থদু'টির কোন কোন অংশ পড়ানো হতো তা সিলেবাসে উল্লেখ নেই।

আলিমের (মানবিক) ২ বৎসরের কোর্সের সিলেবাসে ফিক্‌হ শাস্ত্র

এভাবে আলিম ২ বৎসরের কোর্সে মানবিক ও মুজাব্বিদ গ্রুপে ফিক্‌হ ১ম পত্র এবং উসূলুল ফিক্‌হ ও ফারাইয ২য় পত্র হিসাবে পাঠ্যভুক্ত ছিল। কিন্তু আলিম বিজ্ঞান বিভাগে শুধু ফিক্‌হ (মানবিক বিভাগের অনুরূপ) পাঠ্যভুক্ত ছিল। তবে অতিরিক্ত বিষয় হিসাবে উসূলুল ফিক্‌হ (২য় পত্র) পাঠ্যভুক্ত ছিল।

এ স্তরে ফিক্‌হ (১ম পত্র) হিসাবে পাঠ্য ছিল 'উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মাস'উদ প্রণীত শারহুল বিকায়া-এর হজ্জ, নিকাহ, তালাক, যাবা'ইহ ও জিহাদ অধ্যায়সমূহ এবং উসূলল ফিক্‌হ (২য় পত্র) হিসাবে পাঠ্য ছিল শায়খ হাফিয আহমদ বিন আবু সা'ঈদ প্রণীত নূরুল আনওয়ার–এর কিতাবুল্লাহ, সুন্নাত, ইজমা' অধ্যায়সমূহ। তাছাড়া ফারাইয বিষয়ে পাঠ্য ছিল সিরাজুদ্দীন প্রণীত সিরাজী গ্রন্থের উত্তরাধিকার আইন, বণ্টননামা অধ্যায়সমূহ। ফিক্‌হ ১ম পত্রের জন্য বোর্ড পরীক্ষায় মোট নম্বর বরাদ্দ ছিল ১০০ এবং উসূলুল ফিক্‌হ ও ফারাইয দুটি বিষয় মিলিয়ে মোট নম্বর বরাদ্দ ছিল ১০০।[৩৭]

ফাযিল (মানবিক) ২ বৎসরের কোর্সের সিলেবাসে ফিক্‌হ শাস্ত্র

ফাযিল (মানবিক) বিভাগে ফিক্‌হ ওয়া তারিখু ইলমিল ফিক্‌হ নামে পাঠ্য বই, হিদায়া-এর বুয়ূ', শুফআ, কারাহিয়া, আশরিবা, হিবা, ওসিয়্যত অধ্যায়সমূহ এবং ইলমুল ফিক্‌হ-এর উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, ফকীহদের স্তর, ইমাম চতুষ্টয়, আসবাবুল ইখতিলাফ ইত্যাদি বিষয়সমূহ পড়ানো হতো। উসূলুল ফিক্‌হ নামে পাঠ্য বই নূরুল আনওয়ার-এর সুন্নাত, ইজমা', কিয়াস, ইজতিহাদ, ইসতিহসান বিষয়সমূহ সিলেবাসভুক্ত ছিল। উভয় পত্রেই বোর্ড পরীক্ষায় মোট নম্বর ছিল ১০০ করে।[৩৮]

---

৩৫. ২০০০ সালের বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের দাখিল ৫ম শ্রেণি থেকে ৮ম শ্রেণির সিলেবাস
৩৬. ২০০০ সালের বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের দাখিল ৯ম ও ১০ম শ্রেণির সিলেবাস
৩৭. কারিকুলাম এন্ড টেকস্টবুক উইং, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা, ২০০০ সালের সিলেবাস, পৃ. ২৪
৩৮. প্রাগুক্ত, ফাযিল, ২০০৬ এর সিলেবাস, পৃ. ১২

ফাযিল (বিজ্ঞান) এর সিলেবাসে ফিক্‌হ্‌ কিংবা উসূলুল ফিক্‌হ্‌ শাস্ত্রের কোন বিষয় রাখা হয়নি।

কামিল (ফিকহ্‌) ২ বৎসরের কোর্সের সিলেবাসে ফিক্‌হ্‌ শাস্ত্র

ফিক্‌হ্‌ বিষয়ে কামিল-এ ৫ম পত্র (ফিকহ ১ম পত্র) নামে ইমাম আবূ জা'ফর আত-তাহাবী প্রণীত শারহু মা'আনিল আছার কিতাব (পূর্ণাঙ্গ) এবং ৬ষ্ঠ পত্র (ফিক্‌হ্‌ ২য় পত্র) নামে ইবনু নুজাইম মিসরী প্রণীত আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর গ্রন্থের আল-কাওয়াইদুল কুল্লিয়্যাহ (পূর্ণাঙ্গ) ও কিতাবুল কাযা (পূর্ণাঙ্গ) পাঠ্য ছিল। ৭ম পত্র (উসূলুল ফিক্‌হ্‌ ১ম পত্র) শিরোনামে ফখরুল ইসলাম আল-বাযদাবী প্রণীত উসূলুল বাযদাবী (১ম ও ২য় খণ্ড) ও উসূলুল কারখী (১ম ও ২য় খণ্ড, পূর্ণাঙ্গ) সিলেবাসভুক্ত ছিল। ৮ম পত্র (উসূলুল ফিক্‌হ্‌ ২য় পত্র) শিরোনামে উসূলুল বাযদাবী-এর ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড এবং মুফতী আমীমুল ইহ্‌সান-এর আদাবুল মুফতী পাঠ্য ছিলো। ১০ম পত্র (ইসলামের ইতিহাস ২য় পত্র আধুনিক যুগ) শিরোনামে ফিক্‌হ্‌ শাস্ত্রের ইতিহাস পড়ানো হতো। প্রত্যেক পত্রেই বোর্ড পরীক্ষায় মোট নম্বর ছিল ১০০ করে এবং সময় ছিল ৪ ঘণ্টা।[৩৯]

উল্লেখ্য, ১৯৮৫ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত ১ম শ্রেণি থেকে আলিম পর্যন্ত প্রায় একই রকম সিলেবাস বলবৎ ছিল। পরীক্ষা পদ্ধতি, প্রশ্নপত্রের ধরন ও সিলেবাসের কিছু পরিবর্তন বিভিন্ন সময়ে হয়েছে। এদিকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত ফাযিল ও কামিল শ্রেণির সিলেবাস মাদরাসা বোর্ডের অধীনেই ন্যস্ত ছিল। ২০০৭/০৮ সাল থেকে উক্ত শ্রেণিদ্বয় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত হয় এবং কর্তৃপক্ষ বি.এ. (B.A.) ও এম.এ. (M.A.) মানের সিলেবাস প্রণয়ন করে যা অদ্যাবধি চালু আছে।

২০১০ সালের নতুন শিক্ষানীতির আলোকে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের সিলেবাস

কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধনসহ উক্ত সিলেবাস দীর্ঘদিন মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে বাংলাদেশের সকল আলিয়া মাদরাসায় চালু ছিল। ২০১০ সালে প্রণীত নতুন শিক্ষানীতির আলোকে ১ম শ্রেণি থেকে আলিম স্তর পর্যন্ত নতুন সিলেবাস প্রণয়ন করা হয়। এতে ফিক্‌হ্‌ শাস্ত্রের ক্ষেত্রেও কিছু কিছু পরিবর্তন আনা হয়। তবে আলিম স্তরের সিলেবাস পূর্বানুরূপ বহাল রাখা হয়।

২০০৮ সাল থেকে মাদরাসার ফাযিল ও কামিল শ্রেণিসমূহকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার অধীনে ন্যস্ত করা হয়। তখন থেকে ফাযিল শ্রেণি ৩ বৎসর মেয়াদী বি.এ/ বি.এস.সি/ বি.এস.এস/ বি.টি.আই (পাস) কোর্স চালু করে এবং নতুন সিলেবাস প্রণয়ন করে। এভাবে কামিল শ্রেণিকে এম.এ. মান দেয়া হয়, যা দীর্ঘ ১০০ বছর যাবৎ উপেক্ষিত ছিল। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বর্তমানে আল-কুরআন এ্যান্ড

---

[৩৯] শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি, কামিল পরীক্ষা-২০০৬, কারিকুলাম এন্ড টেকস্টবুক উইং, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড , ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ১−২০

ইসলামিক স্টাডিজ এবং আল হাদীস এ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ ৪ বছরের অনার্স কোর্স চালু করে। তবে এখনো ফিক্‌হ বিষয়ের কোন অনার্স কোর্স চালু হয়নি।

পূর্বের সিলেবাস অনুযায়ী ১ম শ্রেণি থেকে দাখিল ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত গতানুগতিক ধারায় ১০০ নম্বরের রচনামূলক প্রশ্নোত্তর ধারায় ছিল। স্কুলের শিক্ষা ধারার সাথে মিল রাখতে যেয়ে ৯৬/৯৭ সাল থেকে প্রতি বিষয়ে ২০ নম্বরের বহু নির্বাচনী প্রশ্নোত্তর ব্যবস্থা চালু করে। উক্ত ধারাকে আরো গতিশীল করে ২০০৪ সালে ৩৫টি বহুনির্বাচনী প্রশ্ন থেকে ২৫টি প্রশ্নোত্তর (২৫×২=৫০) ধারা চালু করে। বর্তমানে ফিক্‌হ শাস্ত্রে উক্ত ধারা চালু আছে। বর্তমানে কোন কোন বিষয়ে সৃজনশীল ধারা চালু করা হয়েছে। সেখানে ৬০ নম্বর সৃজনশীল ও ৪০ নম্বরে বহুনির্বাচনী (M.C.Q) ব্যবস্থায় O.M.R পদ্ধতি ব্যবহার করে পরীক্ষার ধারা চালু আছে।

২০১০ সাল থেকে ৮ম শ্রেণিকে জে.ডি.সি (জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকিট) কোর্স হিসেবে গণ্য করে বোর্ডের অধীনে ১ম সার্টিফিকেট পরীক্ষা চালু করে। বর্তমান শিক্ষানীতির আলোকে ১ম শ্রেণি থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত ফিক্‌হ শাস্ত্রটি 'আকাইদ ও ফিকহ নামে পাঠ্যভুক্ত আছে।

ইবতিদায়ী ১ম শ্রেণিতে 'আকাইদ ও ফিক্‌হ শিরোনামের পাঠ্য বই থেকে ঈমান, নবী-রাসূল, ইসলাম ও কুরআন মাজীদ ওযূ ও গোসল, আযান ও নামায, আখলাক ও দুয়া ইত্যাদি বিষয়াবলি,[৪০] ২য় শ্রেণিতে 'আকাইদ ও ফিক্‌হ শিরোনামের পাঠ্য বই থেকে ঈমান, নবী-রাসূল, আসমানী কিতাব ও ফেরেশতা, তাহারাত, ওযূ, আযান-সালাত, আখলাক ও দুয়া বিষয়াবলি,[৪১] ৩য় শ্রেণিতে একই শিরোনামের পাঠ্য বই থেকে 'আকাইদ, তাওহীদ, ঈমান ও আল-আসমাউল হুসনা, নবী-রাসূল, আসমানী কিতাব, ফেরেশতা-আখিরাত, তাহারাত, আখলাক ও দুয়া বিষয়াবলি,[৪২] ৪র্থ শ্রেণিতেও একই শিরোনামের পাঠ্য বই থেকে আকাইদ, ঈমান, নবী-রাসূল, কুরআন মাজীদ, ফেরেশতা, আখিরাত, কিয়ামত, তাকদীর, তাহারাত, সালাত, সাওম, যাকাত, হজ্জ, আখলাক ও দুয়া বিষয়াবলি,[৪৩] ৫ম শ্রেণিতেও 'আকাইদ ও ফিক্‌হ শিরোনামের পাঠ্য বই থেকে ঈমান, ইসলাম, শিরক, কুফর, ফরয, ওয়াজিব, হালাল, হারাম, ওযূ, গোসল, ইবাদাত, দুই 'ঈদের নামায, যাকাত, হজ্জ, চার ইমাম, দুয়া ও মুনাজাত বিষয়াবলি[৪৪] পাঠ্যভুক্ত রয়েছে।

---

৪০. ড. নজরুল ইসলাম আল মারুফ, আ.ন.ম. মাহবুবুর রহমান ও মোহাম্মদ নাজমুল হুদা খান, *আকাইদ ও ফিকহ,* ইবতেদায়ি প্রথম শ্রেণি, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড , ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৩-৪

৪১. প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় শ্রেণি, পৃ. ৩-৪

৪২. প্রাগুক্ত, তৃতীয় শ্রেণি, পৃ. ৩-৪

৪৩. আবূ সালেহ মোঃ কুতবুল আলম, আবূ জাফর মোহাম্মদ নুমান ও মোহাম্মদ নাজমুল হুদা খান, *আকাইদ ও ফিকহ,* চতুর্থ শ্রেণি, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা, ২০১৩ পৃ. ৩-৪

৪৪. প্রাগুক্ত, পঞ্চম শ্রেণি, পৃ. ৩-৪

ষষ্ঠ শ্রেণিতে আল-'আকাইদ ওয়াল ফিক্‌হ শিরোনামের পাঠ্য বই থেকে আল 'আকাইদ, দীনের পরিচয় ও পরিসর, ইসলাম ও ইহ্‌সান, আল-ঈমান বিল্লাহ, ঈমানের বিভিন্ন দিক, ফেরেশতার প্রতি ঈমান, ঈমান বির রুসূল, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শ, ঈমান বিল কুতুব, আখিরাত, আল ফিক্‌হ, আত-তাহারাত (পবিত্রতা), ওযূ, পানির বিধান, আস-সালাত, সালাতের আহকাম, নফল সালাত, আস-সওম (রোযা), আল-আখলাক, আচরণগত চারিত্রিক গুণাবলি, নৈতিক অবক্ষয়ের কয়েকটি কারণ, দুয়া, যিকর ও মুনাজাত ইত্যাদি বিষয়াবলি পড়ানো হয়।[৪৫]

৭ম শ্রেণিতে আল-'আকাইদ ওয়াল ফিক্‌হ শিরোনামের পাঠ্য বই থেকে আদ-দীন, আল-আকাইদ, আল-ঈমান বিল্লাহ, আত-তাওহীদ, আত-তাওহীদ ফিস সিফাত, আল-ঈমান বির রুসূল, আল-ঈমান বিল মালায়েকা, আল-ঈমান বিল কুতুব, সাহাবায়ে কিরামের প্রতি আকীদা, আল-ঈমান বিল আখিরাত, আল-ঈমান বিল কদর, ইলমুল ফিক্‌হ, নাজাসাত, তাহারাত, তায়াম্মুম, মিসওয়াক, সালাতের জন্য ইকামত, আস-সালাত, সালাতের কিরাআত, সালাতুল কাযা (কাযা সালাত), সালাতুল বিত্‌র, জানাযার সালাত, উত্তম চরিত্র, আচরণগত চারিত্রিক গুণাবলি, অসচ্চরিত্র, দুয়া ও মুনাজাত, নফল সালাত, সওম, নফল সওম, যাকাত, আল-আত'ইমা ওয়াল আশরিবা ইত্যাদি বিষয়াবলি[৪৬] পড়ানো হয়।

৮ম শ্রেণিতে আল-'আকাইদ ওয়াল ফিক্‌হ শিরোনামের পাঠ্য বই থেকে আদ-দীন, আল-আকাইদ, আল-ঈমান বিল্লাহ, আত-তাওহীদ ফিস সিফাত, আত-তাওহীদ ফিল হুকুক, আত-তাওহীদ ফিল ইবাদত, আশ-শিরক, আল-ঈমান বিল মালাইকা, আল-ঈমান বির রুসুল, আহলুল বায়তের প্রতি আকীদা, আল-ঈমান বিল কুতুব, আল-ঈমান বিল আখিরাহ, আল-ঈমান বিল কদর, তাযকিয়া ওয়াত তাসাওউফ (আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান), আল-ফিক্‌হ, আত-তাহারাত (পবিত্রতা), মুজা ও পাগড়ি মাস্‌হ, হায়িয, নিফাস ও ইস্তিহাযা, সালাতুল জুমু'আ, সালাতুল 'ঈদাইন, সালাতুল মুসাফির, সাহু সেজদা, নফল সালাত, সওম, ওয়াজিব সওম, ইতেকাফ, সদাকাতুল ফিতর, যাকাত, 'ওশর, যাব্‌হ্‌ ও নযর, আল-আখলাক (নৈতিকতা), উন্নত চারিত্রিক গুণাবলি, আচরণগত চারিত্রিক গুণাবলি, নৈতিক অবক্ষয়ের কারণ, নৈতিক গুণাবলি অর্জনের আমলসমূহ, মাসনূন দুয়া ইত্যাদি বিষয়াবলি[৪৭] সিলেবাসভুক্ত রয়েছে।

---

৪৫. ড. মাওলানা এ কে এম মাহবুবুর রহমান, ড. মাওলানা মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম আল মারুফ ও মাওলানা আবুল কাশেম মোহাম্মদ ফজলুল হক, *আল-আকাইদ ওয়াল ফিকহ*, ষষ্ঠ শ্রেণি, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা, ২০১২ পৃ. ১-৬

৪৬. প্রাগুক্ত, সপ্তম শ্রেণি, ২০১২, পৃ. ১-৬

৪৭. অধ্যক্ষ ড. মাওলানা এ কে এম মাহবুবুর রহমান, অধ্যক্ষ ড. মাওলানা মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম আল মারুফ ও উপাধ্যক্ষ মাওলানা আবুল কাশেম মোহাম্মদ ফজলুল হক, *আল আকাইদ ওয়াল ফিক্‌হ*, অষ্টম শ্রেণি, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা, ২০১২ পৃ. ১-৯

৯ম ও ১০ম শ্রেণিতে আল-আকাইদ ওয়াল ফিকহ শিরোনামের পাঠ্য বই থেকে আল-আকাইদ, আদ-দীন, আল-ইসলাম, আল্লাহর উপর বিশ্বাস, রসূলগণের উপর বিশ্বাস, আসমানী কিতাবসমূহের উপর বিশ্বাস, ইলমুল বেলায়েত, আল-ফিকহ, ইলমে ফিকহের ইতিহাস, আল-ফিকহ– কুদূরী, কিতাবুত ত্বাহারাত, কিতাবুস সালাত, কিতাবুল হজ্জ, কিতাবুল উদহিয়া, মদিনা মুনাওয়ারাহ ও মদিনার পবিত্র স্থানসমূহের মর্যাদা, আল-আখলাক (নৈতিক চরিত্র), উন্নত চরিত্র, সদাচরণ, ওয়াদা পালন, দুঃস্থ, অসহায়, নিঃস্ব ও বিধবার সহযোগিতা, রোগীর সেবা, সততা, নৈতিক অবক্ষয়ের কয়েকটি দিক, এইডস রোগের কারণ ও প্রতিকার, নৈতিক গুণাবলি অর্জনে আমলসমূহ, তওবার পরিচয় ও পদ্ধতি, দরূদ শরিফের ফযিলত, নৈতিক অবক্ষয়ের কর্মসমূহ, উসূলুল ফিকহ, উসূলুল ফিকহের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, উসূলুল ফিকহের সংজ্ঞা, আলোচ্য বিষয় ও গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয়াবলি[৪৮] পাঠ দেয়া হয়।

আলিম (মানবিক) ২ বছরের মেয়াদী কোর্স-এর সিলেবাসে ফিক্‌হ

আলিম (মানবিক ও বিজ্ঞান) কোর্সে আল-ফিক্‌হ ১ম পত্র শিরোনামে শারহুল বিকায়া পাঠ্য গ্রন্থের হজ্জ, নিকাহ, তালাক, যাবাইহ ও জিহাদ অধ্যায়সমূহ, আল-ফিক্‌হ ২য় পত্র (উসূলুল ফিক্‌হ) শিরোনামে নূরুল আনওয়ার গ্রন্থের কিতাবুল্লাহ : খাস, 'আম, মুতলাক, মুকাইয়াদ, মুশতারাক, মুআউয়াল, হাকীকত, মাজায, সরীহ, কিনায়া, যাহির, নাস্, মুফাস্‌সার, মুহকাম, নাস্, আমর, নাহি অধ্যায়সমূহ পড়ানো হয়। এ কোর্সের সাথে ফারাইয সম্পর্কিত সিরাজী গ্রন্থটি পূর্ণাঙ্গ পড়ানো হয়। ১ম পত্র (৫ × ২০) = ১০০ নম্বরে এবং ২য় পত্র উসূলে ফিকহ ৬০ নম্বর, ফারাইয ৩০ নম্বর এবং মুনাসাখা (ফারাইজের অংক) ১০ নম্বর মোট ১০০ নম্বরে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।[৪৯]

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়ার অধীনে ফাযিল বি.এ. (পাস কোর্স) এবং কামিল এম.এ. অধিভুক্ত করণ

ইসলামিক ইউনিভার্সিটি (এ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ২০০৬ এর ৬, ২২৪ [৪] ধারা মোতাবেক ২০০৮ সাল থেকে ফাযিল বিএ/ বি.এস.এস/ বি.টি.আই এবং বি.এস.সি (পাশ) ৩ বৎসর মেয়াদি কোর্স ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। এই সিলেবাসের ২য় বর্ষ থেকে ফিক্‌হ ও উসূলুল ফিক্‌হ শাস্ত্র পাঠ্যভুক্ত করা হয়েছে এবং ১ম বর্ষে 'আকাইদ বিষয় পাঠ্যভুক্ত করা হয়েছে।

---

৪৮. প্রাগুক্ত, ৯ম শ্রেণি ও ১০ম শ্রেণি, ২০১৪, পৃ. ১-৭

৪৯. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি, আলিম পরীক্ষা- ২০১৩, কারিকুলাম এন্ড টেকস্টবুক উইং, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা, ২০১২ পৃ. ১৩-১৪

ফাযিল ১ম বর্ষ বি.এ (পাস) কোর্স-এর সিলেবাসে ফিক্‌হ

ফাযিল ১ম বর্ষ বি.এ. (পাস) কোর্স-এ আকীদা আরকানুল ঈমান, নাওয়াকিদুল ঈমান ও ইফতিরাক বিষয়সমূহ পড়ানো হয়, যেগুলো সরাসরি ফিক্‌হ-এর সাথে সম্পৃক্ত নয়। ফাযিল ২য় বর্ষে ফিকহ ১ম পত্র বিষয় কোড-২০২ শিরোনামে হিদায়া কিতাবের বুয়ূ', মুদারাবা, মুযারা'আ, কারাহিয়া, রাহ্‌ন, ওসিয়্যত, মুরাবাহা, রিবা অধ্যায়সমূহ পড়ানো হয়। একই বর্ষে তারিখ ইলমিল ফিক্‌হ শিরোনামে আবূ জা'ফর আত-তাহাবী প্রণীত ইখতিলাফুল ফুকাহা ও আবূ ইসহাক সিরাজী প্রণীত তাবাকাতুল ফুকাহা পাঠ্য বই থেকে 'ইলমুল ফিকহের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, তাবাকাতুল ফুকাহা, ফকীহ পরিচিতি, ফকীহ সাহাবী, ফকীহ তাবি'ঈ, চার ইমাম, ইখতিলাফুল ফুকাহা অধ্যায়সমূহ-এর পাঠ দেয়া হয়।

ফাযিল ২য় বর্ষে উসূলুল ফিক্‌হ বিষয়ে ফিক্‌হ ২য় পত্র (বিষয় কোড- ২০৩) শিরোনামে নূরুল আনওয়ার, উসূলুস সারাখসী, মুহাম্মাদ মারূফ দাওয়াইসী প্রণীত মা'আলিমু উসূলিল ফিকহ পাঠ্যগ্রন্থত্রয় থেকে উসূলুল ফিকহের সংজ্ঞা, গুরুত্ব, শরীয়তের উৎসসমূহ; কিতাবুল্লাহ– সংজ্ঞা, মুশকিল, মুজমাল, মুতাশাবাহ, হাকীকত, মাযাজ, সরীহ, কিনায়া, ইবারাতুন নাস্‌, দালালাতুন নাস্‌, ইকতিদাউন নাস্‌; সুন্নাহ– সংজ্ঞা ও প্রকার, রাবী পরিচিতি ও শারাইতুর রাবী, মুরসাল, মুনকাতি ও প্রকারসমূহ; ইজমা', কিয়াস, ইজতিহাদ, আল-মাসালিহুল মুরসালাহ, ইসতিহসান, মাকাসিদুর শরীয়াহ; তারিখু উসূলিল ফিকহ– উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ও গ্রন্থসমূহ ইত্যাদি বিষয়সমূহ পাঠ্যভুক্ত রয়েছে।[৫০]

২০০৮ সালে কামিল শ্রেণি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এম.এ. মান পায়। তখন থেকে কামিল এম.এ. শ্রেণি ২ পর্বে বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রতি পর্বে আলাদা আলাদা পরীক্ষায় উত্তীর্ণরাই ২য় পর্বে ভর্তি হতে পারে। ২য় পর্ব উত্তীর্ণ হওয়ার পরই তারা এম.এ ডিগ্রীর চূড়ান্ত সনদ লাভ করে।

এভাবে দ্বিতীয় পর্বেও পূর্বানুরূপ মানবণ্টন হবে। তবে দুই পর্বেই আলাদা আলাদা কিতাবাদি পাঠ্যভুক্ত রয়েছে। নিম্নে এর বর্ণনা দেয়া হলো–

কামিল ফিক্‌হ (এম.এ প্রথম পর্ব) কোর্স-এর সিলেবাসে ফিক্‌হ

কামিল (ফিক্‌হ) এম. এ. প্রথম পর্বে ফিক্‌হ ১ম পত্র হিসেবে "ইবাদাত ও মুআশারাহ এবং মুসলিম পারিবারিক আইন" শিরোনামের কোর্সের জন্য নির্ধারিত পাঠ্য গ্রন্থ হলো আবূ জা'ফর আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ আত-তাহাবী প্রণীত শারহু মা'আনিল আছার। এই কোর্সের সহায়ক গ্রন্থ হিসাবে 'আলা উদ্দীন আল-কাসানী আল-হানাফী প্রণীত

---

৫০. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রবর্তিত ফাযিল (পাস কোর্স) বি.এ/ বি.এস.সি/ বি.এস.এস. ১ম, ২য় ও ৩য় বর্ষের সিলেবাস, রেজিস্ট্রার, ই.বি. কুষ্টিয়া ২০০৭, পৃ. ৭ ও ১১

বাদাইউস সানাই', কামালুদ্দীন ইবনুল হুমাম প্রণীত শারহু ফাতহিল কাদীর ও একদল বিশেষজ্ঞ প্রণীত ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন গ্রন্থত্রয় সিলেবাস রয়েছে। এই কোর্সে ইবাদাত ও মু'আশারাহ বিষয়ে নির্ধারিত পাঠ্য কিতাব থেকে কিতাবুন নিকাহ, কিতাবুত তালাক, কিতাবুল আইমান ওয়ান নুযূর, কিতাবুল হুদূদ, কিতাবুল জিনায়াত, কিতাবুস সিয়ার; মুসলিম পারিবারিক আইন বিষয়ে বিবাহ, স্ত্রীর ভরণ-পোষণ, দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধার, মহর, বিবাহ বিচ্ছেদ, সন্তানের বংশ পরিচয়, জন্মের বৈধতা ও স্বীকৃতি, সম্পত্তির অভিভাবকত্ব, আত্মীয়দের অধিকার বিষয়াবলি পাঠ্যভুক্ত রয়েছে। তাছাড়া এ কোর্সে পাঠ্য হিসেবে রয়েছে বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত অধ্যাদেশ যেমন ১. মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১; ২. মুসলিম পারিবারিক আইন বিধিমালা ১৯৬১; ৩. মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিস্ট্রেশন) আইন ১৯৭৪; ৪. মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিস্ট্রেশন) আইন ১৯৭৪ (সংশোধিত); ৫. মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিস্ট্রেশন) আইন ১৯৭৫; ৬. পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫।

ফিক্হ ২য় পত্র শিরোনামে উসূলুল ফিক্হ বিষয়ের জন্য নির্ধারিত পাঠ্য কিতাব হলো ইমাম ফখরুল ইসলাম আলী ইবনে মুহাম্মাদ আল-বাযদাবী প্রণীত উসূলুল বাযদাবী। এ পত্রের অধীনে উল্লিখিত গ্রন্থটির আনওয়াউল 'ইলম হতে 'মুতাবা'আতু আসহাবিন নাবিয়্যি ওয়াল ইকতিদাউ বিহিম' এর শেষ পর্যন্ত পড়ানো হয়। সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে উসূলুস সারাখসী, ইমাম শাফী প্রণীত আর-রিসালাহ ও সাইফুদ্দীন আল-আমিদী প্রণীত আল-ইহকাম ফী উসূলিল আহকাম গ্রন্থত্রয়ের নাম সিলেবাসে রয়েছে। এ পত্রের অধীনে মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুর রহমান আল-হানাফী প্রণীত তাসহীলুল উসূল ইলা ইলমিল উসূল গ্রন্থটিও পাঠ্য। এ গ্রন্থ থেকে মুকাদ্দামা ফী তারীফি ইলমিল উসূল ওয়াল ফিক্হ হতে 'যিকরু মান আল্লাফা মিন উসূলি মিনাল হানাফিয়্যাতি ওয়া গায়রিহিম' পর্যন্ত পড়ানো হয়।

ফিকহ ৩য় পত্রে তারীখু ইলমিল ফিক্হ (ফিক্হ শাস্ত্রের ইতিহাস) শিরোনামে পাঁচটি পাঠ্য বই রয়েছে। গ্রন্থগুলো হলো ১. ড. মুহাম্মাদ আল-সায়েস প্রণীত তারীখু ইলমিল ফিক্হিল ইসলামী; ২. ড. উমার সুলাইমান আল-আশকার প্রণীত তারীখু ইলমিল ফিক্হিল ইসলামী; ৩. মুফতী আমীমুল ইহসান প্রণীত তারিখে ইলমে ফিক্হ; ৪. আবুল খাইর আহমাদ ইবনে মুস্তাফা প্রণীত তাবাকাতুল ফুকাহা; এবং ৫. ইবনুল কায়্যিম প্রণীত ইলামুল মুআক্কিঈন (১ম খণ্ড)। এ পত্রের অধীনে যেসব বিষয় পড়ানো হয় সেগুলো হলো : ফিকহ শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, ফিক্হ শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা, ফিক্হ ও তাশ্‌রী-এর মধ্যে পার্থক্য, ইসলামী আইন ও মানবরচিত আইনের মধ্যে পার্থক্য, ফিক্হ শাস্ত্র সংকলনের ইতিহাস, মাযহাবসমূহের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও অবদান, বিভিন্ন মাযহাবে ফিক্হ পরিভাষা, প্রত্যেক মাযহাবের সূচনা প্রেক্ষাপট, মুসলিম বিশ্বে ইসলামী আইনের সমসাময়িক উন্নয়ন ও পরিকল্পনা।

ফিকহ ৪র্থ পত্রের অধীনে আল-কাওয়াইদুল ফিক্হিয়্যাহ শিরোনামে ড. মুহাম্মাদ সিদ্দীক আহমাদ প্রণীত আল-ওয়াজিয ফী ঈযাহি কাওয়াইদিল ফিক্হিল কুল্লিয়্যাহ; আল্লামা ইব্ন নুজাইম মিসরী প্রণীত আল-আশবাহ ওয়ান-নাযাইর এবং মুফতী আমীমুল ইহসান প্রণীত মাজমূআ কাওয়াইদিল ফিক্হিয়্যাহ গ্রন্থত্রয় পড়ানো হয়। এ পত্রের জন্য নির্ধারিত বিষয়সমূহ হলো[৫১] :

প্রাথমিক আলোচনা

১. কাওয়াইদের অর্থ : আল কাওয়াইদুল উসূলিয়্যাহ এবং আল কাওয়াইদুল ফিক্হিয়্যার মধ্যে পার্থক্য, ইসলামী শরীয়তে আল-কাওয়াইদুল ফিক্হিয়্যার বৈশিষ্ট্য, গুরুত্ব ও মর্যাদা। আল-কাওয়াইদুল ফিক্হিয়্যার শ্রেণি বিভাগ ও স্তরসমূহ; ইলমুল ফিক্হ, ইলমু উসূলিল ফিক্হ ও ইলমুল কাওয়াইদিল ফিক্হিয়্যার মধ্যে পার্থক্য; আল কাওয়াইদুল ফিক্হিয়্যার ইতিহাস, উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, গ্রন্থকার পরিচিতি ও গ্রন্থাবলি।

মূল আলোচ্য বিষয়

ক. প্রধান ও বৃহৎ কাওয়া'ইদ :

* قاعدة "الامور بمقاصدها" دارستها مع القواعد المندرجة تحتها
* قاعدة "لا ضرر و لا ضرار" دارستها مع القواعد المندرجة تحتها
* قاعدة "اليقين لا يزول بالشك" دارستها مع القواعد المندرجة تحتها
* قاعدة "المشقة تجلب التيسير" دارستها مع القواعد المندرجة تحتها
* قاعدة "العادة محكمة" دارستها مع القواعد المندرجة تحتها

প্রথমোক্ত বৃহৎ কাওয়া'ইদ ব্যতীত অন্যান্য কাওয়া'ইদ :

* قاعدة "إعمال الكلام أولى من أهمالة" دارستها مع بيان أهم ما يتفرع عنها من قواعد ـــ
* قاعدة "التابع تابع" دارستها مع بيان أهم ما يتفرع عنها من قواعد ـــ
* قاعدة "إذا تعذر الاصل يصار إلى البدل" دارستها بالأمثلة ـــ
* قاعدة "اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان" دارستها مع بيان أهم ما يتفرع عنها من قواعد ـــ
* قاعدة "التصرف على الرعية منوط بالمصلحة" دارستها بالأمثلة ـــ
* قاعدة "الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان" دارستها بالأمثلة ـــ
* قاعدة "المرء مؤاخذ باقراره" دارستها بالأمثلة ـــ
* قاعدة "الإقرار حجة قاصرة والبينة حجة متعدية" دارستها بالأمثلة
* قاعدة "الإقرار لايرتد بالرد" دارستها بالأمثلة ـــ

---

[৫১]. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রবর্তিত কামিল এম.এ (হাদীস, তাফসীর, ফিক্হ, আদব) সিলেবাস, রেজিস্ট্রার, ই. বি. কুষ্টিয়া ২০০৭, পৃ. ২৪-২৮

* قاعدة "الجواز الشرعى ينافى الضمان" دارستها بالأمثلة ـــ
* قاعدة "الخراج بالضمان" دارستها بالأمثلة، و دارسة مايوخذ مثلها من القواعد كالغرم بالغنم ، والنعمة بقدر النقمة، والنقمة بقدر النعمة ـــ
* قاعدة "الساقط لا يعود" و دارستها بالأمثلة، وقاعدة المعدوم لايعود، و دارستها بالأمثلة ـــ
* قاعدة "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" دارستها بالأمثلة ـــ
* قاعدة "ليس لعرق ظالم حق" دارستها بالأمثلة ـــ
* قاعدة "لايتم التبرع إلا بالقبض", أو "لايملك أحد إثبات ملك لغيره بلا اختباره"، أو "ليس لأحد تمليك غيره بلا رضاه" دارستها بالأمثلة ـــ
* قاعدة : يضاف الفعل إلى الفاعل لا الامر مالم يكن مجبرا والأمر لايضمن بالأمر، دارستها بالأمثلة ـــ
* قاعدة "الأمر بالتصرف فى ملك الغير باطل" دارستها بالأمثلة ـــ
* قاعدة "لا مساغ للاجتهاد فى مورد النص" دارستها بالأمثلة ـــ
* قاعدة "الاجتهاد لا ينقض بمثله" دارستها بالأمثلة ـــ
* قاعدة "ما حرم أخذه حرم إعطاؤه" ومثله "ما حرم فعله حرم طلبه" أو "ما حرم استعماله حرم اتخاذه" دارستها بالأمثلة ـــ
* قاعدة "لا يجوز لأحد أن يتصرف فى ملك الغير، أو حق الغير بلا إذن" و دارستها بالأمثلة-
* قاعدة "ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب" دارستها بالأمثلة ـــ
* قاعدة "الميسور لا يسقط بالمعسور" دارستها بالأمثلة ـــ
* قاعدة "من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه" دارستها بالأمثلة
* قاعدة "ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط" دارستها بالأمثلة
* قاعدة "المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط" دارستها بالأمثلة
* قاعدة "يلزم مراعاة الشرط بقدر الامكان" دارستها بالأمثلة

কামিল (ফিক্‌হ) (এম.এ. শেষ পর্ব) কোর্স-এর সিলেবাসে ফিক্‌হ

কামিল শেষ বছরে ফিক্‌হ ১ম পত্রের অধীনে মু'আমালাত ও আধুনিক উদ্ভূত বিভিন্ন ফিক্‌হী মাসআলা সম্পর্কে জ্ঞান শিরোনামে আবূ জা'ফর আত-তাহাবী প্রণীত শারহু মা'আনিল আছার গ্রন্থটি পাঠ্য করা হয়েছে। এ গ্রন্থ থেকে যেসব অধ্যায় পড়ানো হয় সেগুলো হলো, কিতাবুল বুয়ূ', কিতাবুস সার্‌ফ, কিতাবুল হিবা ওয়াস সাদাকা, কিতাবুর রাহন, কিতাবুশ শুফ'আ, কিতাবুল ইজারাত, কিতাবুল ক্বাদা ওয়াশ শাহাদাত, কিতাবুল আশরিবা, কিতাবুল কারাহিয়্যাহ, কিতাবুয যিয়াদাত, কিতাবুল

ওয়াসায়া। এর সাথে মুসলিম আইন হিসেবে উত্তরাধিকার ও সম্পদের বিলি-বণ্টন উপ-শিরোনামে উত্তরাধিকার সম্পর্কিত সাধারণ বিধিমালা, উত্তরাধিকার সম্পর্কিত হানাফী আইন, উইল, মৃত্যুকালীন দান ও প্রাপ্তি স্বীকার, দান, ওয়াকফ ইত্যাদি বিষয়াবলি পাঠ দান করা হয়। এ পত্রের জন্য সহায়ক গ্রন্থাবলি হলো, ইবনে কুদামা প্রণীত আল-মুগনী, যায়নুদ্দিন ইব্‌ন নুজাইম প্রণীত আল-বাহরুর রাইক ফি শারহি কানযিদ দাকাইক, গাজী শামছুর রহমান প্রণীত ইসলামের দণ্ডবিধি, মুহাম্মদ জোসন আলী প্রণীত ইসলামী দণ্ডবিধির রূপরেখা, D.F. Mulla প্রণীত Mohomedan Law।

ফিক্‌হ ২য় পত্রের অধীনে উসূলুল ফিক্‌হ ওয়া মাকাসিদুশ শরীয়াহ শিরোনামে ১০০ নম্বরের একটি কোর্স পড়ানো হয়। উসূলে ফিকহ বিষয়ে উসূলুল বাযদাবী এর বাবুল ইজমা' হতে কিতাবের শেষ পর্যন্ত ও তাসহীলুল উসূল ইলা ইলমিল উসুল পড়ানো হয়। মাকাসিদুশ শরীয়াহ বিষয়ে ইমাম আবূ ইসহাক ইবরাহীম আশ-শাতিবী প্রণীত আল-মুয়াফাকাত ফী উসূলিশ শরীয়াহ (২য় খণ্ড) ও কিতাবুল মাকাসিদ গ্রন্থদ্বয়ের কিয়াস থেকে মুরাজ্জিহাত এর শেষ পর্যন্ত পড়ানো হয়। সর্বশেষে আসরারুশ শরীয়াহ বিষয়ে শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী প্রণীত হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ গ্রন্থটি পাঠ্য করা হয়েছে। এ গ্রন্থ থেকে যেসব অধ্যায় পাঠ্যভুক্ত সেগুলো হলো : মাবহাসুস সা'আদাহ, মাবহাসুল বিররি ওয়াল ইছম, মাবহাসুল সিয়াসাতিল মিল্লিয়্যাহ, মাবহাসু ইস্‌তিমবাতুশ শারাই', বাবু আসহাবু ইখতিলাফিস সাহাবা ওয়াত তাবিঈন ফিল ফুরূ', বাবু আসহাবু ইখতিলাফি মাযাহিবিল ফুকাহা, বাবু ফারকু বাইনা আহলিল হাদীস ওয়া আসহাবির রাই, বাবু হিকায়াতি হালিন নাস কাবলাল মি'আতির রাবি'আতি ওয়া বা'দাহা। বায়ানু আসরারি মাজাআ 'আনিন নাবিয়্যি স. তাফসিলান, আবওয়াবুত তাহারাত, আবওয়াবুস সালাত, আবওয়াবুয যাকাত, আবওয়াবুস সাওম, আবওয়াবু ইবতিগাইর রিযক, আবওয়াবুল মা'ঈশাহ।

ফিক্‌হ ৩য় পত্রের অধীনে তাবাকাতুল ফুকাহা, কাযা ওয়াস সিয়াসাতুশ শারইয়্যাহ শিরোনামে আবুল খায়র আহমাদ ইব্‌ন মুস্তফা প্রণীত তাবাকাতুল ফুকাহা, 'আলাউদ্দিন তারাবলিসি আল-হানাফী প্রণীত মুঈনুল হুক্কাম ফি-মা ইতারাদ্দাদু বাইনাল খাসমাইনে মিনাল আহকাম, ড. আব্দুল্লাহ প্রণীত আল ইমামুল উজমা, মুফতী আমীমুল ইহসান প্রণীত আদাবুল মুফতী গ্রন্থত্রয় পড়ানো হয়। এ পত্রের বিস্তারিত সিলেবাস নিম্নরূপ :

(১) তাবাকাতুল ফুকাহা : সাহাবা-তাবিঈদের মধ্যে বিখ্যাত ফকীহগণ, চার মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহগণের জীবনী ও অবদান, চার মাযহাব ব্যতীত অন্যান্য বিখ্যাত ফকীহগণ, পরবর্তীকালের প্রসিদ্ধ ফকীহগণের জীবনী ও অবদান, উপমহাদেশের বিখ্যাত ফকীহগণ ও তাদের কর্ম।

(২) ইসলামী বিচার ব্যবস্থা : কাযা শব্দের অর্থ, গুরুত্ব, মৌলিক শর্তাবলি ও আদব; ইসলামে বিচার ব্যবস্থার ইতিহাস, রীতি, বৈশিষ্ট্য ও পদ্ধতি; বিচারক হওয়ার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা; দাবি ও তার প্রমাণাদি।

(৩) ইসলামী রাজনীতি ও শাসন ব্যবস্থা : ইসলামী রাজনীতি ও শাসন ব্যবস্থার সংজ্ঞা, শাসকের যোগ্যতা ও অধিকার, শাসক ও শাসিতের অধিকার, শাসক নির্বাচন পদ্ধতি, ইসলামী সংবিধানের রূপরেখা।

(৪) ফাত্ওয়া দেয়ার অধিকার, নিয়ম, শর্ত, ও আদব : ফাত্ওয়ার সংজ্ঞা ও হুকুম, ফাতাওয়া দেওয়ার অধিকার, নিয়ম, শর্ত ও আদবসমূহ, মুফতী ও বিচারকের মধ্যে পার্থক্য।

ফিকহ ৪র্থ পত্রের অধীনে ফিকহুল ইকতিসাদ শিরোনামে মুহাম্মাদ জামাল প্রণীত আল-ইকতিসাদুল ফিকহী ও এম.এ. হামীদ প্রণীত ইসলামী অর্থনীতি গ্রন্থদ্বয় পড়ানো হয়। এ দুটি গ্রন্থের সাথে সহায়ক গ্রন্থ হিসাবে ইমাম আবু ইউসুফের কিতাবুল খারাজ, ড. ইউসুফ আল কারাযাবী-এর ফিকহুয যাকাত ও মুফতী মুহাম্মদ শফী' ও মুফতী ওলি হাসান-এর শরীয়তের দৃষ্টিতে বীমা শিল্প গ্রন্থাবলির নাম সিলেবাসে রয়েছে। এ পত্রে যেসব বিষয় পড়ানো হয় সেগুলো হলো,

ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও পরিধি; ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতি; ইসলামী অর্থনীতির মৌলিক উপাদান (যাকাত, উশর, খারাজ ও সাদাকাহ); সুদ ও মুনাফা; ইসলামী বীমার সংজ্ঞা, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; চাহিদা ও যোগান; ভোক্তা ও ভোক্তার আচরণবিধি ও ভারসাম্য; মালিকানা স্বত্ব ও মালিকানা অর্জনের পন্থা; সম্পদ বণ্টন ব্যবস্থা, উৎপাদন এর উপকরণ ও উৎপাদনবিধি; মজুরি, মজুরি ব্যবস্থা, শ্রমিকের অধিকার, শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক; মূল্য ও বাজার ব্যবস্থা; ইসলামের দৃষ্টিতে মূল্য নির্ধারণ; আন্তর্জাতিক বাণিজ্য; কর ব্যবস্থা, ইসলামের দৃষ্টিতে কর, যাকাত ও কর ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য; পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র ও ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য; ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ।[৫২]

পর্যালোচনা

সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায়, বৃটিশ যুগ থেকে বৃটিশ উত্তর যুগে ফিক্হ শাস্ত্রের পাঠ ও পঠনে বেশ গতি পেয়েছে। সিলেবাসের মান ও কলেবর অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এদিকে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে গঠিত যেমন- ১৯৭৫, ১৯৮৫, ২০০০ এবং সর্বশেষ ২০১০ সালে নতুন শিক্ষানীতির আলোকে উন্নততর সিলেবাস প্রণয়ন করা হয়। সে আলোকে দাখিল ১ম থেকে ৯ম/১০ম শ্রেণি পর্যন্ত

---

৫২. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রবর্তিত কামিল এম. এ (হাদীস, তাফসীর, ফিক্হ ও আদব) বিভাগের সিলেবাস, রেজিস্ট্রার, ই. বি. কুষ্টিয়া ২০০৭, পৃ. ২৮-৩০

'আকাইদ ও ফিক্‌হ নামে মাদরাসা বোর্ড বিশেষজ্ঞ কমিটির মাধ্যমে মানসম্মত বই প্রণয়ন করে। এতে শিক্ষার্থীর মানস ও মননে পূর্বের তুলনায় বর্তমানে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে এবং মাসআলা ও মাসা'ইলের ক্ষেত্রে স্বচ্ছ ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আলিম শ্রেণি সিলেবাস পূর্বানুরূপ বহাল রাখা হয়। এতে বিশেষ কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। ২০০৬ সাল পর্যন্ত মাদরাসা বোর্ডের অধীনে ফাযিল ও কামিল শ্রেণির ফিক্‌হ শাস্ত্রের সিলেবাস পূর্বানুরূপ বহাল রাখা হয়। ২০০৭/০৮ সাল থেকে মাদরাসার ফাযিল ও কামিল শ্রেণিদ্বয়কে ফাযিল বি.এ (পাস) এবং কামিল এম.এ মান দিয়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয় এবং সমৃদ্ধ সিলেবাস প্রণয়ন করা হয়। লক্ষ্য করা যায়, মাদরাসা বোর্ডের তুলনায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস, পরীক্ষার ধরন ও প্রশ্নপত্রের মানে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গিতে যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে।

পূর্বে ফাযিল ও কামিলের ২ বছরের কোর্সে একবার বোর্ড পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হত। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ফাযিল ৩ বৎসরের কোর্সে আলাদা আলাদা পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হওয়া স্বাপেক্ষে পরবর্তী বর্ষে ভর্তি হতে হয়। এভাবে ফাযিলের ৩য় বর্ষে এবং কামিলের ২য় বর্ষে চূড়ান্ত পরীক্ষা দিতে হয়। উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীরাই বি.এ ও এম.এ এর সনদ লাভ করে।

প্রস্তাবনা

* ফিক্‌হ শাস্ত্রের সিলেবাস আরও যুগোপযোগী করার জন্য বিশেষ কমিটির মাধ্যমে সিলেবাস প্রণয়ন।
* ফাযিল আল-ফিক্‌হ বি.এ. অনার্স কোর্স চালু করণ।
* প্রতিষ্ঠানে ফাতাওয়া বিভাগ চালু করা।
* শিক্ষানবীস ছাত্রদের দ্বারা জটিল মাসআলার সমাধান করে লিখিত ফাত্‌ওয়া প্রদানের ব্যবস্থা করা।
* ফাত্‌ওয়া বিভাগে ফিক্‌হ শাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য প্রাচীন ও আধুনিক কিতাবাদি রাখার ব্যবস্থা করা।
* ফাত্‌ওয়া বিভাগে ইন্টারনেট সংযোগের ব্যবস্থা করা, যাতে আধুনিক মাসআলা সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া যায়।
* প্রতি তিন মাস/ছয় মাস অন্তর ইতঃপূর্বে সমাধানকৃত মাসআলাসমূহের সংকলন প্রকাশ করা।
* সময় সময় নির্ভরযোগ্য ও গবেষণাধর্মী লেখা প্রকাশ করা।

* ফাত্ওয়া বিভাগে কর্মরত শিক্ষকবৃন্দের কাজে সহায়তা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ও অবসরপ্রাপ্ত আলেমগণের চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ দান।
* সংশিষ্ট বিভাগের শিক্ষকবৃন্দের জন্য উপযুক্ত সম্মানী প্রদান করা।
* দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতার জন্য সময় সময় বিভিন্ন মাদরাসার ফকীহ্গণের মধ্যে মতবিনিময়ের ব্যবস্থা করা।
* জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ফিক্হি বিষয়ে একাডেমিক সেমিনারের আয়োজন করা।
* সময় সময় ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দের শিক্ষাসফরের আয়োজন করা।
* মাদরাসা-ই-আলিয়ার ফিক্হ শাস্ত্রের প্রাচীন কিতাবাদি আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।
* মাদরাসার লাইব্রেরির ফিক্হ ও অন্যান্য বিষয়ের কিতাবাদি আধুনিক ক্যাটালগ পদ্ধতিতে সাজানোর ব্যবস্থা করা।
* মাদরাসার লাইব্রেরিতে দক্ষ জনবল বৃদ্ধি করা।
* জটিল মাসআলা মাসাইল ও ফাতওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে আধুনিক বিশ্বের অভিজ্ঞ আলেমগণের সাথে টেলিকন্ফারেন্সের ব্যবস্থা করা।
* মাদরাসার ফিক্হ বিভাগের জন্য আলাদা E.mail ও Website থাকা। যাতে জনগণ মাসআলা-মাসাইল জানার ক্ষেত্রে বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগ করতে পারে এবং ব্যাপক জনমত গঠন করতে পারে।

উপসংহার

মাদরাসা-ই-আলিয়ার ইতিহাস প্রায় ২৩৫ বছরের ইতিহাস। দীর্ঘ সময় ও পথ পাড়ি দিয়ে এ প্রতিষ্ঠানটি দেশ ও জাতির কল্যানেঅসামান্য অবদান রেখে চলেছে। তৎকালীন ইংরেজ সরকারের উদ্দেশ্য ছিল ফিক্হ শাস্ত্র অধ্যয়ন করে এদেশের মুসলমানগণ শুধু কাজি ও মুন্সেফের পদ লাভ করবে। কিন্তু মহান আল্লাহর ইচ্ছা ছিল ভিন্ন। তিনি তাঁর রঙ্গে এ প্রতিষ্ঠানটিকে রঞ্জিত করেছেন। অনেক বড় বড় খ্যাতনামা মুহাদ্দিস, মুফাস্সির ও ফকীহ এ প্রতিষ্ঠানটির গৌরবমালায় এক একটি হীরকখণ্ডের মত উজ্জ্বল, যা থেকে আজও আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। পথহারা মানুষ পথ পাচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠানটির প্রতি সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সুদৃষ্টি কামনা করছি।

ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখার নিয়মাবলি

(১) ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিবন্ধিত রেজিঃ নং (DA-6000) বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর একটি ত্রৈমাসিক একাডেমিক রিসার্চ জার্নাল। এটি প্রতি তিন মাস অন্তর, (জানুয়ারী-মার্চ, এপ্রিল-জুন, জুলাই-সেপ্টেম্বর, অক্টোবর-ডিসেম্বর) নিয়মিত প্রকাশিত হয়।

(২) এ জার্নালে ইসলামের অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, আইনতত্ত্ব, বিচারব্যবস্থা, ব্যাংক, বীমা, শেয়ার ব্যবসা, আধুনিক ব্যবসায়-বাণিজ্য, ফিক্হশাস্ত্র, ইসলামী আইন, মুসলিম শাসকদের বিচারব্যবস্থা, মুসলিম সমাজ ও বিশ্বের সমসাময়িক সমস্যা ও এর ইসলামী সমাধান এবং তুলনামূলক আইনী ও ফিক্হী পর্যালোচনামূলক প্রবন্ধ স্থান পায়।

(৩) জমাকৃত প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য দু'জন বিশেষজ্ঞ দ্বারা রিভিউ করানো হয়। রিভিউ রিপোর্ট এবং সম্পাদনা পরিষদের মতামতের ভিত্তিতে তা প্রকাশের জন্য চূড়ান্ত করা হয়।

(৪) জার্নালে সর্বোচ্চ ১৫০০ শব্দে গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্টারি গ্রন্থ পর্যালোচনাও প্রকাশ করা হয়। এ ক্ষেত্রে ইসলামী আইন ও বিচার বিষয়ক গ্রন্থ অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

লেখকদের প্রতি নির্দেশনা

১. প্রবন্ধ নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে সব বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়

ক. ইসলামী আইন ও বিচার সম্পর্কে জনমনে আগ্রহ/চাহিদা সৃষ্টি করা ও গণসচেতনতা তৈরি করা;

খ. ইসলামী আইন ও বিচার সম্পর্কে পুঞ্জিভূত বিভ্রান্তি দূর করা;

গ. মুসলিম শাসনামলের ইসলামী আইন ও বিচারের প্রায়োগিক চিত্র তুলে ধরা।

২. প্রবন্ধ জমাদান প্রক্রিয়া

পাণ্ডুলিপি অবশ্যই লেখকের মৌলিক গবেষণা (Original Research) হতে হবে। প্রবন্ধ 'ইসলামী আইন ও বিচার'-এ জমা দেয়ার পূর্বে কোথাও কোনো আকারে বা ভাষায় প্রকাশিত বা একই সময়ে অন্যত্র প্রকাশের জন্য বিবেচনাধীন হতে পারবে না। এ শর্ত নিশ্চিত করার জন্যে প্রবন্ধের সাথে লেখককে/দের এ মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে যে,

(ক) জমাদানকৃত প্রবন্ধের লেখক তিনি/তারা;

(খ) প্রবন্ধটি ইতঃপূর্বে অন্য কোথাও কোনো আকারে বা ভাষায় মুদ্রিত/প্রকাশিত হয়নি কিংবা প্রকাশের জন্য অন্য কোথাও জমা দেয়া হয়নি;

(গ) এ জার্নালে প্রবন্ধটি প্রকাশ হওয়ার পর সম্পাদকের মতামত ব্যতীত অন্যত্র প্রকাশের জন্য জমা দেয়া হবে না;

(ঘ) প্রবন্ধে প্রকাশিত/বিবৃত তথ্য ও তত্ত্বের সকল দায়-দায়িত্ব লেখক/গবেষকগণ বহন করবেন। প্রতিষ্ঠান এবং জার্নালের সাথে সংশ্লিষ্ট কেউ এর কোনো প্রকার দায়-দায়িত্ব বহন করবেন না।

৪. প্রেরিত প্রবন্ধের প্রচ্ছদ পৃষ্ঠায় যা থাকতে হবে

লেখকের পূর্ণ নাম, প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি, ফোন/মোবাইল নাম্বার, ই-মেইল ও ডাক ঠিকানা।

৫. সারসংক্ষেপ

প্রবন্ধের শুরুতে ২০০-২৫০ শব্দের মধ্যে একটি সারসংক্ষেপ (Abstract) থাকতে হবে। এ সারসংক্ষেপে প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, প্রবন্ধে ব্যবহৃত গবেষণা পদ্ধতি ও গবেষণান্তে প্রাপ্ত ফল সম্পর্কে ধারণা থাকবে।

৬. পাণ্ডুলিপি তৈরি

(ক) প্রবন্ধের শব্দসংখ্যা সর্বনিম্ন ৩০০০ (তিন হাজার) এবং সর্বোচ্চ ৫০০০ (পাঁচ হাজার) হতে হবে।

(খ) পাণ্ডুলিপি কম্পিউটার কম্পোজ করে দুই কপি (হার্ড কপি) পত্রিকা অফিসে জমা দিতে হবে এবং প্রবন্ধের সফট কপি সেন্টার-এর ই-মেইল (e-mail) ঠিকানায় (islamiclaw_bd@yahoo.com) পাঠাতে হবে।

(গ) কম্পিউটার কম্পোজ করার জন্য বাংলা বিজয় কী-বোর্ড ব্যবহার করে (Microsoft Windows XP, Microsoft office 2000 এবং MS-Word- SutonnyMJ ফন্ট ব্যবহার করে ১৩ পয়েন্টে (ফন্ট সাইজ) পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে হবে। লাইন ও প্যারাগ্রাফের ক্ষেত্রে ডবল স্পেস হবে।

(ঘ) A4 সাইজ কাগজে প্রতি পৃষ্ঠায় উপরে ২ ইঞ্চি, নিচে ২ ইঞ্চি, ডানে ১.৫ ইঞ্চি, বামে ১.৬ ইঞ্চি মার্জিন রাখতে হবে।

(ঙ) প্রবন্ধে ব্যবহৃত ইংরেজি উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে Times New Roman ফন্ট এবং আরবী উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে Simplified Arabic/Traditional Arabic ফন্ট ব্যবহার করতে হবে।

(চ) প্রবন্ধে ব্যবহৃত সকল তথ্যের পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক সূত্র (Primary Source) উল্লেখ করতে হবে।

(ছ) আল-কুরআন-এর TEXT অনুবাদসহ মূল প্রবন্ধে এবং হাদীসের আরবী TEXT প্রতি পৃষ্ঠার নিচে ফুটনোটে এবং অনুবাদ মূল লেখার সাথে দিতে হবে।

(জ) কুরআন ও হাদীসের অনুবাদের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত অনুবাদ অনুসরণ করে চলিত রীতিতে রূপান্তর করতে হবে।

(ঝ) উদ্ধৃতি উল্লেখের ক্ষেত্রে মূল গ্রন্থের (আরবী, উর্দু, ইংরেজি যে ভাষায় হোক তা অপরিবর্তিত রেখে) TEXT দিতে হবে। মাধ্যমিক সূত্র (Secondary Source) বর্জনীয়। কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতিতে অবশ্যই হরকত দিতে হবে।

(ঞ) প্রবন্ধ বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসরণে রচিত হতে হবে, তবে আরবী শব্দের ক্ষেত্রে ইসলামী ভাবধারা অক্ষুণ্ন রাখতে হবে।

(ট) উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে মূল বানানের কোনো পরিবর্তন করা যাবে না, তবে লেখক কোনো বিশেষ বানান বৈশিষ্ট্য রক্ষায় সচেষ্ট হলে তা অক্ষুণ্ন রাখা হবে।

(ঠ) তথ্যনির্দেশ ও টীকার জন্য শব্দের উপর অধিলিপিতে (Superscipt) সংখ্যা (যেমন : আল-ফিকহ[১]) ব্যবহার করতে হবে। তথ্যসূত্র সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠার নিচে উল্লেখ করতে হবে।

(ড) মূল পাঠের মধ্যে উদ্ধৃতি ৩০ শব্দের বেশি হলে পৃথক অনুচ্ছেদে তা উল্লেখ করতে হবে।

(ঢ) ভিন্ন ভাষার উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ দিতে হবে।

(ণ) হাদীস উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে রেফারেন্সে উদ্ধৃত হাদীসের সংক্ষিপ্ত তাহকীক, বিশেষ করে হাদীসটির শুদ্ধতা বা গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কিত মূল্যায়ন দিতে হবে। তাহকীক এর ক্ষেত্রে যথাযথ নিয়মে সূত্র উল্লেখ করতে হবে।

(ত) প্রবন্ধে দলীল হিসাবে জাল/বানোয়াট হাদীস অবশ্যই বর্জন করতে হবে।

তথ্যসূত্র যেভাবে উল্লেখ করতে হবে

(১) **কুরআন থেকে :** আল-কুরআন, ২ : ১৫।

(২) **হাদীস থেকে :** লেখক/সংকলকের নাম, গ্রন্থের নাম (ইটালিক হবে), অধ্যায় (ابواب-كتاب) : ..., পরিচ্ছেদ (باب) : ..., প্রকাশ স্থান : প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান, প্রকাশকাল, খ....., পৃ....., হাদীস নং-...।
যেমন : ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আস-সালাত, অনুচ্ছেদ : আস-সালাতু ফিল-খিফাফ, আল-কাহেরা : দারুত তাকওয়া, ২০০১, খ. ১, পৃ. ১০৩, হাদীস নং-৩৭৫।

(৩) **অন্যান্য গ্রন্থ থেকে :** লেখকের নাম, গ্রন্থের নাম (ইটালিক হবে), প্রকাশ স্থান : প্রকাশনা সংস্থা, প্রকাশকাল, সংস্করণ নং (যদি থাকে), খ...., পৃ....।
যেমন : মোহাম্মদ আলী মনসুর, *বিচার বিভাগের স্বাধীনতার ইতিহাস*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০১০, পৃ. ২১।

(৪) **জার্নাল/প্রবন্ধ থেকে :** প্রবন্ধকারের নাম, প্রবন্ধের শিরোনাম, জার্নালের নাম (ইটালিক হবে), প্রকাশনা সংস্থা/প্রতিষ্ঠান, বর্ষ : ..., সংখ্যা :..., (প্রকাশ কাল), পৃ.... ।
যেমন : ড. আ ক ম আবদুল কাদের, মদীনা সনদ : বিশ্বের প্রথম লিখিত সংবিধান, *ইসলামী আইন ও বিচার*, বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, বর্ষ : ৮, সংখ্যা : ৩১, জুলাই-সেপ্টেম্বর : ২০১২, পৃ. ১৩।

(৫) **দৈনিক পত্রিকা থেকে**
নিবন্ধ থেকে হলে : লেখকের নাম, নিবন্ধের শিরোনাম, পত্রিকার নাম (ইটালিক হবে), তারিখ ও সাল, পৃ.... ।
যেমন : মোহাম্মদ আবদুল গফুর, রিমান্ডে দৈহিক নির্যাতনের মাধ্যমে স্বীকারোক্তি আদায় প্রসঙ্গ, *দৈনিক ইনকিলাব*, ৬ জুন, ২০১৩, পৃ. ১১।
রিপোর্ট বা অন্য কোনো তথ্য হলে : পত্রিকার নাম (ইটালিক), তারিখ ও সাল, পৃ... ।
যেমন : *দৈনিক ইনকিলাব*, ৬ জুন, ২০১৩, পৃ. ৬।

(৬) **ইন্টারনেট থেকে :** ইন্টারনেট থেকে তথ্য গ্রহণ করা হলে বিস্তারিত তথ্যসূত্র উল্লেখপূর্বক গ্রহণের তারিখ ও সময় উল্লেখ করতে হবে।
যেমন www : ilrcbd.org/islami_ain_o_bechar_article.php

অন্যান্য জ্ঞাতব্য

(১) প্রকাশের জন্য মনোনীত কিংবা অমনোনীত কোনো পাণ্ডুলিপি ফেরত দেয়া হয় না।
(২) প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে লেখক/গণ জার্নালের ২ (দুই) কপি এবং প্রবন্ধের ৫ (পাঁচ) কপি অফপ্রিন্ট বিনামূল্যে পাবেন।
(৩) প্রকাশিত প্রবন্ধের ব্যাপারে কারো ভিন্নমত থাকলে এবং তা যুক্তিযুক্ত, প্রামাণ্য ও বস্তুনিষ্ঠ মনে করা হলে উক্ত সমালোচনা জার্নালে প্রকাশ করা হয়।
(৪) প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য প্রাথমিকভাবে গৃহিত হলে সম্পাদক ও রিভিউয়ারের নির্দেশনা অনুযায়ী লেখককে প্রবন্ধ সংশোধন করে পুনরায় জমা দিতে হবে, অন্যথায় তা প্রকাশ করা হবে না।
(৫) জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধের কপিরাইট সেন্টার সংরক্ষণ করবে। প্রবন্ধের লেখক তার প্রকাশিত প্রবন্ধ অন্য কোথাও প্রকাশ করতে চাইলে সম্পাদক-এর নিকট থেকে লিখিত অনুমতি নিতে হবে।
(৬) সম্পাদক/সম্পাদনা পরিষদ প্রবন্ধে যে কোন প্রকার পরিবর্তন ও পরিমার্জন করার অধিকার রাখেন।
(৭) জার্নালে প্রকাশের জন্য কোনো প্রবন্ধ প্রেরণের পূর্বে লেখার নিয়ম অনুসরণ পূর্বক তা সাজাতে হবে। অন্যথায় তা বাছাই পর্বেই বাদ যাবে।
(৮) প্রকাশিত প্রবন্ধের জন্য লেখককে কোনো সম্মানী প্রদান করা হয় না।

ত্রৈমাসিক ইসলামী আইন ও বিচার

গ্রাহক/এজেন্ট ফরম

আমি 'ইসলামী আইন ও বিচার'-এর গ্রাহক/এজেন্ট হতে চাই। আমার ঠিকানায় ....কপি পাঠানোর অনুরোধ করছি।

নাম ঃ...

ঠিকানা ঃ...

বয়স.................. পেশা..

ফোন/মোবাইল ঃ .... সহজলভ্য মাধ্যম ঃ

ডাক/কুরিয়ার : ফরমের সঙ্গে ....টাকা সংস্থার নামে মানি অর্ডার/টিটি/ডিডি করলাম/অথবা নিম্নলিখিত ব্যাংক একাউন্টে জমা দিলাম।

কথায় টাকা...

স্বাক্ষর

গ্রাহক/এজেন্ট

ফরমটি পূরণ করে নিচের ঠিকানায় পাঠাতে হবে

সম্পাদক

ইসলামী আইন ও বিচার

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

৫৫/বি, নোয়াখালী টাওয়ার (স্যুট-১৩/বি), পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২, ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭, ০১৭১৭-২২০৪৯৮

E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com. www.ilrcbd.org

সংস্থার একাউন্ট নং

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

MSA-11051 ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, পল্টন শাখা, ঢাকা

বিকাশ : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭ (পারসোনাল)

ভি.পি ও কুরিয়ারে পত্রিকা পাঠানো হয়।

ডাক বা কুরিয়ার চার্জ সংস্থা বহন করে।

এজেন্ট হওয়ার জন্য ৫ কপির অর্ধেক মূল্য অগ্রিম পাঠাতে হবে।

গ্রাহক হওয়ার জন্য ন্যূনতম এক বছর তথা ৪ সংখ্যার মূল্য বাবদ ৪০০/- টাকা অগ্রিম পাঠাতে হয়।

৫ কপির কমে এজেন্ট করা হয় না। ৫ কপি থেকে ২০ কপি পর্যন্ত ২০% কমিশন

২০ কপির উর্ধ্বে ৩০% কমিশন দেয়া হয়।

⇨ ১ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য-(চার সংখ্যা) = ১০০ X ৪ = ৪০০/-

⇨ ২ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য-(আট সংখ্যা) = ১০০ X ৮ = ৮০০/-

⇨ ৩ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য-(বার সংখ্যা) = ১০০ X ১২ = ১২০০/-

REG. NO. DA-6100 :: ISLAMI AIN O BICHAR :: APRIL - JUNE 2014